সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা

সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতা

মানুষের বয়স বছর-বছর বেড়েই চলে, কিন্তু তার প্রথম ভাগটাকেই বলে বৃদ্ধি, শেষেরটাকে অবক্ষয়। আমি যে এখন দ্বিতীয় দশায় উপনীত, সেটা কিছুদিন ধরে পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। দৈহিক এবং মানসিক শক্তিগুলো এমনভাবে ক্ষীয়মাণ যে সেটাকে প্রায় ঠাট্টার মতো বোধ হয়—ঠিক রুচিসংগত ঠাট্টাও বলা যায় না। এই সেদিনও যে-কোনো আলোয় যে-কোনো বই অক্লেশে পড়ে গিয়েছি ; আর এরই মধ্যে চোখ দুটো এমন অভদ্র হয়ে উঠলো যে চশমা ছাড়া বিশ্বসাহিত্য অদৃশ্য, এবং চশমা-সহ বিশ্বপ্রকৃতি ঝাপসা। স্মৃতিশক্তির কথা আর কী বলবো— তার ব্যবহার পাগলামির প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে। এক-এক সময় এমন দুর্দশাও হয় যে 'ন্যাকড়া' কথাটার বানানের জন্যেও অভিধান খুলি, আবার খুব ছোট্ট একটা মন-খারাপ করা ঘটনা, যেটা ভুলে যাওয়াই দরকার, সেটা ঠিক আঁকড়ে থাকবে মগজে, অনেকগুলো ঘণ্টাকে কুরে-কুরে ঝাঁঝরা করে না-দেয়া পর্যন্ত বিদায় নেবে না। আর এই সঙ্গে জুটেছে একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তার অস্বস্তি ; যাবো কি যাবো না, করবো কি করবো না— দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এই রকম সহস্র সংশয়ে শরাচ্ছন্ন হয়ে আছি। শোবার আগে দরজা বন্ধ করেছিলাম কিনা, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য বার-বার বিছানা ছেড়ে উঠে-পড়া— এই দুঃখের অভিজ্ঞতাটি অনেকের জীবনেই ঘটে থাকবে, কিন্তু আমার স্নায়বিক বিপর্যয় এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর যে ডাকবাক্সে চিঠি ফেলার আগে দশবার করে ঠিকানা পড়ি— বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম, কিংবা শহরের নামটাতেই যে ভুল করে বসিনি তা স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। আর, কিছু লিখতে বসলে তো কথাই নেই— তখনই এই সংশয়ের বীজাণুদল যেন সবচেয়ে অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে। কথাগুলো, ভাবনাগুলো এমন বেয়াড়া গোছের লুকোচুরি খেলা শুরু করে দেয়, আর ফাঁকে-ফাঁকে এমন অসম্ভবের লোভ দেখায় যে আমার এই লেখার কাজটি ক্রমশই আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। কুড়ি বছর, দশ বছর, এমনকি হয়তো পাঁচ বছর আগেও যেটা তিন ঘণ্টায় তরতর করে লেখা হয়ে যেতো, এখন সেটুকু শেষ করে উঠতে আমাকে তিরিশ ঘণ্টাব্যাপী ক্রস-কাণ্ট্রিরেস দৌড়োতে হয় ; তার মধ্যে কতবার যে ঝোপে-ঝাড়ে হঁচট খেয়েছি, কতবার যে নালা- ডোবায় চুবুনি, তার প্রমাণ থেকে

যায় কাগজের গায়ে আগাছার মতো গজিয়ে-ওঠা কাটাকুটিতে, আর টেবিলের তলায় বেতের ঝুড়িটাতে আমার প্রয়াসের ছিন্নভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলিতে।

অবশ্য এ-রকম ঘটনা আমার জীবনেই প্রথম ঘটলো না, আর আমার পরবর্তী কারো জীবনেই যে শেষবার ঘটবে, এখন পর্যন্ত পশ্চিমী বিজ্ঞান সে-রকম কোনো আশ্বাস দিচ্ছে না। অতএব যথাসম্ভব ভদ্রতা বাঁচিয়ে ব্যাপারটাকে মেনে নেবারই চেষ্টা করছি ; ধরে নিচ্ছি ধর্মঘটের ধুম কেবলই বেড়ে চলবে, যতদিন-না কারখানাতেই লাল বাতি জ্বলে। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী, যখন শত্রুকে তাড়াতে হলে নিজের ঘর পোড়াতে হয় তখন আর যুদ্ধ চলে না। প্রকৃতি যখন নিজের হাতে মারে, তখন নালিশ চলবে কার কাছে? জীবনের যে-অনুচ্চারণীয় উল্টো পিঠটা জীবনের মধ্যেই বাসা বেঁধে থাকে, তার সঙ্গে আপোশের একটা খশড়াও তৈরি করেছিলাম মনে-মনে, এমনকি সেটাকে পাকা দলিলে পরিণত করার কথাও ভাবিনি তা নয়। কিন্তু ঠিক তখনই বাধা পড়লো। সন্ধিপত্রের শর্তগুলো যখন একে-একে ঠিক করছি, হঠাৎ অন্য একটা উপসর্গ লক্ষ করে চমকে উঠলাম। আমার সন্দেহ হলো—সন্দেহ কেন, বিশ্বাস না-করে উপায় রইলো না—যে আমার চরিত্র ক্রমশ ভালো হচ্ছে।

জাঁক করে বলছি না কথাটা, নিরতিশয় দুঃখের সঙ্গেই বলছি। কেননা কথাটার মানে এ-রকম নয় যে আমি হঠাৎ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছি ; কথাটার মানে এই যে সৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অনাসৃষ্টির শক্তিও কমে আসছে। আমাদের মতো সাধারণ ধুলোকাদায় গড়া মানুষের মধ্যে ও-দুটো বস্তু জড়িয়ে-মিশে একসঙ্গে বিরাজ করে, অনাসৃষ্টির ভাগে কমতি পড়লে বুঝতে হবে আমাদের সত্তায় মরচে পড়ে এলো। চরিত্র ভালো হচ্ছে—তার মানে, আমার সত্যিকার চরিত্র আমি খুইয়ে ফেলছি, নিজেকে আর বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারছি না, সামান্যের মধ্যে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছি। আগের চেয়ে সহিষ্ণু হয়েছি, মতবিরোধ ঘটলেই রেগে উঠি না, আমার ইচ্ছা কোথাও বাধা পেলে অভিশাপ দিই না বিশ্বজগৎকে, যেখানে আমার অন্তরাত্মা দশ মিনিটেই হাঁপিয়ে ওঠে, সে-রকম স্থলেও ঘণ্টা দু-তিন লক্ষণীয় মুখমালিন্য প্রকাশ না-করে বসে থাকতে পারি। অর্থাৎ, আমার ব্যক্তিত্বের ধারগুলো ক্ষয়ে-ক্ষয়ে আসছে ; যেগুলোকে লোকে বলবে আমার দোষ আর আমি বলবো আমার অস্তিত্বের অভিজ্ঞান, সেগুলো একে-একে ত্যাগ করছে আমাকে ; আস্তে-আস্তে আমি নির্বিশেষ, নিঃস্বাদ লৌকিক ভালোমানুষির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি—মানে, তলিয়ে যাচ্ছি। এর চেয়ে আশঙ্কার কথা আমার কিছু জানা নেই। সময়ের অন্যান্য মার যদি-বা হজম করে উঠতে পারি, এই অপমানটিকে সহ্য করা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না—অন্তত এখন পর্যন্ত না। নিজের জন্য উদ্বিগ্ন বোধ করছি, আমার কোনো কথায় বা ব্যবহারে উদ্দামতার কোনো লক্ষণ

দেখার জন্য হাৎড়ে বেড়াচ্ছি চারদিকে, দেখতে না-পেয়ে বিরাট নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে পড়ছি। এইভাবে আমি যদি চলতে থাকি, তাহলে বুঝি কোনো-এক অনিবার্য তারিখে খবর-কাগজের সম্পাদকেরা আমাকে 'উত্তম বন্ধু, স্নেহশীল পিতা এবং আদর্শ স্বামী' বলে অভিহিত করবেন, এই কথা চিন্তা করে আমার মৃত্যুভয় বেড়ে যাচ্ছে।

মনের এই অবস্থা নিয়ে কলকাতা ছেড়ে দূরে আসতে হলো। নতুন দেশ, কাউকে চিনি না, এবং অল্প সময়ের জন্য দায়ে-পড়া কাজ-চালানো গোছের বন্ধুতা স্থাপন করার ক্ষমতাও আমার নেই। যে-কর্মসূত্রে আসতে হয়েছে তার দাবিও তেমন বেশি নয়, প্রায় সারাদিন নিজের পুঁজি ভাঙিয়েই চালাতে হবে। বাসা পেলাম নির্জন পল্লীতে, কিংবা কোনো পল্লীতেই নয়, শহর ছাড়িয়ে প্রান্তরের প্রান্তে, এমনতরই প্রতিবেশীবর্জিত যে 'কাল খুব বৃষ্টি হলো' বা 'এখানে কি তালশাঁস পাওয়া যায় ?' এই ধরনের বাক্যালাপেরও সম্ভাবনা নেই। যাকে বলে কথোপকথন, যেটা টোমাস মান্-এর মতে সভ্যতারই নামান্তর, সেটা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেলো, বাক্‌যন্ত্রের মামুলিতম ব্যবহারেরও অবকাশ বেশি থাকলো না। সম্প্রতি আমি এমন দিন একাধিক কাটিয়েছি যেদিন আমার ইংরেজি-ভাষী নিঃশব্দ পরিচারকটিকে দু-চার বার নির্দেশ অথবা ধন্যবাদ জানানো ছাড়া একটা কথাও বলতে হয়নি আমাকে। জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যের মধ্যে এ-ঘর ছেড়ে ও-ঘর, কিংবা ঘর ছেড়ে বারান্দা, কিংবা সন্ধের আগে সামনের ঘাসের জমিতে একটু পাইচারি। কোথাও যাই না, কেউ আসে না, বাইরে ঘাস, গাছ, আকাশ, আর ভিতরে আমার নিজের মন—এ ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই। তবু দিনগুলি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে না, পানা-পড়া খালের মতো আটকে যাচ্ছে না মাঝে-মাঝে, এমন সহজ, সাবলীল গতিতে ক্যালেন্ডারের এক পাতা থেকে আর-এক পাতায় বয়ে চলেছে যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি। এ থেকে আমার নিজের বিষয়ে নতুন একটা আবিষ্কার করা গেলো যাতে আমার মনে হচ্ছে যে বিলকুল সবই লোকশান হয়নি, এক ফোঁটা মুনফাও কোথাও জমা হয়েছে হয়তো। সে-আবিষ্কার এই যে আমার একা-থাকার শক্তি আজকাল বেড়েছে ; নিঃসঙ্গতাকে শুধু সহ্য করা নয়, উপভোগ করাও আমার পক্ষে আর অসাধ্য নেই।

যৌবনে এই শক্তি আমার ছিলো না। মানুষের যত রকম অবস্থা আছে, তার মধ্যে নিঃসঙ্গতাকেই তখন সবচেয়ে ভয় করতুম। বলা বাহুল্য, শুধু সঙ্গীহীনতাকেই নিঃসঙ্গতা বলে না, মনকে নিবিষ্ট করার উপায়ের অভাবকেই বলে নিঃসঙ্গতা। অল্প বয়সে এই উপায়গুলো আমার কাছে খুব স্পষ্ট, স্পর্শসহ কয়েকটা বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো। মানুষ, যতক্ষণ সে জেগে আছে, ততক্ষণ সক্রিয় থাকবে, এই আমার মত ছিলো তখন। হয় কাজ করবে, নয় প্রিয়জনের সঙ্গসুখ ভোগ করবে, নয় বই পড়বে বা সিনেমা দেখবে, আর তা নয় তো স্থান থেকে স্থানান্তরে চলমান অবস্থায় সময় কাটবে তার। এর

বাইরে আমি কিছু ভাবতে পারতাম না। হাতে কোনো কাজ নেই, বইও নেই, চুপচাপ একা বসে আছি—নিজের সম্বন্ধে এই রকম একটা ছবি আমার কল্পনার পরপারে ছিলো। কোনো-কোনো মানুষ দেখেছি, যারা কিছু না-করে একলা বসে-বসে, অথবা শুয়ে-শুয়ে, সুখী হতে পারে ; আমি তাদের করুণা করেছি, আবার ঈর্ষাও করেছি, কেননা ঐ সুখ বিধাতা আমাকে মঞ্জুর করেননি। হয়তো আমার মধ্যে উদ্যমের ছটফটানি কিছু প্রবল, তাই নিষ্ক্রিয়তাকে মানবসত্তার পরাভব বলে জ্ঞান করতুম, কিন্তু এ-কথা আমি অল্প বয়সেই বুঝেছিলাম যে এর পিছনে আমার একলা থাকার অক্ষমতাটাই আসল কথা। তখন আমি মনে-মনে এই রকমের একটা তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলুম যে মানুষের যদিও আত্মপ্রেমিক বলে বদনাম আছে, আসলে সে নিজেকেই ভালোবাসে সবচেয়ে কম, কেননা একান্তরূপে নিজের সঙ্গ তার অসহ্য। অন্তত আমার নিজের ব্যবহারে এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যেতো। ছাত্রজীবনে সকালে উঠেই কাজে আর আড্ডায় বোনা চঞ্চলতার যে-পর্যায় আরম্ভ হতো, রাত্তিরে বারোটা-একটায় শুতে গিয়েও তার অবসান হতো না, একখানা বই হাতে নিয়ে মশারির ভিতর যাওয়া চাই, ঘুমিয়ে পড়ার সর্বশেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত বিষয়ান্তরে ন্যস্ত রাখা চাই মনকে। যখন রাত বেশি হলে কোনো-এক সময় নেহাৎই আমাকে একা হতে হতো, তখন এই কথাটা ভাবতে আমার ভালো লাগতো যে ঘরে ফিরে কোনো-না-কোনো বইয়ের সঙ্গে মিলন হবে ; কতদিন সকালে প্রথম চোখ মেলে শুয়ে-শুয়েই রাত্রে পড়া বইটা আবার খুলেছি। পরবর্তীকালে এই অভ্যাসে উপকরণগত বৈচিত্র্য ঘটে থাকবে, কিন্তু মূল সুরের বদল হয়নি। দৈবাৎ যদি এমন কোনো সন্ধ্যা এসেছে—কালে-ভদ্রে সে-রকমও ঘটেছে কখনো—যখন বাড়িতে কোনো বন্ধুসমাগম হলো না, আমি বোতলবঞ্চিত মদ্যপের মতো ছটফট করে ঘণ্টাগুলো কাটিয়েছি। একলা বসে কোনো নাটক অথবা সিনেমা দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিলো—অভিনয়ের স্বকীয় গৌরব যতই থাক না—এবং মনের মতো সঙ্গী যতক্ষণ না জুটেছে, ততক্ষণ দেশভ্রমণের কোনো পরিকল্পনা আমার মনে স্থান পায়নি। অতএব দুয়ের সঙ্গে দুই যোগ করে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় আমি অন্তত কিছু স্বাবলম্বী হতে পেরেছি ; আমার জীবনের এঞ্জিনে সারাক্ষণ আর বাইরে থেকে ইস্টিম জোগাতে হয় না। এটা খানিকটা লাভ বইকি ; কেননা মানুষের অবস্থার উপর সব সময় তার হাত থাকে না, সময়ের চক্রান্তে সঙ্গীদের আর আমার মধ্যে ভৌগোলিক বা মানসিক ব্যবধান দেখা দেয়, বই অথবা কাজ নামক উপকরণগুলোরও স্থিরতা নেই ;—কিন্তু নিরন্তর নিজেকে নিয়েই ঘর করতে হয় মানুষকে, প্রয়োজনমতো অনন্যভাবে নিজেরই উপর নির্ভর করতে পারলে তার প্রাণের ভাণ্ডারে অপব্যয় ঘটে না। আমি যে আমার নিজের পক্ষে অনেকটা নির্ভরযোগ্য হয়েছি, এই একটি সুখবর এখানে এসে পাওয়া গেলো।

কিন্তু এমন কথা বলতে চাই না যে এটা নিছক আমারই কৃতিত্ব, বা আমারই মনের ভিতরকার ঘটনা ; আমি জানি সময়ের হাত আমাকে যেটুকু বদলে দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বল দিয়েছে এখানকার পরিবেশ। এই জায়গাটা যদি এক মহানগর হতো, তাহলে কপালগুণে মনোমতো বন্ধু না-জুটলে, আমি হয়তো তেমন আরাম পেতুম না, কেননা নিঃসঙ্গ আগন্তুকের পক্ষে পৃথিবীর নগরগুলো নিষ্ঠুর হতে পারে। আবার যদি কোনো গ্রামে এসে পড়তুম, কিংবা মফস্বলের ছোটো শহরে, যেখানে বাথরুম নেই, বিজলিবাতি নেই, টক আর ঝাল ছাড়া খাদ্য নেই, এমনকি হয়তো চা পর্যন্ত নেই, তাহলে—তাহলে আমার দশাটা কী-রকম দাঁড়াতো, তা কল্পনা করাও আমার পক্ষে কষ্টকর। জীবন থেকে কিছু ভালো আহরণ করতে হলে তার প্রথম শর্ত শারীরিক আরাম, কেননা শরীরের চাহিদাগুলোকে ভুলে থাকতে পারলে তবে আমাদের মনের বৃত্তি জেগে ওঠার অবকাশ পায়।

এখন আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এই যে আমি যেগুলোকে সুলক্ষণ বলে গণ্য করি তার প্রায় সব ক-টাই এখানকার সঙ্গে মিলে গেছে। জনপদটিকে নগর বলা যায় না, অথচ গ্রাম কিংবা মফস্বল বললেও নিতান্ত ভুল হবে। শহরের যান্ত্রিক সুবিধে সবই পাওয়া গেছে, কিন্তু ভিড় নেই, কলরোল নেই, জনতার সমুদ্রের মধ্যে নিঃসঙ্গতাবোধের অবসাদ নেই। দৈহিক অর্থে প্রাণধারণের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা সবই জুটেছে, আর সেই সঙ্গে আছে স্তব্ধতা, সৌম্যতা, অবসর। এই অবসর মানে কাজের অভাব নয়, যাকে বলে সময় হাতে থাকা তাও নয়, এর মানে পরিবেশের মধ্যে একটি সংগতি, যাতে মন তার নিজেকে ঠিক খুঁজে পায়, মেলাতে পারে আপন সুর বাইরের সঙ্গে, যখন কিছু না-করাটাকেই সময়ের অপব্যয় বলে মনে হয় না, আর কাজ থেকেও উৎকণ্ঠার চাপ সরে যায়। যখন কাজের সঙ্গে বিশ্রাম মিলে-মিশে থাকে, যখন তাড়াহুড়ো নেই সচলতা আছে, আন্দোলন আছে কিন্তু অস্থিরতা নেই, মনের সেই ভারসাম্যেরই নাম সত্যিকার অবসর। মহাপুরুষেরা এটাকে নিজেরই মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা দৈবাধীন—আমরা হঠাৎ কোনো-কোনো শুভক্ষণে এর স্বাদ পাই, কখনো বা ভাগ্যের অযাচিত এবং অপ্রত্যাশিত উপহারস্বরূপ, কখনো বা স্থান-কালের যোগাযোগের প্রভাবে। এই অচেনা দেশের অস্থায়ী আবাসে আমি যদি সেই অবসরের সুখ এক ফোঁটাও পান করে থাকি, সেটা আমি যোগ্যতার দ্বারা অর্জন করেছি বলে বিশ্বাস হয় না, তার জন্য আমার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের কাছেই কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা উচিত।

অন্য কারো কেমন লাগতো বলতে পারি না, কিন্তু এখানকার জীবনযাত্রার বিন্যাস আমার দেহ-মনের প্রকৃতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বরণীয় হয়েছে। বন্ধুতার সান্নিধ্য যেমন নেই, তেমনি অপ্রিয় সংসর্গের দৌরাত্ম্য থেকেও বেঁচে গিয়েছি, সামাজিকতার পরিশ্রমেও

হাঁপিয়ে উঠতে হচ্ছে না। চারদিকে নির্জনতার মধ্যে আমার আনন্দের অনুভূতির জন্য আমন্ত্রণ আছে, অভ্যর্থনাও আছে। দৃশ্য ভালো, আবহাওয়াটি উপভোগ্য। গরম কম, হাওয়া শুকনো, বৃষ্টিও বিরল নয়। যে-গ্রীষ্ম ঋতু আমার প্রিয়, এখানে তার মেজাজ কখনো সপ্তমে বা পঞ্চমেও চড়ে না বলে তার উষ্ণতাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করা যাচ্ছে। উষ্ণতা না-বলে স্নিগ্ধতাও বলা যায়, গ্রীষ্ম না-বলে বসন্ত, বর্ষা বা হেমন্ত বললেই বা দোষ কী। কেননা বিধাতা এখানকার প্রকৃতিকে এমন করে গড়েছেন যে এর ঋতুচক্রে প্রতিতুলনার বিস্ময় যদিও নেই, তবু এক-একটি দিনের মধ্যে সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা সেতারের মীড়ের মতোই প্রচুর। রাত হলেই ঠাণ্ডা, বৃষ্টি হলেই সুখজনক স্বল্প শীত, বা উঁকিঝুঁকি ফাল্গুন। ভোর এখানে তলোয়ারের মতো লাফিয়ে ওঠে না দিগন্ত ছিঁড়ে, আবছা হয়ে জড়িয়ে থাকে আকাশে, এইমাত্র ছেড়ে-ওঠা স্বপ্নের স্মৃতির মতো। দিনের বেলায় চৈত্রমাস ছড়িয়ে সান্ধ্য ঝড়ে আষাঢ় নামলো কোনোদিন, টালির ছাদের ফুটো বেয়ে-বেয়ে ঘরের মেঝে পুকুর হয়ে গেলো, আবার দু-দিন পরেই সকালবেলার চায়ের টেবিলে উত্তুরে হাওয়ার কাঁপন দিলে, বাংলাদেশের কার্তিক মাসের মতো। অথচ এর একটা ভাবও মেয়াদি নয়, পালা-বদলে দেরি হয় না বেশিক্ষণ, তাই কখনো-কখনো এমনও হয় যে একটা দিন-রাত্রির পরিসরের মধ্যেই প্রায় ছয়টা ঋতুর আভাস দিয়ে যায়। সকালে চোখ মেলে দেখলুম কুয়াশা, মুড়ি দিয়ে নতুন করে শুয়ে থাকার আমেজ দিলো, কিন্তু স্নান সেরে বেরিয়ে এসেই দেখি সুন্দর রোদে ঘর হেসে উঠেছে। দুপুরবেলাটা আতপ্ত, বিকেল নামলো শরতের মতো সোনালি, সন্ধের আগে মেঘ করে বৃষ্টি এলো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটে, বর্ষার তানপুরা বাজলো ঘরের ছাতে, গাছের পাতায়। আর ঋতুর এই প্রসাধনের বৈচিত্র্যকে ইন্দ্রিয়-মনের গোচর করার জন্যে যেটুকু আয়োজন দরকার, তাতেও কোনো কার্পণ্য ঘটেনি ; চারদিকের অবাধ মাঠ কৃষ্ণচূড়ায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, পাশাপাশি দুটো বেঁটে গাছ তাদের বসন্তদিন বিলিয়ে দিচ্ছে তীব্র-লাল অজস্র মঞ্জরীতে, দক্ষিণ দিকে সবুজ পাহাড়ের ধাপে-ধাপে সারাদিন চলছে আলো-ছায়ার খেলা, আর পশ্চিমে লম্বা একটা ঝিল সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটিকে একটুখানি ধরে রাখার জন্য বুক পেতে পড়ে আছে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই মাঠ, আর মাঠের শেষে গাছপালার রেখা ; যে-কোনো জানলা দিয়ে তাকাই, বড়ো-বড়ো চওড়া আকাশ চোখে পড়ে। আর এই সব উপকরণগুলো শুধু বিচ্ছিন্নভাবে তালিকাভুক্ত হয়ে নেই, একটা সামঞ্জস্য রচনা করেছে—আর সামঞ্জস্য মানেই সম্পূর্ণতা, তৃপ্তি। অতএব কাছাকাছি যে-সব বিখ্যাত স্থান দেখবো বলে মনস্থ করে বেরিয়েছিলুম তার একটিতেও যাওয়া হচ্ছে না আমার। স্থানীয় আকর্ষণও অনেকগুলো বাদ পড়লো, বসে আছি একলা চুপচাপ এই জীবন্ত নির্জনতার মধ্যে। দুপুরবেলা কোকিল ডাকে, রাত্রে

আমার ঘুমের আগে কঁকিয়ে ওঠে মানুষের মতো গলার আওয়াজে কোন পাখি জানি না, বৃষ্টি-পড়া অন্ধকারের ফাঁকে-ফাঁকে ইলেকট্রিকের আলোর তলায় কৃষ্ণচূড়া অদ্ভুত হয়ে দুলে ওঠে। আমি সারাদিন ভরে কখনো একটু লিখছি, কখনো একটু পড়ছি, কিন্তু বেশির ভাগ সময় কিছুই করছি না—শুধু চেয়ে-চেয়ে দেখছি। দেখতেই ভালো লাগছে।

সত্যি বলতে, এই দেখা ব্যাপারটাও আমার জীবনে নতুন। যৌবনে বিশ্বপ্রকৃতির যেটুকু দেখেছিলাম, সবই পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে চোখ তুলে, লেখার ফাঁকে-ফাঁকে চোখ তুলে, নয়তো পথ চলতে-চলতে আকস্মিকভাবে। সে-দেখায় তীব্রতা ছিলো সন্দেহ নেই—কেননা হঠাৎ দেখার অভিঘাতই প্রবল—কিন্তু পূর্ণতা ছিলো না, অর্থাৎ দেখার মধ্যেই নিবিষ্ট হতে পারিনি। ট্রেনে-স্টিমারে বই ছিলো আমার পক্ষে অপরিহার্য, আস্ত-আস্ত নভেল থার্ড ক্লাশের ভিড়ের মধ্যে শোষণ করে নিয়েছি। অপরিহার্য এখনো আছে, অন্তত দু-খানা বই হাতে না-নিয়ে রেলগাড়িতে আসীন হতে ভরসা পাই না, কিন্তু সেগুলো অনেক সময় পাশেই পড়ে থাকে, কিংবা শুধু মাঝে-মাঝে খোলা হয়। চলতি পথে আমি আজকাল দেখছি বেশি, পড়ছি কম। অবশ্য ট্রেনের জানলায় শিক বসিয়ে দেখার সুখ অর্ধেক করে দিয়েছে, উল্লেখযোগ্য দৃশ্যও কিছু সব সময় পথে পড়ে না, তবু অনেক সময় সাধারণটাকেই দ্রষ্টব্য বলে বোধ হয়, এবার ন্যূনতম বইয়ের সাহায্যে, দেখে-দেখেই তিন দিনের পথ কেটে গেলো। আর এখানে আসার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই দেখাটাও একটা কাজ, তার নিজেরই জন্য মূল্যবান। আমি নতুন এক রকমের আনন্দ নিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছি ; আকাশে রঙের বদল, মাটিতে আলো-ছায়ার বদল, নীল শাড়ি-পরা পাতা-কুড়ুনি দুপুর রোদে বেতের ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে চলে গেলো, বিকেলবেলা কী-সুখে ঐ কালো কুকুরটা ঘাসের উপর গড়াতে শুরু করে দিলে, সূর্যাস্তের আগে পাহাড়ের গায়ে অর্ধেক আলো হয়ে উঠলো, আর অর্ধেকে পড়লো গাঢ় রঙের বেগনি ছায়া। এ-সব দেখে শুধু যে আমার চোখ দুটো সুখী হচ্ছে তা নয়, আমার মনের মধ্যেও অস্পষ্ট একটা বেগ জেগে উঠেছে। অর্থাৎ, এটা শুধু মনের একটা উৎসুক ভাব, একটা সজীবতার বোধ, যখন মনে হয় বিশ্বজগতে যা-কিছু আছে তার কিছুই অনর্থক নয়, আর তার মধ্যে আমার অস্তিত্বটাও মূল্যবান, আর সেই অস্তিত্বের কোনোরকম জানান দেবার জন্য মন কিছু বলে উঠতে চায়, যদিও সব সময় বলতে পারে না। তার মানে এর মধ্যে একটা প্রতীক্ষাও আছে ; কিছু ঘটবে, কেউ আসবে, কেউ আসছে, এই রকমের একটা ইঙ্গিত চরাচরের ভিতর থেকে নিশ্বসিত হচ্ছে যেন : আমি নিঃশব্দে সেটাকে অনুভব করছি, গ্রহণ করছি, প্রস্তুত হয়ে উঠছি কিসের জন্য জানি না। 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' : এই কথাটার অর্থ এতদিনে বুঝলে পারলাম, এইটুকুতেই আমার এখানকার নিঃসঙ্গবাস সার্থক হলো।

অবশ্য যেটাকে নিঃসঙ্গতা বলছি আসলে সেটা নিঃসঙ্গতাই নয়, কেননা আমার প্রিয়জনের সঙ্গে এবং আপন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে, দূরে বসেও অনবরত সংশ্লিষ্ট হয়ে আছি—চিঠিপত্রের মানসিক বিনিময়ের সূত্রে। এই সংযোগ থেকে যে বঞ্চিত হয়, যাকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে মানবসমাজের সকল সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো, সেই নিঃসঙ্গ বন্দী যদি পাগল হয়ে না যায় তো অনেক ভাগ্য বলতে হবে। আর এই সংস্রব যে আর আকাঙ্ক্ষাও করে না, সে হয় পাগল হয়ে গেছে, নয়তো তিনি তথাগত হবেন। সংসারে শুধু উন্মাদেরাই সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকে, তার অলীক জগতের অংশীদার কেউ নেই বলেই সে পাগল, আর শুধু মহর্ষিরাই মহাশূন্য সহ্য করতে পারেন। আমরা সাধারণ অর্থে যাকে নিঃসঙ্গতা বলে থাকি, আমাদের পক্ষে তার তুল্য অভিশাপ কিছু নেই, আবার কোনো-কোনো অবস্থায় তার আনন্দেরও তুলনা হয় না।

সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা : বোদলেয়ার বলেছেন ও-দুটো একই কথা—অন্তত কবির পক্ষে, কেননা কবিরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গময় করে তুলতে পারেন, আবার মহানগরীর জনতার মধ্যে নির্জন হয়ে চলাফেরা করার কৌশলও তাঁদের জানা আছে। বোদলেয়ারের এ-কথা যে সত্য তার প্রমাণ আমি আগেই পেয়েছিলাম, কিন্তু কবিকর্মের এই ভূমিকার মধ্যে আমি এখন আর-একটা কথা যোগ করতে চাই : সেটা নিষ্ক্রিয়তা। বাংলা 'নিষ্ক্রিয়' কথাটা এখানে অসংগত হলো, ওর মধ্যে মস্ত একটা 'না' ছাড়া কিছু নেই, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে 'প্যাসিভ' বলে তার মধ্যে কিছু সদর্থকতাও আছে ; যে-শক্তির নিজের ক্রিয়া নেই কিন্তু অন্যের ক্রিয়া গ্রহণের জন্য উন্মুখ, ঐ বিশেষণ তারও প্রতি প্রয়োজ্য। এবং এই অবস্থাটা কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, কেননা তাঁরা সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর অংশ নিয়ে থাকেন, ভাব-সত্তাকে গ্রহণ করেন, ধারণ করেন, জন্ম দেন—তার বীজ কোথা থেকে পড়ে কেউ জানে না। এইজন্য মেয়েদের পক্ষে যেমন অন্তঃপুরের আড়াল, কবিদের পক্ষেও নিঃসঙ্গতার একটা আব্রু দরকার—দৃশ্যত সেটা সজনেই হোক বা বিজনেই হোক। আমি অনেকদিন আমার অন্তঃপুরের বাইরে পড়ে ছিলাম, কিন্তু এখানকার প্রসন্ন ঋতুর নির্জনতার মধ্যে আমার ভিতরকার নারী প্রকৃতি জেগে উঠেছে, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমি অপেক্ষা করে আছি, আমার অন্তর প্রসারিত হয়ে নিজেকে মেলে দিচ্ছে আকাঙ্ক্ষায়, মনে হচ্ছে আমার এই চুপ করে চেয়ে থাকার অর্থ আর-কিছু নয়, শুধু একটা 'এসো'-'এসো' ডাক, একটা অবিরল আহ্বান। কখনো আসবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি যে অপেক্ষা করে ছিলাম, এইটুকুতেই আমার পরিচয় লেখা হয়ে থাক—যতদিন না সব লেখা ধুলোয় মিশে যায়।

১৯৫৩

হেমন্ত

কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজলো। ফুলে উঠলো ভিড়, ছুটে এলো, ফিরে গেলো, দ্বিগুণ বেগে ফিরে-এসে ছাপিয়ে গেলো শহর, ছড়িয়ে পড়লো ট্রামে-বাসে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে। চৌকোনো গোলদিঘি ঘিরে ছিটকাপড়ের হাট বসলো রাতারাতি ; বইয়ের পাড়া গিন্নি-পাড়ায় রূপান্তরিত হলো। বালিগঞ্জে গলা ভাঙলো দোকানিদের, কুমোরটুলিতে সারা রাত কেউ ঘুমোলো না, ফুর্তিতে পাগল হয়ে গেলো বাচ্চারা। যারা বছর ভরে খেটেছে, তাদের ছুটির সুখ শাদা মেঘের রেখায়-রেখায় আঁকা হয়ে গেলো, আর যারা বেকার কিংবা অক্ষম তারা অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য তাদের বেকারত্বের অনুমোদন পেয়ে বাঁচলো। প্রতিমা দেখার ছল করে সারাদিন পরস্পরকে দেখে বেড়ালো তরুণতরুণীরা, ভৃত্যেরা না-বলে ছুটি নিলো, উনুনের ধোঁয়ায় গলদশ্রু হলেন মহিলারা। আকাশে চাঁদ বড়ো, আর ময়রার দোকানে সন্দেশের আকার ক্রমশ ছোটো হলো। সিমেন্টের মেঝের উপর ফুটে উঠলো পুরোনো কোনো ফ্যাকাশে-হওয়া স্মৃতির মতো আলপনা, চাঁদটাকে দিগন্তের ওপারে ছুঁড়ে দিয়ে লক্ষ্মীদেবী বিদায় নিলেন। এলো কালো-কালো গম্ভীর রাত, ঘুমের শিয়রে জ্বলজ্বলে কালপুরুষ নিয়ে, কিন্তু সেই বিশাল ইঙ্গিত কেউ লক্ষ করলে না, ফুটপাতগুলিতে জেগে উঠলো কান-ফাটানো হৃৎপিণ্ড-কাঁপানো আওয়াজ। দীপাবলির নাম করে শব্দাবলির ঝড় বয়ে গেলো, শ্রবণীয় রণক্ষেত্রে পরিণত হলো কলকাতা, হাফ-প্যান্ট আর বুশ-শার্ট পরা ছোকরার দল, মাছ-পাতুরি-বোঝাই লরিতে, সচীৎকার নৃত্য করে-করে তাদের বলবন্ত যৌবনের তাড়নাকে সাময়িকভাবে প্রশমিত করলে। এর জের চললো আরো দু-দিন, তিন দিন ; হঠাৎ কোনো বোমার শামিল পটকার শব্দে রোগীর প্রাণ ধড়মড় করে উঠলো, আর তারপর—শেষ হলো, শেষ হলো শেষ পর্যন্ত। এতদিনের ডামাডোলের পর মনে হলো ট্রাম-বাস্‌গুলো ফিশফিশ করে চলছে, আর শহরটার কেমন অসুখ-থেকে-সেরে-ওঠা রোগা কিন্তু শান্তি পাওয়া চেহারা। দোকানগুলো ফাঁকা, পথে লোক কম, গাছে পাতা কম, রোদের রং বদলে গেছে, দিনের স্বাদ অন্য রকম, দ্রুত সন্ধে হয়ে যায়। ইতিমধ্যে, আমরা যখন ভোগ করছিলুম অবকাশ, উত্তেজনা বা বিরক্তি, কিংবা তলায়-ঠেকা তহবিলের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলুম, ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘটে গেছে—আমাদের আয়োজনের বাইরে, আমাদের চেষ্টা, ইচ্ছা, সংকল্পের বাইরে কোনো ঘটনা।

এমনি সময়ে কাছে এলো সে। সামনে এসে দাঁড়ালো—শান্ত, নিঃশব্দ, অনুগ্র ; উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ম্লানতার আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে ; বিষণ্ণ, কিন্তু সেই বিষাদে যেন সূক্ষ্মতম সুখের মতো শিহরন। ক্ষীণাঙ্গী, নিরাভরণ, একরঙা ধূসর কাপড়ে সংবৃত মাথাটি নিচু-করা, তার চুল তার পিঠের কাপড়ে মিশে গেছে রাত্রির বুকে সূর্যাস্তের মেঘের মতো। আমি চেয়ে দেখলুম তার মুখের দিকে, স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট মুখ তার ; চেয়ে দেখলুম তার চোখের দিকে, যে-চোখ কাঁদবে না কখনো, শুধু একফোঁটা ছলছলানি নিয়ে স্বচ্ছ, স্থির, গভীর হয়ে তাকিয়ে থাকবে। আর তাকে দেখে আমি বুঝলুম কী হয়ে গেছে এর মধ্যে—কী সেই ঘটনা, যাতে দিনের স্বাদ, জীবনের স্বাদ, অলক্ষিতে বদলে গেলো।

—কে ? তাকে দ্যাখেননি কখনো ? কখনো, মফস্বলের পথে চলতে-চলতে, কোনো সন্ধে-হওয়া সাঁকোর উপর হঠাৎ কেঁপে উঠে মনে-মনে বলেননি—'আ! আবার শীত এলো।' আর ঐ একটু হিমেল স্পর্শে অনেক-কিছু কি মনে পড়ে যায়নি আপনার—কোন দূর ছেলেবেলার স্মৃতি, জন্মান্তরের স্মৃতি যেন, বাঁশ-পচা জলের গন্ধে, জল-না-পড়া ধুলোর-গন্ধে, আকুল হয়ে ওঠেনি আপনার কল্পনায় কোনো নির্জন মাঠের মধ্যে পাৎলা নীল চাদরের মতো, গান শোনার পরে স্তব্ধতার মতো, কুয়াশা যখন ছড়িয়ে যায়, তখন দূরে কোনো আলো-জ্বলা জানলার দিকে তাকিয়ে আপনি কি এক নিমেষে বেঁচে থাকার সব আনন্দ বোঝেননি ? ভেবে দেখুন, মনে করে দেখুন, হাতের কাজ ভুলে মুহূর্তের জন্য ফিরে যান অতীতে—তারপর নেমে আসুন আপনার ফ্ল্যাট ছেড়ে রাস্তায়, কার্তিকের ধূসর স্পর্শ নিতে-নিতে চলে যান গলি পেরিয়ে, কিংবা—যদি ভাগ্যক্রমে তেমন কোনো জানলা আপনার থাকে—জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন। পিঙ্গল মেঘের মধ্যে সূর্য যেখানে অস্ত গেছে, আর সেই মেঘের ফাঁকে, গাঢ় হলুদ বিষাক্ত কোনো মদের মতো, মুমূর্ষু দিনের ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত ঝরে মিলিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তার উপরে, জঙ্গলের বাইরে পরিষ্কার এক ফালি জমির মতো আকাশে, যেখানে সারাদিনের ব্যস্ততার ঝরাপাতা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেছে হাওয়া, সেই হালকা নীল নির্মল কুট্টিমে কখন সে অলক্ষ্য এসে দাঁড়িয়েছে, নরম পায়ে, ঝাপসা কাপড়ে, চারদিকে আভার মতো ম্লানতা ছড়িয়ে। এই, এখন, কলকাতায়, আমাদের ফেনিয়ে-তোলা ফুর্তিকে যখন কিছুতেই আর টেনে রাখা গেলো না, মিলিয়ে এলো সর্বশেষ উৎসবের রেশ, তখন আমাদের ক্লান্তির উপর নেমে এলো সে, দ্বিতীয়ার চাঁদের ফালিকে কোলে নিয়ে আমাদের মনের দিগন্তে এসে দাঁড়ালো, আমাদের শূন্যতার উপর ছড়িয়ে দিলো তার বিষাদের মাধুরী, আমাদের খোয়ারির উপর বিছিয়ে দিলো তার শান্তি। সে হেমন্ত।

২

সম্প্রতি আমি হেমন্ত ঋতুর পক্ষপাতী হয়ে পড়ছি। আমার বয়স বাড়ছে, সেটাই হয়তো এর কারণ। হয়তো, জীবনের এই দ্বিতীয় বয়ঃসন্ধির সংকটকালে আমার মন তার সুরের মিল খুঁজে পাচ্ছে—উন্মন বসন্তে না, বর্ষার বিপ্লবেও না, এই শান্ত শালীন সুপরিণত হেমন্তেই। যখন যৌবনের দিনগুলি উতরোল বেগে যাচ্ছিলো, তখন মনে পড়ে না কার্তিক মাসটাকে কখনো ভালো করে লক্ষ করেছি। কার্তিক : ওটা যেন একটা অপলাপ—বছরের সুন্দর কাব্যটির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত—সে যেন থেকেও নেই, কিংবা শরতের আর শীতের মাঝখানে একটা ক্ষণকালীন অপেক্ষাগৃহের মতো টিকে আছে। তাকে আমরা সহ্য করি মাত্র, সঙ্গ দিই না ; শুধু আইনত মেনে নিই, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি না। তাছাড়া, মনে-মনে আমার বহুকাল পর্যন্ত ধারণা ছিলো যে আমাদের ষড়ঋতু একটা প্রবাদবাক্য মাত্র ; বসন্তের অস্তিত্ব আছে—বাস্তবে না, শুধু কাব্যে ; আর হেমন্ত—তাই আমি ভাবতুম তখন—আমাদের দীর্ঘসূত্রী অবসরপুষ্ট পূর্বপুরুষদের কল্পনার একটা বিলাস ছাড়া কিছু নয়। মার্ক টোয়েন নাকি ভারতবর্ষে এসে বলেছিলেন যে এ-দেশে শুধু দুটো ঋতু আছে, গ্রীষ্ম আর অতিগ্রীষ্ম ; প্রথমটিতে জানলার শিকগুলো চিটেগুড়ের মতো হয়ে যায়, আর দ্বিতীয়টিতে গলে-গলে ঝরে পড়ে ;—এই দুই অর্থে হাস্যকর অতিবাদের মধ্যে এটুকু সত্য আছে যে আমাদের প্রধানতম ঋতু হলো গ্রীষ্ম। শাস্ত্রমতে গ্রীষ্মের ভাগে দু-মাস পড়লে কী হবে—আমরা তাকে পুরো ছ-মাস ছেড়ে দিতে রাজি আছি, অনেকের হয়তো আট মাসেও আপত্তি হবে না, অন্তত পক্ষে কলকাতার লোকের হিশেবমতো তা-ই দাঁড়াবে, কেননা এখানে ইলেকট্রিক পাখা চৈত্র মাসে ঘূর্ণিত হয়ে অঘ্রানের আগে ছুটি নেয় না। ঠিক-ঠিক বসন্ত বলতে বোঝায় শুধু সেই সময়টুকু—বছরের মধ্যে দিন পনেরো সময় হয়তো—যখন আমরা গরম কাপড়গুলোকে ছাড়তেও পারছি না, সইতেও পারছি না, লেপের সঙ্গে বন্ধুতার অবসান হলেও পায়ের কাছে সেটা পড়ে থাকা চাই—এদিকে একদিন ঘুম ভেঙে দেখলুম জানলার তাকে চড়ুইপাখির নাচ, কি সন্ধেবেলা হঠাৎ চোখে পড়লো একঝাঁক শাদা-কালো হিমালয়ের হাঁস ফিরে চলেছে প্রান্তর থেকে উত্তরে। এই ক-টা দিন পেরিয়ে এলেই বসন্ত আর গ্রীষ্মে কোনো তফাৎ থাকে না, কিংবা যদি-বা থাকে, তা শুধু মাত্রাগত, প্রকৃতিগত নয়—অর্থাৎ, কম-গরমের দিনগুলোকেই কেউ-কেউ ঋতুরাজের সম্মান দিয়ে থাকেন, যদিও সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতায় গ্রীষ্ম এসে পৌঁছয় সরকারি মতে পাখা খোলার নির্দিষ্ট তারিখের অনেক আগেই। আর সেই যে আমরা বলীয়ান গ্রীষ্মের বশবর্তী হলুম, তারই জের চলতে

লাগলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ; নানা রকম আনুষঙ্গিক বৈচিত্র্যসাধন সত্ত্বেও, বৎসরের অর্ধভাগ জুড়ে তার তেজ অপ্রতিহত থাকলো। এরই মধ্যে, বনেদি রাজত্বের উপর বর্বরের অভিযানের মতো, বর্ষার উপপ্লব হয়ে গেলো, বর্ষার পরে সজল সোনালি শরৎ ঋতুকেও চিনতে পারলুম আমরা, আর তারপর শরীরের আরাম নিয়ে রৌদ্রময় শীত যখন আসে, তাকে অনুভব করতেও দেরি হয় না আমাদের। কিন্তু মাঝখানকার হেমন্ত ? কখন আসে, কখন চলে যায়, কিছুই যেন বোঝা যায় না। সে কি সত্যি আছে ? অন্তত আমি সে-বিষয়ে বহুদিন পর্যন্ত সন্দিহান ছিলুম।

এই সন্দেহের আরো-একটু কারণ আছে। আমরা অনেকাংশে বইয়ের হাতে মানুষ ; অর্থাৎ জীবন থেকে আমরা যা পাই, বই থেকেও ততটাই প্রায়, কিংবা আমাদের জীবনের আহরণগুলোকে পুষিয়ে নিই, সংবদ্ধ এবং অর্থময় করে তুলি, সাহিত্যের অভিজ্ঞতার সাহায্যে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পাওয়াটা খুব একরকম সত্য করে পাওয়া,জীবনে তার প্রভাব এড়াতে পারি না, আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার পিছনে আছে—শুধু আমাদের স্বভাব নয়, প্রিয় পুঁথির স্মৃতি, তাছাড়া বহুযুগের সাহিত্যের সংস্কার, যা এখন আমাদের অবচেতনের অংশ হয়ে গেছে। এখন আমাদের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে হেমন্তকে প্রায় একঘরে করে রাখা হয়েছে ; উল্লেখ নেই তা নয়, কিন্তু প্রেম নেই ; এই ভারতভূমির আবহমান কাব্যে বসন্ত আর শরৎ দুটি উজ্জ্বল পাড় বুনে দিয়েছে, আর তার মাঝখান দিয়ে বিপুল স্রোতে বয়ে চলেছে বর্ষা। আমাদের দেশ যেমন গ্রীষ্মপ্রধান, আমাদের সাহিত্য তেমনি বর্ষাপ্রধান—বোধহয় সেইজন্যই তা-ই। বাল্মীকির বিখ্যাত বর্ণনায় বর্ষা আর শরতের মধ্যে কোনটি বেশি ভালো সে-বিষয়ে মনস্থির করা শক্ত হতে পারে, 'কুমারসম্ভবে'র বসন্তবিলাসকে হাজার মাইল পিছনে ফেলে গড়িয়ে চলেছে 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ; বিদ্যাপতি বলতেই ভরা ভাদর মনে পড়ে আমাদের ; আর রবীন্দ্রনাথ— যদিও এডওঅর্ড টমসন তাঁকে চাঁদের আলোর কবি বলেছেন—আমরা যারা তাঁর গান শুনেছি, শুনে আর ভুলতে পারিনি, তাঁকে বর্ষার কবি না-বলে আমাদের উপায় নেই। সন্দেহ নেই, আদিযুগ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে বর্ষার অধিকার, আর তার কারণ শুধু এই নয় যে তাপের চাপে মূর্ছিত আকাশে প্রথম মেঘ দেখার মতো নিছক শারীরিক পুলক আমাদের প্রকৃতিদেবী আর কখনোই দিতে পারেন না, কিংবা এও নয় যে ঐ মেঘেরই দাক্ষিণ্যের উপর আমাদের অন্নপান নির্ভর করে। আসল কথাটা এই যে আমাদের ঋতুগুলোর মধ্যে বর্ষা সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে দৃশ্যমান, শব্দায়মান ও স্পর্শঘন ; অত্যন্ত উদাসীন মনের উপরেও দুর্বার বেগে ভেঙে পড়ে সে। আমাদের অন্যান্য ঋতুগুলোতে তীক্ষ্ণ কোনো প্রতিতুলনা নেই ; আমাদের শীত চুপি-চুপি বসন্তের মধ্যে মিশে যায়, বসন্ত দেখতে-না-দেখতে

গ্রীষ্ম হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্ষা আসে তুমুল মিছিলে, আকাশ ভরে তোলপাড় তুলে পৃথিবীময় হুলুস্থুল ছড়িয়ে ; আনে আকস্মিকের বিস্ময়, অভাবনীয় রোমাঞ্চ ; তার আবির্ভাবের প্রবলতার সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র সেই সময়ের, যখন তুষারবন্দী হিম দেশে প্রথম ফুল ফোটে, পাখিরা ফিরে আসে, মুগ্ধ মানুষের চোখের সামনে সত্যি যেন জন্মান্তর ঘটে পৃথিবীর। সমতল উষ্ণ দেশে বসন্তের তীব্রতা নেই, ঋতুরাজের ঐশ্বর্য ঠিক বুঝতে হলে আমাদের যেতে হবে কাশ্মীরে, আলমোড়ায়, নিদেনপক্ষে দার্জিলিঙে, কালিদাস যে-বসন্তের কথা লিখেছেন তারও ঘটনাস্থল হিমালয়। 'Spring, the sweet spring, is the year's pleasant king', এই গান শীতের দেশেই সার্থক ; 'Sumer is icumen in, lhude sing cuccu!' এই আনন্দধ্বনিও তাদেরই গলা ছিঁড়ে বেরোয়, যারা বরফের খপ্পরে পড়ে দীর্ঘ, দীর্ঘ রাত্রি ভরে কেঁপেছে। আমাদের বসন্ত, দক্ষিণে হাওয়ায় উতল-করা পলাশ শিমুল কৃষ্ণচূড়ায় রঙিন, কোকিলের গিটকিরিতে মুখর ; তার মধ্যে আমেজ আছে, আছে মন-কেমন করা মদিরতা, কিন্তু রাজকীয় শক্তির কোনো প্রকাশ নেই। রাজার মতো বসন্ত আসে পৃথিবীর উত্তরাপথেই, কিংবা পার্বত্য উপত্যকায় ; সেখানে সে সত্যি রাজা, জয়ী, অজগরের মতো শীতের কুণ্ডলী থেকে মুক্তির অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তার সৈন্যদল। তেমনি আমাদের বর্ষা— যখন তার মৌশুমি হাওয়া বিশাল সাগর লুঠ করে এনে তপ্ত তৃষিত পৃথিবীকে ত্রাণ করে। সেইজন্য, যেমন ইংরেজি ভাষার কাব্যে বসন্তের গুণগান, তেমনি আমাদের কাব্যে বর্ষার বন্দনা যুগে-যুগে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান—শুধু সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি নয়, আবেগেও সবচেয়ে গাঢ়, তাঁর হাত থেকে বর্ষাকে নতুন করে পেয়েছি আমরা ; আর তাঁরই জন্য বসন্তে আমরা গভীরতর নিশ্বাস ফেলি, নীলতর নীলিমা দেখি আশ্বিনে। বাংলায় ঋতুগুলির মিছিল চলেছে রবীন্দ্রনাথের পাতার পর পাতায় ; যদিও বর্ষা আর শরতের কথাই সবচেয়ে বেশি, তবু মনে হয় না কোনো সুর, কোনো মীড়, কোনো ভঙ্গি বাদ পড়েছে ; শীতের সুন্দর এক-একটি ছবি আছে 'গল্পগুচ্ছ' ও 'ছিন্নপত্রে' ; বৈশাখ দেখা দেয় বার-বার। এই রাশি-রাশি উপচারের মধ্যে শুধু হেমন্তের স্থান তেমনি সংকুচিত, যেমন কুণ্ঠিত ও অনতিস্ফুট সে নিজে। হয়তো এইজন্যই এই চতুর্থ ঋতুর পরীক্ষায় আমি ফেল হয়েছিলুম, তাকে ভালো করে লক্ষ করতেই পারিনি, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ প্রায় কিছুই লেখেননি এর কথা। যে একমুঠো গান উত্তরজীবনে তিনি একে উৎসর্গ করেছিলেন, তা যেন অনেকটা কর্তব্যবোধে লেখা, তাঁর ঋতুর পাত্র ভরে তোলারই জন্য, কিন্তু যেহেতু তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাই ওরই মধ্যে এর নির্যাসটুকু পুরে দিয়েছেন, যেমন 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি', এই ক্ষীণকায় কবিতাটুকুর মধ্যে বইয়ে দিয়েছেন গ্রীষ্মের সমস্ত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু শুধু নির্যাস নিয়ে সব সময় তৃপ্তি হয় না আমাদের, আমরা বিস্তার চাই, অবয়ব

চাই, রঙে-রেখায় বর্ণনাও চাই, আর হেমন্তের সে-রকম কোনো অভিজ্ঞান—শুধু রবীন্দ্রনাথে কেন, আমাদের কোনো কবিতেই কখনো আমরা পাইনি, যতদিন না জীবনানন্দ দাশ তাঁর চাঁদ, প্যাঁচা, কুয়াশার অদ্ভুত নতুন পাঁচালি আমাদের শোনালেন। এই উপেক্ষিতকে বরণ করলেন জীবনানন্দ ; তাঁর কাব্যে আলোর চেয়ে ছায়া বেশি, দিনের চেয়ে রাত্রি বেশি, বেগের চেয়ে বিরাম বেশি ; আমাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র হৈমন্তিক।

৩

আমি প্রথম থেকেই জীবনানন্দর ভক্ত পাঠক, কিন্তু আমি তাঁর প্রভাবে হেমন্তচেতন হতে পারিনি, জীবনের অনেকগুলো গ্রীষ্ম-বর্ষা কাটিয়ে এসে হঠাৎ একদিন স্বাধীনভাবেই কার্তিক মাসটাকে আবিষ্কার করেছিলুম। পুজোর ছুটি চলেছে তখনও, মাত্রই দু-একদিন আগে সমুদ্রতীর থেকে বেড়িয়ে ফিরেছি, কলকাতায় মন বসতে দেরি হচ্ছে। একটু মেঘ ছিলো আকাশে, হয়তো পথে পথের কুকুর ডেকে উঠছিলো। এইরকম এক উশখুশ-করা নিঃস্বাদ দুপুরবেলায়, যখন হাতে কোনো কাজ নেই আবার অবসরও ভালো লাগছে না, আমি কার্তিকের একটি বিশেষ রূপ প্রথম দেখতে পেয়ে সেই কথাটা কবিতায় লিখেছিলুম। সে-রূপ মনোহর নয়, তার অস্পষ্টতা রহস্যের ইঙ্গিত দেয় না, যেন দারিদ্র্যের মতো রুদ্ধ করে রাখে ; আলোর, তাপের ও গায়ের চামড়ার সংকোচনের এই সময়টাকে আমার মনে হয়েছিলো রুগ্ণ, নিদ্রালু, খেদময়। শীত মানেই পৃথিবীর মৃত্যু, আর হেমন্ত সেই মৃত্যুরই দূত, এই রকম ধারণা নিয়ে আরো কিছু বছর কাটলো আমার, আরো কিছু বয়স বাড়লো ; তারপর একদিন প্রথম-মোড়-ফেরা উত্তুরে হাওয়ায় শুশ্রূষার স্পর্শ পেলাম আমি, বীতরাগ নির্মম আকাশের ধ্রুপদী রেখায় কেমন একরকম সান্ত্বনা পেলাম, ছোটো-হয়ে-আসা দিনগুলোতে এক নতুন নিবিড়তার স্বাদ। চোখ খুলে গেলো, আরো-একটা জানলা খুলে গেলো মনের ; বুঝতে পারলুম পূর্বপুরুষেরা ভুল করেননি, বছরের ষড়ঙ্গ মূর্তিতে তাঁদের স্নায়ুযন্ত্রের সূক্ষ্মতারই পরিচয় আছে। প্রকৃতির অতি লঘু পা-ফেলাটি, অতিশয় হালকাকোমল, স্বপ্নে-মেশা ভাবনার মতো পলাতক—সেটিকে তাঁরা আশে-পাশের স্পষ্টতর অনুভূতির মধ্যে মিশিয়ে দেননি, তাকেও আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন। এতদিনে মেনে নিলুম হেমন্তকে, শুধু তথ্য বলে নয়, অভিজ্ঞতা বলে, বাধ্য হয়ে নয়, প্রাণের টানে, সভয়ে নয়, আনন্দে। দেখতে পেলুম সে উপস্থিত, শুধু তা-ই নয়, সে সুন্দর ; চোখে পড়লো তার সত্যকার রূপ। বয়স বাড়ার প্রধান দুঃখ এই যে আমাদের উপভোগের পরিসর অনেক কমে আসে ; সিনেমা ভালো লাগে না,

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আর ভালো লাগে না, সামাজিক বিনিময়ের যেটা প্রধান উপাদান সেই পরচর্চাও আর আনন্দ দেয় না। কিন্তু এত সব লোকশানের ফাঁকে-ফাঁকে আয়ের ঘরেও অঙ্কপাত হয় কিছু ; এমন বইয়ে ডুব দিয়ে উঠি আগে যার ধারেও ঘেঁষিনি, পুরোনো পড়ায় গভীরতর অর্থ খুঁজে পাই, অনুভূতির স্বরগ্রামে কোনো-কোনো সূক্ষ্ম শ্রুতি বেজে ওঠে ; কৌতূহলের নতুন এক-একটি পাতা, পথের ধারে জীর্ণ পুকুরে শালুকফুলের পাপড়ির মতো, সলজ্জভাবে খুলে যায়। আর এটাও কিছু কম কথা নয় যে হেমন্তকে উপার্জন করলুম এই সময়ে, চল্লিশের কুখ্যাত রেখা পেরিয়ে এসে, এই কৃশ, নম্র, করুণ ঋতুকে ভালোবাসতে শিখলুম।

পশ্চিমী সাহিত্যে খ্যাতি আছে এই ঋতুর। আমাদের সাহিত্যে যেমন বর্ষার পরেই শরতের, পশ্চিমে তেমনি বসন্তের পরেই হেমন্তের গান। ভেবে-চিন্তেই শরৎ না-বলে হেমন্ত বললুম, কেননা ইংরেজরা যাকে বলে অটাম, আর ফরাশিরা আদর করে ডাকে লোতন, সেই রিক্তপত্র পাটলবর্ণ সময়ের কোনো প্রতিচিত্র আমাদের দেশে মনেই আসে না, যতদিন না সন্ধ্যালগ্ন কান্নার মতো ছলছল করে ওঠে। শরৎ : তার মানেই উজ্জ্বলতা, আনন্দ, পুরাকালে ছিলো রাজাদের দিগ্বিজয়ে চিহ্নিত, এখন হয়েছে সর্বসাধারণের ছুটি, উৎসব, ভ্রমণের সময়। হেমন্ত মানেই সেই বেদনা, সেই বিদায়ের ভঙ্গি , 'অটাম' কথাটি উচ্চারিত হলেই আমাদের কবিতা-পড়া মনের মধ্যে যা সঞ্চারিত হয়। অবশ্য 'অটাম'ও এক নয়, দুই ; এক হলো কীটস-এর 'অটাম', কুয়াশার আর পরিপক্ব সফলতার ঋতু, পূর্ণ, তৃপ্ত, তৃপ্তির আবেশে ঘুমিয়ে-পড়া ; আর অন্যটি রিলকের—যখন পাতা ঝরে, পাতা ঝরে, পৃথিবী ঝরে যায় অন্ধকারে, আমরাও ঝরে যাই। এ-দুটোকে মনে হতে পারে পরস্পরবিরোধী, কিন্তু আসলে তা নয়, একই অবস্থার দুই স্তর এ-দুটো, একই তথ্যের দুই দিক থেকে দেখতে-পাওয়া ছবি। সফলতা, পূর্ণতা, পূর্ণ পরিণতি ; তার পরেই অবক্ষয়, তার মানেই অবক্ষয়। যে-ঋতুতে ফসল পাকে, ভাঁড়ার ভরে ওঠে পৃথিবীর, সেই ঋতুতেই সূর্য ঢলে পড়ে দক্ষিণে, এগিয়ে আসে শীর্ণতা, রিক্ততা, শীত। এই ধূসর দিকটা বাদ দিয়ে শুধু ঋদ্ধিকে দেখলে সম্পূর্ণ করে দেখা হয় না। তাছাড়া আজকাল, যখন আমরা র‍্যাশনের পুষ্যি হয়ে বারো মাস ভরে নামগোত্রহীন কাঁকরান্ন আহার করছি, তখন হঠাৎ শস্যময়ী হেমন্তলক্ষ্মীর বন্দনা গাইতে বসলে একটু বিসদৃশ হয়ে পড়ে, প্রায় বেয়াদবির মতো শোনায়। গোলাভরা ধান, পথ চলতে আমন ধানের গন্ধ, এ-সব আমাদের অনেকের পক্ষেই, স্মৃতিকথারও নয়, একেবারে ইতিবৃত্তের অন্তর্ভূত ; ও-সব আছে পুঁথিপত্রে, মাসিকপত্রের কবিতায়, সরকারি দলিলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবনে নেই। না, অন্নপূর্ণা কল্যাণীরূপে হেমন্তকে দেখতে পাইনি আমি, জীবনানন্দীয় আঘ্রাণে-ভরা অবসরের নায়িকারূপেও

না, আমি তাকে দেখতে পেয়েছি ম্লানায়মান, ক্ষয়িষ্ণু, বিষণ্ণ—কিন্তু সুন্দর, সেইজন্যেই সুন্দর। ঐ বিষাদ—পরম প্রসাধন তার—তা-ই তো তাকে দিয়েছে তার গভীর চোখ, ভাবনার মতো নরম স্পর্শ, স্মৃতির মতো মধুর তার কণ্ঠস্বর। তার শান্তির জন্য, সুমিতির জন্য, আর মৃত্যুকে মেনে-নেয়া ক্ষমাশীল হাসিটুকুর জন্য, আমি তাকে ভালোবাসলাম।

১৯৫২

আধুনিক কবিতায় প্রকৃতি

এক অতি তরুণ বাঙালি কবি, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে, পাঠকসমাজে বিক্ষোভ তুলে ঘোষণা করেছিলেন যে ভগবান ও মানুষ পরস্পরের শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী, কেননা যে-আদিমানব বিধাতার সৃষ্টি সে অসহায়ভাবে পাশব বৃত্তির অধীন, কিন্তু সেই মানুষই তার আপন সাধনার দ্বারা নিজেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত করেছে, হয়ে উঠেছে কবি ও শিল্পী, ঈশ্বরের মতোই স্রষ্টা। নবযৌবনের স্পর্ধা বলতে যা-কিছু বোঝায়, এই কবিতাটি তার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হতে পারে, এবং এর প্রথম প্রকাশের কাল আমাদের সাহিত্যপঞ্জিকায় বিদ্রোহের ঋতু বলে চিহ্নিত। পরবর্তী দশকে এক প্রবীণ মেধাবী সমালোচক কবিতাটির উদ্দেশে বক্রোক্তি করে বলেন যে ভগবান যদি মানুষকে জান্তব লালসাদি দিয়ে থাকেন, তার চিত্তের উন্নত প্রেরণাগুলিও তাঁরই দান ; আমাদের দৈহিক ক্ষুধার উৎস যদি ঈশ্বর হন, সেই ক্ষুধাকে পরাজিত ও রূপান্তরিত করার ক্ষমতাও তাঁরই কাছে আমরা পেয়েছি। সমালোচকের যুক্তি অকাট্য ; এদিক থেকে দেখলে, সন্দেহ নেই, কবিতাটিতে গূঢ় একটি ভ্রান্তি ধরা পড়ে ; লেখক যেন, তাঁর খেয়াল অনুসারে, তাঁর কুবৃত্তির জন্য দায়ী করেছেন ঈশ্বরকে, কিন্তু ভালোটুকুর জন্য নিজে কৃতিত্ব নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তিসহ কবিতা হয়তো শশবিষাণেরই নামান্তর ; অন্ততপক্ষে এ-কথা আমরা সকলেই জানি যে এই ধরনের ভ্রান্তির উপরেই জগতের বহু কবিতা প্রতিষ্ঠিত। সত্যি বলতে, কবিতাটি যুক্তির দিক থেকেও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে, যদি আমরা 'ভগবানে'র বদলে 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যবহার করি। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি উত্তেজনার উৎসস্থল প্রকৃতি ; সে আমাদের অনবরত আহ্বান করছে জৈবতার স্রোতে গা ঢেলে দিতে ; কিন্তু কবিতা একটি চিন্ময় পদার্থ, তা সৃষ্টি করতে হলে অন্তত কিছুক্ষণের মতো জৈবধর্মকে অস্বীকার করতে হয়, ঘোষণা করতে হয় চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা। অতএব কবিতা লেখার কাজটিকে প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বললে ভুল হয় না।

আমাদের দেশে বহুকাল ধরে একটা কথা চলে আসছে যে কবিরা প্রকৃতিপ্রেমিক ; অর্থাৎ তাঁরা ফুল, পাখি, রাখাল ভালোবাসেন, কলকাতার চাইতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে থাকেন সাঁওতাল পরগণায়। ধারণাটির আদি উৎস রুসো, আমরা পেয়েছি ওঅর্ডস্বার্থ ও ইংরেজ রোমান্টিকদের কাছ থেকে ; আমাদের রবীন্দ্রনাথ, মাঝে-মাঝে

আশ্চর্যরকম উল্টো কথা বলে থাকলেও, তাঁর কবিতায় ও ব্যক্তিগত আচরণে আজীবন এর বিপুল সমর্থন জুগিয়ে গেছেন। এক বিগত যুগের সাহিত্যে সার্থক হয়েছে এই প্রকৃতিপূজা, কিন্তু মাত্র দু-তিন দশকের ব্যবধানে এই করুণাময়ী দেবীটি কী-রকম করাল মূর্তি ধারণ করলেন, তা লক্ষ করলেই আমরা বুঝতে পারি যে কেন আজকের দিনে, প্রভূত চেষ্টা ও সদভিপ্রায় সত্ত্বেও হ্রদতটবাসী যাজককণ্ঠ ইংরেজ কবিকে কিছুতেই ঠিক ভালোবাসা যায় না। যাকে আমরা আধুনিক সাহিত্য বলি—আর তার মধ্যে উনিশ শতকের অবদান প্রচুর—তার একটি মূলসূত্র হলো প্রাণ ও মনের দ্বৈত, প্রকৃতি ও চৈতন্যের বিরুদ্ধতা। বোদলেয়ার ও ডস্টয়েভস্কি, মালার্মে ও র‍্যাঁবো, এডগার পো ও অস্কার ওয়াইল্ড—উনিশ শতকের এই লেখকেরা, তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে, এই কথাটি ব্যক্ত করেছেন যে নির্বোধ ও বিশৃঙ্খল প্রকৃতির উপর চৈতন্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত করাই মনুষ্যধর্ম। এর উচ্চারণ প্রথম যাঁর মধ্যে স্পষ্ট হলো তিনি বোদলেয়ার ; তাঁর ধারণায় নারী স্বাভাবিক বলেই ঘৃণ্য, এবং এক উদ্ভিদহীন ধাতুনির্মিত প্যারিস তাঁর স্বপ্নকামনা। যে-সব 'মূক ও নিশ্চেতন বস্তু' ওঅর্ডস্বার্থের উপাস্য, বোদলেয়ারের 'আদর্শ' থেকে তারা নির্বাসিত হলো, কেননা তাদের উদ্ভবের জন্য মানুষের চেষ্টার প্রয়োজন করে না, এবং তাদের অনাহত বংশবৃদ্ধি কবিকে অরুন্তুদভাবে মনে করিয়ে দেয় যে কোনো-কোনো অন্ধ প্রক্রিয়া থেকে মানুষেরও নিস্তার নেই। স্মর্তব্য, যিনি ওঅর্ডস্বার্থের প্রধান বন্ধু, সহকর্মী ও প্রচারক, তিনি স্বয়ং প্রকৃতির 'বিরুদ্ধে' এক অলৌকিক শিল্প-প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন ; কোলরিজ যদি জর্মান দর্শনে আচ্ছন্ন হয়ে কবিতাকে ত্যাগ না করতেন, তাহলে হয়তো আরো আগেই য়োরোপে আধুনিক কবিতার জন্ম হতো।

যাঁরা ঐতিহাসিক অর্থে রোমান্টিক, তাঁদের কাছে প্রকৃতি ও ভূদৃশ্য প্রায় সমার্থক ছিলো, অরণ্য, পর্বত ও নির্ঝরিণীর এক সন্নিপাতকে মানুষের ত্রাতা বলে ভেবেছিলেন তাঁরা। কোলরিজ সেই দৃশ্যাবলিকে অতিপ্রাকৃতের স্তরে উন্নীত করে মধ্যস্থলে কবিতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন ; এক বনেদি রোমান্টিকের হাতেই রোমান্টিক প্রকৃতির প্রথম পরাভব ঘটলো। আর বোদলেয়ার, কাব্যে নবযুগের প্রবর্তক, সেই সব বিবর্ণ পট সরিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হলেন না ; আধুনিক নগর তাঁর রঙ্গমঞ্চ, আর তাঁর কুশীলব—নিষ্পাপ ও প্রায় গাছপালার মতোই মনোহীন মাইকেলরা নয়, নগরের উচ্ছিষ্ট সেই বস্তিবাসীরা, যারা একাধারে অকিঞ্চন ও পাপোন্মুখ, পতিত ও মুমুক্ষু। কিন্তু এই সবই—পরবর্তী ছন্দোমুক্তি বা ব্যাকরণলঙ্ঘনের মতো, এক গভীরতর পরিবর্তনের উপসর্গ। মৌলিক কথাটি—'প্রকৃতি'।

প্রকৃতির একটা অসুবিধে এই যে ঐ একটিমাত্র শব্দের দ্বারা আমরা সব কিছুই বোঝাতে পারি, আবার অবস্থাবিশেষে তার একেবারে অর্থহীন হবারও বাধা নেই। যা

তার মধ্যে নেই, আর থাকতেও পারে না, তেমনি কোনো-কোনো গুণ প্রকৃতির উপর আরোপ করে নিয়ে তবেই মানুষ তাকে অর্চনা করতে পারে। 'মেঘদূত' কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনা একদিক থেকে নিতান্ত বাস্তবধর্মী ; যক্ষ প্রায় মানচিত্র মিলিয়ে-মিলিয়ে মেঘের গতিপথ নির্দেশ করছে ; কিন্তু ঐ সব নদী, পর্বত বা তরুপল্লব মুহূর্তের জন্যও তার বিরহজ্বালা প্রশমিত করতে পারছে না, বরং সাদৃশ্য দেখিয়ে তাকে আরো উগ্র করে তুলছে। রোমক কবি সপ্তাহান্তে সমুদ্রতীর আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে তা ক্লান্ত স্নায়ুর পুনরুজ্জীবনের একটি উপায়মাত্র, সুনিদ্রা বা স্বাস্থ্যকর বায়ুর চাইতে অধিক মূল্যবান নয়। কিন্তু রুসো তাঁর পার্বত্য দেশে বিচরণ করে সব শোকের সান্ত্বনা পেয়েছেন, আল্পস-এর দৃশ্য তাঁকে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছে ; আর রবীন্দ্রনাথ এক আত্মহারা মুহূর্তে বলে উঠেছেন—'এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ / এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলেকজান্ডার পোপ, যাঁকে বলা হয় যুক্তিবাদের প্রতিভূ, এবং পোপ-হন্তা ওঅর্ডস্বার্থ—এঁদের দু-জনেরই জপমন্ত্র প্রকৃতি : পোপ-এর 'সর্বাগ্রে অনুসরণ করো প্রকৃতিকে' আর তাঁর উত্তরসাধকের 'প্রকৃতি হোন তোমার গুরু' প্রায় আক্ষরিক অর্থে একই উপদেশ। বলা বাহুল্য, দু-জনে দুই ভিন্ন অর্থে 'প্রকৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন ; পোপ-এর কাছে তা-ই স্বাভাবিক, যা স্বভাবী, যুক্তিনিষ্ঠ ও বিধিসম্মত, এবং রুসো অথবা ওঅর্ডস্বার্থ যাকে স্বাভাবিক বলেন, তা সভ্যতার পাপস্পর্শরহিত এক অব্রণ পূর্ণতার প্রতিচিত্র। অর্থাৎ যুক্তিবাদী ও রোমান্টিকের 'প্রকৃতি' সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের আধার, কিন্তু উভয়েই প্রকৃতি নামক ব্যাপারটিকে নৈতিক মূল্যে গরীয়ান করে দেখেছিলেন ; স্বাভাবিক বলতে তাঁরা যে যা বুঝেছিলেন সেটাই যে ভালো সে-বিষয়ে কোনো পক্ষেই সন্দেহ ছিলো না। স্বীয় ধারণার অনুসরণ করে সুইফট যেমন এক অসহ্য অশ্বসমাজকে নমস্য করে চিত্রিত করলেন, রুসো তেমনি প্রচার করলেন যে 'মহান বর্বর'ই সর্বমানবের গুরুস্থানীয়। আমরা আশ্চর্য হই না, যখন লিসবনের ভূমিকম্পের খবর শুনে ভাবোন্মাদ রুসো নিজের বিশ্বাসে অটল থাকেন, আর যুক্তিবাদী ভলতেয়ার সরোষে প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন : 'কী সর্বনাশ! এ যে দেখছি বুদ্ধির সিংহাসনত্যাগ!'*

* এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু ১৮৮৭ সালে 'পুরী-তীর্থযাত্রী তরণী'র নিমজ্জন উপলক্ষে তিনি যে-কবিতাটি লিখেছিলেন তা পড়ে ভলতেয়ারের উক্তিটি মনে পড়া স্বাভাবিক, অথচ তাকে বলা যাবে না ভলতেয়ারীয় অর্থে 'অবিশ্বাসী' ; এবং অধুনা ফুটপাতে, পার্কে ও প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত অর্থে সেটি 'রাবীন্দ্রিক' কবিতাও নয়। প্রাণ ও মন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির যে-দ্বন্দ্ব রোদলেয়ার থেকে

যুক্তিবাদীরা প্রকৃতির কাছে বুদ্ধির আশা করেছিলেন, আর রোমান্টিকের প্রকৃতি ছিলো হার্দ্যগুণের অফুরন্ত ভাণ্ডার, যা-কিছু স্নিগ্ধ, সুখদ ও কল্যাণকর, রুসো তারই নাম প্রকৃতি দিয়েছিলেন। এর কোনোটাই তথ্যের সঙ্গে মেলে না। পোপের নিয়মনিষ্ঠ 'প্রকৃতি'র অস্তিত্ব নিউটনের গণিতে থাকলেও মানুষের স্বভাবে বা ভবিতব্যে নেই, তেমনি রুসোর ভৌগোলিক শুশ্রূষাকারিণীটিও আমাদের অভিজ্ঞতার একটি অংশ মাত্র। এক মিনিটের ভূমিকম্পে হাজার মানুষ প্রাণ হারালে তা নিয়ে পরিতাপ করা মনুষ্যধর্ম, কিন্তু তাকে বুদ্ধির স্খলন বললে বুদ্ধিকেই অপমান করা হয়। কেননা যে-শক্তির দ্বারা ভূমিকম্প প্রসূত হয়ে থাকে তার মধ্যে কোনো বোধ বা বুদ্ধি নেই, কখনো ছিলো না, তা নিতান্তই চিরন্তনভাবে নিশ্চেতন। এবং এই শক্তিও প্রকৃতি। এই সহজ কথাটি যদি ওঅর্ডস্বার্থ বা ভিক্তর উগোর মনে কখনো প্রতিভাত হতো, তাহলে, ১৮৩২ সালে লন্ডনে ও প্যারিসে কলেরার মহামারী দেখে তাঁরা প্রকৃতির মঙ্গলময়তার বিষয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সন্দিহান হতেন। কিন্তু প্রাণতত্ত্বের দিক থেকে প্রকৃতির স্বরূপ কী-রকম, তা ডারুইনের গবেষণার আগে স্পষ্ট হয়নি ; এবং রোমান্টিকতার পক্ষপাতী হয়েও আমরা এ-কথা মানতে বাধ্য যে কলেরার বীজাণুটা আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরপারে বিরাজ করছে, কিন্তু মেঘ বা নির্ঝরিণীর 'সৌন্দর্য' একান্তভাবে মানুষেরই হৃদয়াশ্রিত। তবু টেনিসনের 'নখদন্তরক্তিম' প্রকৃতির ধারণায় আজকাল আমরা সাড়া দিতে পারি না, এই পঙক্তিতে যে-খেদ ও সন্ত্রাস প্রকাশ পেয়েছে সেটা আমাদের অনর্থক বলে মনে হয়। চিতাবাঘ যে হরিণকে বধ করে সেটাকে কষ্টের বা ভয়ের কথা বলা যায় না, কেননা চিতাবাঘের পক্ষে ঐ কর্মই 'স্বাভাবিক'। এই যাকে 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' বলছি সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সুন্দর বা অসুন্দর নয়, আমাদের নিন্দা-প্রশংসা কোনোটাই প্রাপ্য নয় তার, কেননা তা সম্পূর্ণ অ-নৈতিক, তার ব্যবহারে কোনো বিকল্প সম্ভব নয়, এক অন্ধ অস্তিতাই তার সর্বস্ব। কিন্তু মানুষ 'আছে' বললে তার বিষয়ে সব কথা বলা হয় না, তৎক্ষণাৎ যোগ করতে হয় যে সে কোনো-কিছু বা অন্য কিছু হতে পারে। তাই সদসৎ বা সৌন্দর্যের প্রশ্ন একমাত্র মানুষের পক্ষেই প্রাসঙ্গিক। শুধু মানুষই

টোমাস মান্ পর্যন্ত প্রতীচ্য লেখকেরা বিখ্যাত করেছেন, সেই দ্বন্দ্বপ্রসূত সংশয়ের দ্বারা রবীন্দ্রনাথও যে মাঝে-মাঝে বিদ্ধ হতেন (বা অন্তত যৌবনকালে হয়েছিলেন) তার তর্কাতীত প্রমাণ আছে 'মানসী'র "নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "প্রকৃতির প্রতি", "কুহুধ্বনি" ও "সিন্ধুতরঙ্গ" এই চারটি কবিতায়। 'পঞ্চভূতে'র "মন" প্রবন্ধটির হয়তো উল্লেখ না-করলেও চলে, কেননা সেটি, পরীক্ষায় পাশ করার গরজে, অনেকেই পড়ে থাকবেন।

পারে বীর, সন্ত, অথবা শিল্পী হতে, শুধু তার পক্ষেই সম্ভব হিংসা বা আত্মত্যাগ, চেষ্টা, চিন্তা, সাধুতা বা দুষ্কৃতি। পৃথিবীতে প্রাণী যদিও অসংখ্য, মানুষের তুলনায় তাদের সপ্রাণ জড় বললে ভুল হয় না ; চেতন সত্তা একমাত্র মানুষেরই আছে। তাই মানুষ প্রকৃতিচ্যুত, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার নিদ্রাময় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্ছিন্ন, তার চৈতন্যের প্রভাবে সে যা-কিছু হতে চায়, হতে পারে এবং কখনো-কখনো হয়েও থাকে, তার সমস্তটাই প্রকৃতির বিরোধী। উনিশ-শতকী কবিদের মধ্যে এই কথাটি সবচেয়ে তীব্রভাবে উপলব্ধি ও উচ্চারণ করেন বোদলেয়ার, এবং তিনিই আধুনিক কবিতার জনক।

তিনটি বিখ্যাত কবিতা পাশাপাশি উপস্থিত করে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধনিরূপণের চেষ্টা করবো। কীটসের "ওড টু এ নাইটিঙ্গেল"-এ কাব্যকলা ও পাখির গানকে এক বলে ধরে নিতে হবে, নয়তো কবিতাটি অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। কী ভেবেছিলেন কীটস, কী ভাবছিলেন, যখন অকস্মাৎ আনন্দের আবেগে তিনি বলে উঠলেন—'হে অমর বিহঙ্গ, মৃত্যুর জন্য জন্ম হয়নি তোমার, কোনো ক্ষুধিত বংশাবলি তোমাকে নিষ্পেষিত করে না!' ফুল, মাছি বা মানুষের মতো নাইটিঙ্গেল পক্ষীও যে মরণশীল, ঐ পঙক্তিটি রচনা করার মুহূর্তে কবি তা ভুলে গিয়েছিলেন, এ-রকম প্রস্তাব করা হাস্যকর ; মনে হতে পারে যে বংশানুক্রমে পাখির গানের ধারাবাহিকতাকেই কবি 'অমরতা' বলছেন, কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে তো অন্যান্য জীবও একই প্রকার 'অমর', হঠাৎ শুধু নাইটিঙ্গেলটা ব্যতিক্রম হবে কেন? আসল কথা, কীটস যাকে অমর বলে ভাবছেন, এবং জীববংশের তুলনায় যার অমরতা আমরা মেনে নিতে আপত্তি করবো না, তা ঐ কবিতাতেই পূর্বোল্লিখিত 'poesy' ; পাখির গান এখানে কবিতা বা শিল্পকলারই নামান্তর। তবু, এই কবিতার দুর্বার সম্মোহন সত্ত্বে, এ-কথা আমরা ভুলতে পারি না যে পাখির গান শিল্পকলা নয়, বরং ও-দুই বস্তুর বৈপরীত্য স্বতঃসিদ্ধ, কেননা পাখির গান নিতান্তই প্রাকৃত, আর শিল্প মানুষের সাধনার ফল।

অবশ্য 'গ্রীশিয়ান আর্ন' কবিতায়, একটি শিল্পকর্মকে বিষয়রূপে বরণ করে কীটস নিজেই এই ভুল সংশোধন করেছিলেন ; কিন্তু যা মনে হয় 'নাইটিঙ্গেল' কবিতার সচেতন প্রতিবাদ তা, আশ্চর্যের বিষয়, ধ্বনিত হলো সেই বাঙালি কবির রচনায়, যাঁকে আমরা প্রকৃতির দুলাল বলে ধারণা করে থাকি। 'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,/ তার বেশি করে না সে দান।/ আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান, /আমি গাই গান।' এই কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ কীটসের কথা ভেবেছিলেন কিনা তা জানা যায়নি, জানবার তেমন প্রয়োজনও নেই ; আসল কথাটা এই যে পক্ষীরূপী প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্থাপন করে মানুষের চেষ্টাপ্রসূত কবিতাকে তিনি জয়ী করেছেন এখানে। আর ইয়েটস তাঁর 'Sailing to Byzantium'-এ যেন কীটসের প্রেতকে আহ্বান করে

সোজাসুজি বলে দিচ্ছেন যে তাঁর 'অমর বিহঙ্গ' বালকের কল্পনামাত্র। 'নাইটিঙ্গেল'-এ কীটস যা বলতে চেয়েছিলেন এবং তা থেকে যে-অর্থ নিষ্কাশন করে নিয়ে আমরা কবিতাটিকে ভালোবেসে থাকি, ইয়েটসের প্রথম স্তবকেই সেই কথাটি প্রাঞ্জল হলো :

That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees,
—Those dying generations—at their song,
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
Fish, flesh or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.

কেমন লঘুভাবে এই প্রবীণ কবি তাঁর তরুণ পূর্বসূরিকে স্মরণ করছেন এখানে, যেন প্রসঙ্গক্রমে অথচ নির্ভুলভাবে তাঁর জবাব দিচ্ছেন। যে-পাখি কীটসের কবিতায় 'ক্ষুধিত বংশাবলি'র আক্রমণের অতীত, সেই পাখিরই বংশাবলি এখানে মুমূর্ষু ; পাখির প্রসঙ্গে 'generations' শব্দটির ব্যবহারে ইয়েটসের এই অভিপ্রায় সুস্পষ্ট যে পাঠকের যেন কীটসের পঙক্তিটি মনে পড়ে। কোথাও নেই স্থিতি—শুধু শিল্পকর্মে আছে ; কোথাও প্রমিতি নেই, আছে শুধু 'মনীষার মিনারে'। প্রজনন ও সৃষ্টির মধ্যে ব্যবধান যে কত বিরাট তারই ঘোষণা আমরা শুনতে পাই এখানে ; রোমান্টিক ও আধুনিক কবিতাকে পৃথক করে নেয়াও সহজ হয়। ইংরেজি ভাষার এই দুটি রত্নের মধ্যে যে-ব্যবধান ছড়িয়ে আছে, তা শুধু এক শতাব্দীকালের নয় ; কবিতায় এক নতুন অন্তর্দৃষ্টি প্রবেশ করেছে, এই বিশ্বে মানুষের অবস্থা বিষয়ে অন্য এক ধারণা। এইজন্যে সাল-তারিখ দিয়ে আধুনিক কবিতার যাচাই চলে না ; অধুনারচিত অনাধুনিক কবিতারও উদাহরণ প্রচুর। কীটস ও ডি লা মেয়ারের মধ্যেও এক শতকের ব্যবধান, তবু রোমান্টিকদের সঙ্গে পরিচয় থাকলে ডি লা মেয়ার পড়ার প্রয়োজন করে না। কিন্তু অন্তর্বর্তী এক শতকে বিশ্ব-কবিতায় যা-কিছু ঘটেছে, ইয়েটসের পূর্বোক্ত কবিতাটিকে তার দর্পণ বলা যায়, এবং মূল কথাটি হলো প্রকৃতি ও চেতনার দ্বৈতের উপলব্ধি। রাইনের মারিয়া রিলকের কাব্যেও চেতন মানুষের পরিবর্তনের কারয়িত্রী প্রকৃতি নয়—তা শিল্পকলা, কোনো প্রাচীন মুণ্ডহীন আপোলো-মূর্তি, বা অর্ফিয়ুসের বংশীবাদন।

টোমাস মান্, তাঁর দীর্ঘায়িত, পুঙ্খানুপুঙ্খ জর্মান ধরনে প্রাণ ও মনের এই দ্বন্দ্বকে বিরাট ও বিচিত্রভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে হয়তো

সেই সব লেখকই অধিক ঔৎসুক্যজনক, যাঁদের রচনার চেহারায় ও চরিত্রে ঠিক মিল নেই, অথবা যাঁদের আত্মচেতনা মান্-এর মতো অত্যধিক নয় বলে, যাঁরা স্বীয় মল্লিনাথের কাজ করেননি। আমি তাই অন্য একজন বাঙালি কবির বিষয়ে উল্লেখ করে এই নিবন্ধটি শেষ করবো। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর আমি জীবনানন্দ দাশকে প্রকৃতির কবি বলে আখ্যাত করেছিলাম, সেই সঙ্গে দেখাতে চেয়েছিলাম যে তাঁর আত্মীয়তা ওঅর্ডস্বার্থের সঙ্গে নয়, কীটস ও প্রির‍্যাফেলাইট গোষ্ঠীর সঙ্গে। শুধুমাত্র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়ে বিচার করলে—"ক্যাম্পে" নামক কবিতার বিপরীত ইঙ্গিত সত্ত্বেও —এই কথাটিকে আজও হয়তো স্বীকার্য বলা যায় ; "মৃত্যুর আগে" কবিতায় স্পর্শগন্ধময় প্রাকৃত বস্তুর রোমাঞ্চকর পর্যায়ের শেষে অন্তিম স্তবকের ঘোষণাটিকে ভিত্তি করে ('আমরা মৃত্যুর আগে কী বুঝিতে চাই আর ?') আমার এ-কথা বলতেও বাধে না যে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দই মহত্তম প্রকৃতির কবি। উপরন্তু "ঘাস" নামক ক্ষুদ্র গদ্যকবিতাটি স্মরণ করলেই আমরা বুঝতে পারি যে কোনো-কোনো মুহূর্তে জীবনানন্দ হুইটম্যানীয় জৈবতার হাতেও আত্মসমর্পণ করেছিলেন, এবং অচেতনের প্রতি তাঁর এই তীব্র আসক্তির জন্য বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা বহুদিন পর্যন্ত তাঁর গুণগ্রাহী হতে পারেননি। অথচ, প্রায় "ঘাসে"রই সমকালীন, কিংবা তার কিছু পরবর্তী বহু কবিতায় আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতে প্রবেশ করছি : "নগ্ন নির্জন হাত"-এ—যেমন বোদলেয়ারে—পর্দা, গালিচা, 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ'—এই সব রচিত বস্তু সপ্রাণ হয়ে উঠছে ; "বনলতা সেন"-এ মানসীর চিত্রকল্প জুগিয়েছে—কালিদাসের উদ্ভিদ ও পশুরা নয়, 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' ও সমগ্র মানবেতিহাস। সম্প্রতি আমি এই মত প্রকাশ করেছি যে জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতায় দুই বিপরীত প্রান্তকে ধারণ করে আছেন, এই কথাটা নানা দিক থেকে যথার্থ, কিন্তু উপলব্ধির গভীরতম স্তরে এই দু-জনের সবর্ণতাও কি স্পষ্ট নয় ? যেমন সুধীন্দ্রনাথ 'আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গনে'র অন্ধ বলয়ে মর্মাহত হয়ে 'পিশাচের উপজীব্য হওয়া'কেই 'জীবনের সার কথা' বলে জেনেছিলেন, তেমনি জীবনানন্দের 'সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে' ভরে গিয়েছে তাদের কথা ভেবে, যাদের অনেক সময় 'সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে' কেটে যায়—সেই সব প্রাকৃত মানুষ, যারা 'কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে' পৃথিবীতে তাদের 'উৎসব' রাষ্ট্র করে দেয়। যদি এখনো বাংলাদেশে এমন পাঠক থাকেন যিনি জীবনানন্দকে শুধু স্নিগ্ধ, কোমল, বর্ণনানিপুণ কবি বলে কল্পনা করেন, তাঁকে আমি অনুরোধ করবো "আট বছর আগের একদিন" আর-একবার সমনস্কভাবে পড়ে দেখতে। ভীষণ সেই কবিতা, ক্ষমাহীনভাবে প্রকৃতিদ্রোহী ; "মৃত্যুর আগে" কবিতায় যা-কিছু কবি ভালোবেসেছিলেন, এক অখ্যাত আত্মঘাতী সেই সব-

কিছুর প্রত্যাখ্যানে তাঁকে বাধ্য করলো। চারদিকে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে নিছক প্রাণ, অপ্রতিরোধ্য, জান্তব প্রকৃতি : জঘন্য ক্লেদরক্ত থেকে মাছি তার খাদ্য খুঁটে নিচ্ছে, 'আরও দুই-মুহূর্তের' আকাঙ্ক্ষায় 'গলিত স্থবির ব্যাঙ' বেঁচে আছে এখনো, 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচা অন্ধকারে মূষিকহননে মেতে উঠলো : এই 'প্রচুর ভাঁড়ার'কে সজ্ঞানে উপেক্ষা করে অস্তিতার দাসত্ব থেকে স্বেচ্ছায় নিষ্ক্রান্ত হলো একমাত্র মানুষ। এই আত্মহত্যার কারণ—কবি আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন—কোনো দুঃখ বা নৈরাশ্য নয়, আমাদেরই রক্তের অন্তর্গত 'আরও এক বিপন্ন বিস্ময়'। হয়তো না-বললেও চলে যে এই বিস্ময়ের নাম মন—মানুষের সবচেয়ে বিপন্ন ও বিপজ্জনক সম্পত্তি।

১৯৬০

বরিস পাস্টেরনাক

প্রৌঢ় বয়সের একটি ক্ষতি অথবা ক্ষতিপূরণ এই যে পাঠযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা কমে আসে। যৌবনে ক্ষুধা থাকে প্রচণ্ড, দেহমনের প্রতিটি তন্ত্রী সতেজ ; তখন এক নিশ্বাসে—হয়তো একই দিনে—পড়ে ওঠা যায় টলস্টয় ও ক্নুট হামসুন, ইবসেন ও নোয়েল কোয়ার্ড ; যে-কোনো দিক থেকে অল্প একটু হাওয়া দিলেই পল্লবগুলিতে মর্মর জেগে ওঠে। কিন্তু এই আমার বয়সে, যখন পাতা ঝরে গেছে, পাখি আর ডাকে না, যখন এক আচ্ছাদিত কঙ্কালের সঙ্গে ক্ষমাহীন চেতনার যুদ্ধে অনবরত বিক্ষত হতে হয়, তখন পৃথিবীর পুস্তক ও তার প্রণেতাদের মধ্যে অধিকাংশই আমাদের পরিত্যাগ করেন—যৌবনের সেই মনোহরণরা উধাও, সেই দীপ্ত, চতুর, উন্মুখর, বিস্তীর্ণ মেলা নিস্তব্ধ ;—থাকতে হয় অপেক্ষা করে শুধু তাঁদেরই জন্য যাঁরা একা আসেন, নিভৃতে আসেন ; যাঁরা বলাৎকার করেন আমাদের উপর : আমাদের ভালো লাগা বা মন্দ লাগা, আমাদের রুচি বা মতামত—ঐ সমস্ত দরিদ্র সরঞ্জামকে ধুলোর মধ্যে গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত করে দেন দিগন্ত পর্যন্ত নিজেকে। তাই এখন যদি কখনো দুটো ঘণ্টা ফাঁকা জোটে, তাহলে হয়তো চুপচাপ বসে কাটিয়ে দিতে হয়, বা আবার কয়েক পৃষ্ঠা ডস্টয়েভস্কি, বা বোদলেয়ারের একটি-দুটি গদ্য কবিতা ;—কিন্তু কোনো নতুন লেখক ? অপরিচিত কোনো গ্রন্থ ? না—অনিচ্ছাতেও মেনে নিতে হয় যে আমার ভাগ্যে নতুন বন্ধু আর জুটবে না, বড্ড বুড়ো হয়ে গেছি।

কিন্তু বিস্মিত করে দেবার বিস্ময়কর ক্ষমতা আছে জীবনের ;—তা যদি না থাকতো তাহলে সে জীবন হতো না। মৃত্যুর পরে পরলোক যদি নাও থাকে, এই মর্ত্যভূমিতেই বার্ধক্যের পরে যৌবন আছে ; কেননা যখনই আমরা আশাতীতকে পাই, তখনই আমরা নবযৌবন লাভ করি ; আর আশাতীতের নিরন্তর সম্ভাবনার নামই সময়।

আমার পক্ষে এমনি একটি বিস্ময়, বরিস পাস্টেরনাক :—তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনা, কিংবা তাঁর পদ্যে ও গদ্যে রচিত কবিতাগুচ্ছ। গত একশো বছরের জগজ্জয়ী কৃতিত্বের পর য়োরোপকে যখন মনে হচ্ছে ক্লান্ত, যেন আর-কিছু নতুন তার দেবার নেই, যেন ভাষার মন্ত্রপূত উচ্চারণ সে ভুলে গেছে—ঠিক এমনি সময়ে, য়োরোপ থেকেই নতুন কবিতা এলো, এলো, সেই দেশ থেকে—যা সম্প্রতি সাহিত্যের মশানভূমিতে

পরিণত হয়েছে। একজন নতুন কবি এলেন। একজন কবি ; যাঁর বই খুললে রাস্তার গোলমাল আর কানে আসে না, জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যায় হঠাৎ, কান পেতে শোনে।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের নতুন খ্যাতিমানদের সঙ্গে পরিচয়ের চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু প্রতিহত হয়েছি। চেঁচিয়ে উঠে বলতে চেয়েছি 'য়োরোপ, তোমার হলো কী ? এর বেশি আর-কিছু দেবার নেই তোমার ? শুধু কেরামতি, শুধু মশলার ঝাঁঝ, ঠোঁট-কাটা বৈঠকি কায়দা, নয়তো ডাক্তার সেজে সভ্যতার শবব্যবচ্ছেদ ? আর রাশি-রাশি তত্ত্ব, বিবরণ, বর্ণনা, পরিসংখ্যান, বইয়ের বিষয়ে বই, তত্ত্বের বিষয়ে তত্ত্ব, কল্পিত কাহিনীর বদলে "সত্য ঘটনা" অবলম্বনের চরম দুর্গতি ? আর তুমি শ্রেষ্ঠ যা দিতে পারো তা কি আলবেয়ার কাম্যু, যিনি বুদ্ধির ছুরি চালিয়ে উপন্যাসের নাভিশ্বাস তুলে দিলেন, যাঁর চিকিৎসার গুণে রসরক্তমাংস ইত্যাদি উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে রচিত ভাষা হয়ে উঠলো অস্থিখণ্ডের মতো নির্মল ও নির্বহুল ? বা উইস্টান অডেন, যাঁর দক্ষতা এতই বেশি যে যে-কোনো তুচ্ছকে তিনি মনোরম করে তুলতে পারেন ? এর বেশি আর-কিছু নেই ?'

আমি মানতে বাধ্য, সাহিত্যে আমার রুচি অত্যন্ত বেশি সূক্ষ্ম নয়। আমি রক্ত মাংস রস চাই, চাই স্পর্শ, ঘ্রাণ, বাস্তবের তথ্য ; উপন্যাসে চাই চরিত্র, ঘটনা, সংলাপ, সংঘাত, প্রবাহ ; কবিতায় চাই চিত্রকল্প, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, সান্দ্রতা, সেই আর্দ্র ও ঈষৎ-অন্ধকার বাতাস, যা প্রাণের জীবাণুর পক্ষে অনুকূল। এইজন্যে, লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি, মালার্মের কবিতাকে আমার মনে হয় এমন একটি বস্তু, যা নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক হতে পারে, বা হতে পারে নিরঞ্জন ও নির্বীজিত একটি হাসপাতালের কামরা যার কোনোটার জন্যই স্বভাবত আমি উৎসুক হবো না ;—এবং একই অক্ষমতাবশত এলিয়টের 'ফোর কোয়র্টেটস'-এর অংশবিশেষে বিচলিত হয়েও তার নির্বস্তুক বহুমাত্রিক শব্দসম্ভারে আমি অস্বস্তি বোধ করি ; ঐ কাব্যের প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক ভঙ্গি, অতি সচেতন কূটাভাসের পৌনঃপুনিকতা, আর সর্বোপরি কবির সুচিন্তিত পুরোহিতবৃত্তি—এ-সবের সংসর্গে কিছুক্ষণ কাটাবার পরে আমার মন যেন অস্থির হয়ে ওঠে এমন একটি কবিতার জন্য যা তার সমস্ত আন্তরিক গূঢ়তা নিয়েও প্রথমেই আমাদের ইন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করে। আর এই রকম কবিতা, ইয়েটস এবং রিলকের পরে, যে-পাশ্চাত্ত্য কবির কাছে পাওয়া গেলো, তিনি পাস্টেরনাক।

তিনি 'মহৎ' লেখক কিনা, বা 'তর'-'তম' কোন শ্রেণীতে গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে এ-মুহূর্তে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই, এবং যে-কোনো সময়েই তা অবান্তর। অবান্তর অধিকাংশ কথা, যা, 'ডাক্তার জ়িভাগো'র প্রকাশের পরে নানা দেশে পদস্থ ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছিলেন। ঐ উপন্যাসটি একটি 'অসংলগ্ন রাজনৈতিক বক্তৃতা মাত্র,'

সোভিয়েট সম্পাদকের এই উক্তিতে যেমন সোভিয়েট সম্পাদকের নির্বোধ বিদ্বেষই প্রকাশ পেয়েছিলো, তেমনি, এর সঙ্গে টলস্টয় ও টোমাস মান্‌-এর রচনার তুলনা করে আলবের্তো মোরাভিয়াও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেননি। কোনো ক্ষতি হবে না এই গ্রন্থটির, যদি আমরা স্বীকার করে নিই এর প্রকরণগত ত্রুটি অনেক ; ডস্টয়েভস্কি তাঁর 'পুণ্যময়ী রাশিয়া'কে যা বলতেন এই উপন্যাসও তা-ই—'প্রশস্ত', এত বড়ো এর পরিসর যে বহু ত্রুটির জন্য স্থান করে দিয়েও অম্লান রয়ে গেছে—যেমন, পরিবারবর্গের চাইতে আশ্রিত বেশি, কাজের তুলনায় ভৃত্য বেশি ও আরামের পক্ষে কিছু বেশি গলিঘুঁজি নিয়েও পুরোনো আমলের রাজবাড়ি কখনো ক্লিষ্ট হতো না। অধিকাংশ ত্রুটির কারণ এই যে লেখক কবি, কিন্তু সবটুকু সার্থকতার কারণও তা-ই। আর-এক কথা :—পাস্টেরনাক যেন এই একটি গ্রন্থের মধ্যে তাঁর বহুসঞ্চিত সব কথা বলে নিতে চেয়েছিলেন—তাঁর আত্মজীবনী, তাঁর স্বদেশের ইতিহাস, তাঁর যন্ত্রণা, রাশিয়ার যন্ত্রণা, স্মৃতি, স্বপ্ন, হতাশা, আশা, বিশ্বাস—ব্যক্তিতে তাঁর আস্থা, কবিতায় তাঁর আস্থা, প্রেমে ও যীশুতে তাঁর আস্থা—সব, সব, একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে। এক কথায়, অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু তিনি, কিন্নরবংশোদ্ভূত, গীতিকবিতার উদ্গাতা, সংকেতভাষণে অভ্যস্ত, এই চেষ্টা কেন তাঁকে করতে হলো, কেন হতে হলো বিশদ, বিস্তারিত, উপাদানবহুল ? এর কারণ :—প্রথম কতিপয় কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ প্রকাশের পরে বহুকাল তাঁকে মূক হয়ে থাকতে হয়েছিলো। সাতাশ তাঁর বয়স, যখন ১৯১৭-র বিপ্লব ঘটলো রাশিয়াতে। আশ্চর্য বয়স, আর বিপ্লবই বা কম আশ্চর্য কী। ধ্বনিত হলো কবিদের কণ্ঠে অভিনন্দন:—অগ্রজ ও গুরুপ্রতিম ব্লক থেকে শুরু করে পাস্টেরনাকের সমকালীনেরা পর্যন্ত—বিদ্যুতের স্পর্শ বয়ে গেলো সকলের মধ্যে, বিদ্যুতের মতোই তীব্র ও অচিরস্থায়ী। কবিরা, কবিদের মতোই, প্রত্যেকে নিজ-নিজ ব্যক্তিগত অর্থ ভরে দিলেন বিপ্লবের মধ্যে ; তার কাছে যা আশা করলেন, কোনোকালে কোনো বিপ্লব তা দিতে পারে না। কী নিষ্ঠুর হলো মোহভঙ্গ, তা পরবর্তী কয়েক বছরের ইতিহাসে আত্মহত্যার তালিকা থেকেই বোঝা যায়।

পাঠককে অনুরোধ করছি, মুহূর্তের জন্য পাস্টেরনাকের অবস্থা কল্পনা করতে। তিনি যা বলতে চান তা বলতে পারবেন না, যে-রকম লিখতে চান তা লিখলে ছাপা হবে না, বা ছাপা হলে দণ্ডিত হবেন;—এই শর্তে তাঁকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। য়োরোপে তাঁর আত্মীয়-বন্ধুর অভাব ছিলো না, চাইলেই সীমান্ত পেরিয়ে প্যারিসে বা লন্ডনে পৌঁছনো যেতো। তাঁকে কি লুব্ধ করেনি পিস্তল, বন্ধুদের উদাহরণ মনে পড়েনি ? কিন্তু তিনি আত্মঘাতী হলেন না, দেশত্যাগীও হলেন না ; নতুন তন্ত্রকে স্বীকারও করলেন না, অস্বীকারও করলেন না ; বিনা অভিযোগে, বিনা প্রতিবাদে, শান্ত ও বিনম্র হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিলেন শেক্সপিয়র, শেলি, শিলার ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কবিদের অনুবাদ

করে ;—মস্কোর দোকানপাট থেকে তাঁর কবিতার বই লুপ্ত হলো ; 'কে পাস্টেরনাক? ও, অনুবাদক।' স্বদেশে এই পরিচয় দাঁড়ালো তাঁর। ক্ষতি হলো স্বকীয় রচনার—কিন্তু কে জানে সত্যি ক্ষতি হলো কিনা। সোভিয়েট লেখকরা যতক্ষণ জোট বাঁধছেন, দল পাকাচ্ছেন, তৈরি করছেন 'নতুন' সাহিত্যের আইনকানুন, আজ একরকম ফতোয়া জারি করে পর্শু সেটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছেন, চেঁচিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন তাসকন্দে বা ভ্রোৎসল্লাভে, যতক্ষণে ফাডাইয়েভ এলিয়ট-প্রমুখ পশ্চিমী লেখকদের রচনাকে শেয়ালের হুক্কাহুয়ার সঙ্গে তুলনা করার কয়েক বছর পরেই আত্মহত্যা করে মরেছেন—ততক্ষণ পাস্টেরনাক নিভৃতে বসে অনবরত তীক্ষ্ণ রাখলেন লেখনী, জাগ্রত রাখলেন চিন্তা— বাস করলেন ভাষার সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে, ভাষা ও ভাবনার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, শ্রেষ্ঠ কবিদের নিবিড় সাহচর্যে। এই অনুবাদকর্ম অবসন্ন করে দিলো না তাঁকে, বরং দিনে-দিনে আরো সুপক্ক করে তুললো, আবার কোনো উচ্চারণের জন্য আরো বেশি প্রস্তুত। কিছু তাঁকে বলতেই হতো, ভাঙতেই হতো মৌনতা একদিন ; বহু বছর ধরে, সারা জীবন ভরে, যা-কিছু তাঁর মনের মধ্যে জমে উঠেছিলো, কোনোভাবে তাকে নিষ্কৃতি না দিলে তাঁর নিয়তিই বা নিষ্কৃতি দেবে কেন ? সেই নিষ্কৃতির নাম 'ডাক্তার ড়্গিভাগো'।

উপন্যাসটির রচনার ইতিহাস আমরা এখনো ভালো জানি না। কবে, কতদিন ধরে লিখেছিলেন, প্রকাশের কোনো আশা রেখেছিলেন কিনা—এ-সবই আমাদের অনুমানসাপেক্ষ। নিশ্চয়ই একমাসে বা এক বছরেও লেখেননি ; হয়তো, স্টালিন আমলের ঘোর দুর্যোগের মধ্যেই, বিন্দু-বিন্দু করে ক্ষরিত করেছেন তাঁর চিত্তকে—সেই অন্ধকারে একটি ক্ষীণ, গোপন, সযত্নরক্ষিত প্রদীপ যেন। ক্ষণিক ও অলীক এক বসন্ত এলো স্টালিনের মৃত্যুর পরে ; কর্তৃপক্ষের কোনো-এক মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতির ফলে 'ডাক্তার ড়্গিভাগো'র পাণ্ডুলিপি ইটালিতে পৌঁছতে পারলো—আর তার পরবর্তী ঘটনাবলি আজ কারোরই অজানা নেই। অদ্ভুত ভাগ্য এই গ্রন্থটির—স্বদেশে ও মূল ভাষায় অপ্রকাশিত ও অপঠিত ; বিদেশে অনুবাদের সাহায্যে লক্ষ পাঠকের অনুমোদনপ্রাপ্ত ; জন্মভূমিতে অবহেলিত ও বহুনিন্দিত, দেশান্তরে আদৃত, পুরস্কৃত, আলোচিত, অভিনন্দিত। আগেও এ-রকম ঘটেনি তা নয় ; বুর্বঁ-রাজত্বের কোনো-এক অধ্যায়ে ফ্রান্সের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশিত হতো ওলন্দাজ দেশে, গত যুদ্ধের অবসানকালে টোমাস মান্-এর 'ডক্টর ফাউস্টুস' প্রথম ছাপা হলো আমেরিকায়, ইংরেজি অনুবাদে। কিন্তু কোনো-একটি গ্রন্থকে অবলম্বন করে এমন আন্তর্জাতিক অসাহিত্যিক উত্তেজনা কি আর কখনো দেখা গেছে, এমন রাজনৈতিক বিষোদ্গার ? পাস্টেরনাক কি কল্পনা করেছিলেন এই পরিণাম ? কে জানে ;—তখন সত্তর হতে বেশি দেরি নেই তাঁর ; হয়তো ভেবেছিলেন, বেরিয়ে যাক বই, আমার কথা কেউ শুনতে চায় তো শুনুক—কী আর করবে ওরা আমাকে,

কবরের দু-পা দূরে দাঁড়িয়ে আছি। এমনি—রুসোকে একবার ডাক্তার যখন বললেন আর ছ-মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু অবধারিত, সেই ছ-মাসের মধ্যে, মৃত্যুর আসন্নতার দ্বারা নির্ভীত হয়ে, তিনি তাঁর তখন পর্যন্ত অনুচ্চারিত বিদ্রোহকে এমনভাবে ঘোষণা করলেন যে সে-সব বই চৌরাস্তায় পোড়ানো হলো।—কিন্তু কী নির্যাতন, একখানা সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করার অপরাধে বৃদ্ধ কবিকে কত ভাবেই না উৎপীড়িত হতে হলো। যিনি স্বদেশেও প্রচ্ছন্ন হয়ে থেকেছেন, তিনি নিজেকে হঠাৎ দেখতে পেলেন এক বিশ্বনাটকের নায়করূপে উদ্ঘাটিত, তীব্র পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, লক্ষ চোখ তাঁর উপরে আবদ্ধ—এই বাদানুবাদ ও বিজ্ঞাপনের গ্লানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেশের পান্ডারা তাঁকে অপমানের শরশয্যায় শুইয়ে দিলে। "নোবেল প্রাইজ়" নামক বেদনাদীর্ণ কবিতায় লিখলেন—

আমি যেন এক খাঁচায় বদ্ধ জন্তু।
স্বচ্ছ, স্বাধীন আলোকে আনন্দিত
আজো কোনোখানে রয়েছে মানুষ—কিন্তু
আমি পরিবৃত শিকারির পদশব্দে।

ঘন অরণ্যে, আঁধার হ্রদের তীরে
আমি পড়ে আছি লুণ্ঠিত এক বৃক্ষ।
কোনো পথ নেই।—নেই ? তবে তা-ই হোক।
চলুক মৃগয়া, শরনিক্ষেপ তীক্ষ্ণ!

কিন্তু বলো তো কী আমার দুষ্কৃতি ?
আমি কি দস্যু ? অথবা পিশুন ধূর্ত ?
মাতৃভূমির রূপের পুণ্যস্মৃতি
জাগিয়ে, যে-আমি জগতে করেছি আর্ত ?

তবে তা-ই হোক! ... কবর অদূরবর্তী,
এবং হৃদয়ে দুর্মর বিশ্বাস
যত না ভীষণ ঘনাক সর্বনাশ
একদিন জয়ী হবে মঙ্গলবুদ্ধি।

—জয়ী হবে ? জানি না, মানবস্বভাবের উপর অত্যন্ত বেশি আস্থা রাখতে আর পারি না

আমরা। তবু বেঁচে থাকার এটুকু প্রেরণা অন্তত আছে যে এখনো মানুষের মধ্যে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই কবিকে, দেখতে পাই পাস্টেরনাকের মতো সাধু জীবন, অবিকল চরিত্র। 'খাঁচায় পোরা জন্তুর মতো' প্রহৃত হয়েও এবারেও তিনি স্বদেশে থেকে গেলেন—'এখানেই থাকবো', তাঁর এই প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে রাশিয়া শুধু ভীমবল সোভিয়েটতন্ত্রের অধিকারে নেই, রাশিয়া তাঁরও ;—মনে করিয়ে দিলেন দ্‌মিত্রি কারামাজ়হ্বকে, যে হত্যা না-করেও হত্যার শাস্তি মেনে নিলে, বরণ করে নিলে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন-দণ্ড, কিন্তু রাশিয়ার বাইরে পা বাড়াতে রাজি হলো না—সেই আশ্চর্য পাপী, প্রেমিক, ভক্ত, বিশ্বাসী, রাশিয়ান সাধক দ্‌মিত্রি কারামাজ়হ্ব। রয়ে গেলেন পেরেডেলকিনো পল্লীতে, সেই একই বাড়িতে, যেখানে একটানা কুড়ি বছর কাটিয়েছেন ; জানলার বাইরে ছোটো কবরখানা, ছোটো গির্জের উপর সবুজ ক্রুশচিহ্ন ; সেখানেই, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে, তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হলো সেদিন। কবরের উপর কাঁচা মাটি ঝরে পড়লো—যেমন ঝরেছিলো জ়িভাগোর মায়ের কবরের উপর, বৃষ্টি-পড়া কালো বাতাসে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে, মন্ত্রোচ্চারণের ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে। অবশ্য তাঁর শবযাত্রায় কেউ 'শাশ্বত স্মৃতি' গান করেনি, সোভিয়েট বেতার ও সংবাদপত্র উল্লেখ্যভাবে নীরব থেকেছে, কিন্তু আজ আমাদের দেশের খবর-কাগজের কৃশ কয়েকটি পঙক্তি পড়ে আমরা একটি গভীর ও পবিত্র বেদনার স্পর্শ পেলাম।

সোভিয়েটতন্ত্র কেন আর-একটু উদার হলো না, অন্তত সহনশীল, অন্তত উৎপীড়ন থেকে বিরত, এ-রকম আক্ষেপ যখন অর্থহীন, তখন অগত্যা ঘটনাচক্রের জন্যই দুঃখ না-করে পারা যায় না। ঢের বেশি ভালো কি হতো না, বেশি সুন্দর ও শোভন, যদি 'ডাক্তার জ়িভাগো' প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নোবেল পুরস্কারের ডঙ্কানাদ বেজে না-উঠতো, প্রতিধ্বনিতে কেঁপে না-উঠতো স্টকহলম থেকে টোকিও পর্যন্ত বাতাস—যদি বইটির যাত্রা হতো মৃদু ও অলক্ষিত, রাজনৈতিকদের দৃষ্টির অন্তরালে, যদি পাঠকদের হৃদয়ের মধ্যে ধীরে-ধীরে তা পথ করে নিতো, অজান্তে রঙিন করে দিতো দিগন্ত ? যে-বই সত্যিকারের ভালো, বেরোনোমাত্র বিপুল হবে কেন তার প্রচার, তার লেখকের মতো একটি নিভৃতির অবকাশ তার প্রয়োজন, একটি অজ্ঞাতবাসের অধ্যায় ; বিস্রস্ত যুবকদের হাতে-হাতে প্রথমে ঘুরবে সে, জ্বলবে অনেক তৃপ্তিহীন মধ্যরাত্রে, সে কি এই জগতে আসেনি প্রথমে শুধু স্বভাবকুলীনের সম্ভোগের জন্য ? যে-মানুষ পাস্টেরনাকের মতো আত্মলীন, তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে এই আকস্মিক অট্টরোল যেন ভাগ্যের একটি বিদ্রূপ বলে মনে হয়। কিন্তু ভালো বইয়ের একটি লক্ষণ আবার এই যে তা কখনোই নিঃশেষ করে না নিজেকে ; অনেক বলাবলির পরেও কিছু-না-কিছু অদত্ত থেকে যায়, কিছু লুকোনো, যা কোনো একান্ত পাঠকের কাছে কোমল হয়ে ধরা দেবে একদিন।

এমনি করে পাস্টেরনাক আজ সঞ্চারিত হচ্ছেন তাদের মধ্যে যাদের নাম খবর-কাগজে বেরোয় না, কিন্তু যাদের মধ্য থেকে, কুড়ি বছর পরে, হয়তো বেরিয়ে আসবে নতুন কবি, নতুন ভালোবাসা ;—এমনি হয়েছে চিরকাল, এমনি হয়ে থাকে। আজ আমরা একটি অগ্রিম নমস্কার জানিয়ে রাখছি সেই কবিকে, যিনি সমকালীন করাল হিম গলিয়ে দিয়ে রুশীয় সাহিত্যে আবার, অন্তত একবারের মতো, প্রাণসঞ্চার করলেন ; সৃষ্টি করলেন, জ়িভাগো উপন্যাসের সঙ্গে-সঙ্গেই, পঁচিশটি স্পন্দমান কবিতা, যা না-হলে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হতো না। রেখে গেলেন মানব-সংসারে তাঁর ইষ্টিপত্র, মুমূর্ষু বংশাবলির কাছে অমরতার একটি প্রতিশ্রুতি যেন ; এবং এর চেয়ে পর্যাপ্ত ও উন্নত ভাষায় কোনো কবি পৃথিবীর কাছে বিদায় নেননি।

প্রথম যখন এই কবিতাগুচ্ছ পড়েছিলাম, এদের অস্তিত্বে প্রায় বিশ্বাস করতে পারিনি। হৃৎস্পন্দনে এমন বেগ আনতে পারেন রিলকের পরবর্তী একজন পাশ্চাত্ত্য কবি, আধুনিকতার চার দশকের সব জটিল কলাকৌশল যাঁর নখদর্পণে? এমন সহজে জানাতে পারেন যে তিনি তাঁদেরই একজন, যাঁদের আমরা আমাদের মনের অকথ্য গোপনতার অংশ দিতে কুণ্ঠিত হবো না? আশ্চর্য এই কবিতাগুলির সরলতা, যা, বুঝতে আমাদের একটুও দেরি হয় না, অনেক ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা তিনি অর্জন করেছিলেন, যার জন্য, অনেক দুঃখের মধ্য দিয়ে, তাঁকে বাঁচতে হয়েছিলো সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। আধুনিক কবিতার চরিত্রই এই যে সে যেটুকু বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি তার বলবার থাকে ; তাই তার ঘনতা ও তীব্রতা বেশি, আর সেইজন্যই তাকে দুর্বোধ হতে হলো। এই বাদ দেবার জেদ অত্যুগ্র হলে একজন উনগারেত্তি এক পঙক্তিতে কবিতা শেষ করেন—অর্থাৎ, কোনো কবিতাই লেখেন না ; আবার বর্জনশিল্প সম্পূর্ণ বর্জিত হলে যা পাওয়া [যায়] তা মায়াকভস্কির বিপ্লবোত্তর উচ্ছ্বাস। কিন্তু কখনো-কখনো আমরা কে না আকাঙ্ক্ষা করেছি এমন কবিতা, যাতে উচ্ছ্বাস নেই, হেঁয়ালিও নেই ; যাতে যথাসম্ভব সবই বাদ গেছে, অথচ যাকে পাবার জন্য পণ্ডিত হতে হয় না, জানতে হয় না নৃতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম, বা কবির ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী? কী দুরূহ এই সমন্বয়, তা আমরা তখনই বুঝি, যখন দেখতে পাই, আধুনিক কবিতায় তার উদাহরণ কত বিরল। জ়িভাগোর কবিতায়, আমি বলতে চাই, পাস্টেরনাক এই দুই বিপরীতকে মিলিয়েছেন।

আর-একটি বিস্ময় এই যে পঁচিশটি কবিতার মধ্যে অন্তত সাতটি আছে সরাসরি প্রেমের কবিতা। স্ত্রী-পুরুষের পার্থিব ভালোবাসা, যার উচ্চারণ উনিশ শতকে বোদলেয়ার ভের্লেন পর্যন্ত অকুণ্ঠিত, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যে তা সাধারণত পটভূমিকার কাজ করে ; সেটা আর প্রধান নেই, সমগ্রভাবে জীবন তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। উত্তরজীবনে ইয়েটসকেও ঋজুকথন ত্যাগ করতে হলো। এর ফলে কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, আর

আমরা তিন দশক ধরে এতেই অভ্যস্ত হয়েছিলাম। প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে এই আত্মসচেতন যুগে চাতুরী ভিন্ন প্রেমের কথা বলা যাবে না। পাস্টেরনাক আমাদের সেই ভুলও ভাঙালেন। প্রেমের কবিতা—মানে, প্রেমের বিষয়ে নয়, কোনো বাস্তব নারীর উদ্দেশে বা স্মরণে যে-রচনা উৎসারিত হয়, পাস্টেরনাকের পূর্ব-পর্যায়েও তার উদাহরণের অভাব নেই ; তিনি, এমনকি, যুদ্ধ ও বিপ্লব থেকে চিত্রকল্প সংগ্রহ করে তাঁর আরাধ্যাকে এমনভাবে সজীব করে তুলেছিলেন, যাতে পাঠকের বুঝতে ভুল না হয় এই অগ্নিকুণ্ডের পরপারে কোন আকাশে ধ্রুবতারা জ্বলছে। ১৯২১ সালে একটি কবিতা লিখেছিলেন, 'মানুষ ছিলুম আমরা। এখন হয়েছি যুগ।'—এই পঙক্তির সূক্ষ্ম ও সর্বনাশী বিদ্রূপ অনেক যুগান্ধ চোখে ধরা পড়েনি তখন, অনেকেই একে বিপ্লবের বিজয়-ঘোষণা বলে ভেবেছিলেন। অবশেষে, তাই, আরো স্পষ্ট করে না-বলে পারলেন না যে ঈশ্বরের পরম সৃষ্টি হলো ব্যক্তিমানুষ—যেমন, একশো বছর আগে, মিল্-বেন্টামের উপযোগবাদের প্রতিবাদে, ডস্টয়েভস্কি তাঁর 'ভূতলবাসীর আত্মকথা'য় বলেছিলেন—তাঁকে বলতে হলো যে 'যে-কোনো "বাদ" অথবা তত্ত্বকে নিঃসীমভাবে ছাড়িয়ে যায় জীবন', 'মানুষের মুক্তি হয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে নয়, বর্জন করে', আর মানুষের পক্ষে যা সত্য কাজ, সত্য ভাবনা, তা জগতের পুনর্গঠন নয়, তা 'জীবনের রহস্য, মৃত্যুর রহস্য, তা প্রতিভার উদ্ভাস, ভালোবাসার মাধুরী।' এই ভালোবাসাকে, পূর্ববর্তী বহু কবি ও মরমীর মতো, পাস্টেরনাক দুই দিক থেকে উপলব্ধি করেছেন ; তার প্রথমটি নারী। বরফ-চিবানো আধপাগলা মেয়ে আঙুলে-ফুটে যাওয়া শেলাইয়ের ছুঁচ, পিটার্সবার্গের জানলা দিয়ে দেখা গ্রীষ্মকালীন শাদা রাত্রি— এই সব সহজ ও বাস্তব তথ্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সহজে তিনি আমাদের শুনিয়ে দিলেন নক্ষত্রের গান, দেবদূতের বন্দনা। নারীর 'পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা'কে চিরন্তন ভক্তির পাত্র করে তুলে মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন। আর এই প্রেমেরই সংলগ্ন ও পরিপূরক তাঁর পূজা—আমাদের রবীন্দ্রনাথেও কি তা-ই নয় ?—তাই, যেমন একদিকে নারী, তেমনি অন্য দিকে তাঁর দেবতাকেও বার-বার বিশ্বাসযোগ্যরূপে প্রতিভাত করেছেন আমাদের চোখের সামনে।

যীশু তাঁর দেবতা। 'জ়িভাগো' উপন্যাস থেকে যীশুর প্রসঙ্গ কখনোই দূরে থাকছে না, জ়িভাগোর কবিতার মধ্যেও ছয়টি আছে প্রত্যক্ষভাবে যীশু-জীবনী সংক্রান্ত, এবং হ্যামলেটের মুখেও যীশুর উক্তি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই খ্রীষ্টীয় কবিতাগুচ্ছের সঙ্গে এলিয়টের "জার্নি অব দি মেজাই" ও "অ্যাশ-ওয়েনসডে"র তুলনা করতে লুব্ধ হচ্ছি। মনে হয়, এলিয়ট একজন অতি সভ্য সংশয়বাদী মানুষ, যিনি বিশ্বাস করার জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট, আর পাস্টেরনাকের বিশ্বাস তাঁর রক্তেমজ্জায় মিশে আছে। এই পার্থক্যে কবিতার যাথার্থ্যে কোনো তফাৎ হয় না, কিন্তু আস্বাদে পরিবর্তন ঘটে। ডস্টয়েভস্কি ও টলস্টয়কে

স্মরণ করে বলতে পারি যে রুশীয় প্রতিভা যে-ভাবে ধর্মকে জীবন্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে পারে, দান্তের পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্যে তার কোনো তুলনা আমার জানা নেই। এই ধর্মীয় শিহরন পরবর্তী ব্লকের কাব্যেও পরিকীর্ণ, সম্প্রতি পাস্টেরনাকেও তা-ই পাওয়া গেলো।

ঈশ্বরের পরম সৃষ্টি যদি ব্যক্তি হয়, তাহলে যীশু হলেন ব্যক্তিপরম : এই হলো পাস্টেরনাকের ধারণা। পূর্ণ মানব তিনি, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বরূপের অবতার। তাঁর জন্মের আগে মানুষ ছিলো, কিন্তু ইতিহাস ছিলো না ; পৃথিবী ছিলো, কিন্তু স্বর্গে-মর্ত্যে সেতু রচিত হয়নি। আগে ছিলো সংঘ, সেনানী, কলরোল, লক্ষ-লক্ষ য়িহুদি ও রোমকের উচ্ছ্বাস, ছিলো জনতা, জয়যাত্রা, প্রচণ্ড ও সমবেত শৌর্য। যীশুর সঙ্গে পৃথিবীতে এলো ব্যক্তিমানুষ, রিক্ত, একা, অবন্ধন, স্বপ্নাদিষ্ট, এক নিজস্ব ও গোপন ভাবনায় তন্ময়। এক নির্জন গৃহকোণে বসে এক দরিদ্র নগণ্য কুমারী নিজের মধ্য থেকে তাঁকে নিঃসৃত করলেন—সমাজের বিরোধী সেই মাতৃত্ব, প্রকৃতির বিরোধী, তার উৎস বাধ্যতা নয়, অনুপ্রেরণা। এই জন্ম অলৌকিক, য়িহুদিদের লোহিতসাগর-উত্তরণও তা-ই ; এবং এই দুই অলৌকিকের প্রতিতুলনা করে পাস্টেরনাক দেখিয়েছেন খ্রীষ্টপূর্ব জগতের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় জগতের কত বড়ো মৌলিক প্রভেদ ঘটে গেছে।

আমি স্বীকার করছি, খ্রীষ্টধর্মের এই ব্যাখ্যায় আমার মন সহজে সাড়া দেয়। কিন্তু আমরা হিন্দু, আমাদের পক্ষে নিজেদের বা অন্যদের কোনো ধর্মই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তত্ত্বের দিক থেকে পাস্টেরনাকের কথা যদি মানতে না পারি, তার কারণ আমি ভারতবর্ষে জন্মেছি। কিন্তু তত্ত্বের কোনো কথাই নেই এখানে, মানা বা না-মানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ;—আর এই কথাটা, সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমরা হিন্দু বলেই ভালো বুঝতে পারি। পৌত্তলিক আমরা, আমাদের কাছে সবই রূপ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে রূপক বা প্রতীক ; আমরা জানি যে ধ্যান ভিন্ন মুক্তির পথ নেই—সেই ধ্যানের লক্ষ্য যা-ই হোক, তাতে এসে যায় না ; হোক না তা নারী, বা কবিতা, বা দেবতা— হোক না সেই দেবতার নাম বিষ্ণু বা যীশু, মাতা মারিয়া বা বধূ-রাধিকা—যদি সত্যি কেউ একান্তভাবে সমর্পণ করতে পেরে থাকেন নিজেকে, তিনিই মোক্ষের পথে অন্তত কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন।

১৯৬০

পাস্টেরনাক প্রসঙ্গে
অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা খোলা চিঠি

প্রিয়বরেষু,

এই 'প্রতিবাদ' লিখবো না ভেবেছিলাম। আপনার ও আমার মধ্যে কিছুদিন ধরে যে-ব্যবধান ধীরে-ধীরে গড়ে উঠছে, যা আমরা দু-জনেই মাঝে-মাঝে অনুভব করেছি কিন্তু কেউই এ-যাবৎ প্রকাশ করিনি, তাকে নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়া আমার অভিপ্রায় ছিলো। ভুলে থাকা নয়, নিজের মনে অস্বীকার করা নয় (কেননা সেটা অসম্ভব): শুধু এড়িয়ে যাওয়া। সাযুজ্যের একটি তো সূত্র আছে : আপনি মাঝে-মাঝে বাংলা ভাষায় কবিতা লেখেন, এবং আমিও কথঞ্চিৎ সেই চেষ্টা করে থাকি ; অনেক, অনেকবার এই 'কবিতা' পত্রিকায় অংশী ও সঙ্গী হয়েছি আমরা ; 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা প্রকাশ থেকে এজ্‌রা পাউন্ডের 'পুনরুজ্জীবন' পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় যুক্ত থেকেছি। আর শুধু কি তা-ই ? আলাপে আলোকিত কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এই রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর ফ্ল্যাটে মধ্যরাত পেরিয়ে-যাওয়া স্তব্ধতায় ; কখনো মার্চ মাসের কনকনে ঠাণ্ডায় বস্টনে, কখনো বা ন্যুয়র্কের পথে ঘুরতে-ঘুরতে ড্রাগস্টোরের অবকাশে। আমি কি কখনো ভুলতে পারবো যে ন্যুয়র্কের এয়ারপোর্টে নেমেই আপনার একটি বার্তা পেয়েছিলুম, হোটেলে পা দিয়েই আর-একটি, হোটেলের ঘরে পৌঁছনোমাত্র আপনার টেলিফোন—আর তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাক্ষাৎ আপনাকে? কোনোরকমে সময় করে নিয়ে আপনার কর্মস্থল থেকে চলে এসেছিলেন সেদিন, যেমন আবার এসেছিলেন আমার বিদায় নেবার দু-দিন কি তিন দিন আগে, সেই একই নিদ্রাহীন ন্যুয়র্কে। রাত বারোটার ট্রেনে আপনি বস্টনে ফিরে যাচ্ছেন, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে আপনার সঙ্গে বসে আছি। সামনে কফির পেয়ালা, কিন্তু আপনারটি অস্পৃষ্ট। কথা চলছে, কিন্তু আমি প্রায় নীরব ; আপনার আশ্চর্য শিল্পিত মৌখিক বাংলা ভাষা অবিরলভাবে ঝরে-ঝরে কফিতে সর ফেলে দিলে। কথার বিষয় ?—কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, বিদায়ের মুহূর্ত, রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীর কবিতা—সেবারেও, অন্য অনেকবারের মতো, আমার মনে হয়েছিলো যে অন্য সব কাজ কিছুদিনের মতো বন্ধ রেখে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি বই লেখা আপনার কর্তব্য—আর তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আপনি উঠে দাঁড়ালেন, আমার হাতে

আস্তে একবার হাত রেখে বললেন, 'চলি। এই রকমই ভালো।' বলে আর এক মুহূর্ত দেরি না-করে বাইরের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। তখন ট্রেন ছাড়ার মিনিট পাঁচেক বাকি ; অনেক হেঁটে, অনেক সিঁড়ি ভেঙে, আবার বহুদূর হেঁটে তবে পৌঁছনো যাবে ট্রেনে, কিন্তু আমি জানি সে-রাত্রের বস্টনের ট্রেন আপনাকে ফেলে যাত্রা করতে পারেনি।

এ-সব কথাই মনে পড়ছে আমার, আজ আপনাকে লিখতে বসে ; আর তার ফলে আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছে আমার পক্ষে কলম চালানো, এই পত্র শেষ করার সব ইচ্ছা উবে যাচ্ছে। এই যে কুড়ি বছরের সংসর্গ আমাদের, তা-ই কি যথেষ্ট নয়, তা কি এমন-কিছু নয় যার প্রতি শ্রদ্ধাবশত কোনো-কোনো বিষয়ে নীরব হয়ে থাকতে পারি আমরা ? তা-ই চেয়েছিলুম আমি, আর সেইজন্য পাস্টেরনাক বিষয়ে আপনার দ্বিতীয় পত্রটি আমাকে বিষাদে ব্যাকুল করে তুলেছে। আটবার কি দশবার চিঠিখানা পড়েছি আমি, এবং যতবার পড়েছি ততবার গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছি—ক্ষুব্ধ নয়, তর্কের দিকে উদ্বুদ্ধ নয়, শুধু ব্যথিত। কী দরকার ছিলো এই বিতর্কের, এবং কে এই পাস্টেরনাক যে আপনার ও আমার মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে ? কিন্তু কথাটা পাস্টেরনাককে নিয়ে নয়, 'ডাক্তার জ়িভাগো' উপন্যাসটি নিয়েও নয়, ও-সব উপলক্ষ মাত্র ; আসল কথাটা আমাদের মনের সেই গভীরতম স্তরকে স্পর্শ করে আছে, সেই ভূমি ও ভিত্তি, যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে ডাল, পাতা, মঞ্জরী ও ফলের মতো আমাদের সব কথা ও নীরবতা, সব চেষ্টা ও প্রতীক্ষার প্রহর। পাস্টেরনাক আমাদের পক্ষে কিছুই না-হতে পারেন, কিন্তু তিনি আজ যে-প্রশ্নের প্রতীক হয়ে উঠেছেন সে-বিষয়ে কিছু অনুভব করবো না এমন সাধ্য আমাদের নেই। অনুভব করেও নীরব থাকা যেতো না তা নয়, কিন্তু আপনি আপনার পত্রখানা 'কবিতা'য় প্রকাশ করার ইচ্ছে জানিয়েছেন, এবং আপনার আদেশ আমার পক্ষে অবশ্যমান্য। কিন্তু—আর সেটাই সবচেয়ে দুঃখের কথা আমার পক্ষে—ওটি প্রকাশ করতে হলে আমাকেও কিছু বলতে হয়, আর আমি কিছু বলতে গেলেই আপনার সঙ্গে আমার ব্যবধান সোচ্চার হয়ে পড়বে।

কিন্তু গদ্য করে বলার কি প্রয়োজন আছে ? যে-কোনো বুদ্ধিমান পাঠক, যিনি আপনার কবিতার সঙ্গে পরিচিত, এবং আমারও কিছু রচনা যাঁর চোখে পড়েছে, তিনি কি অনায়াসে বলে দিতে পারবেন না যে জগতের নানাবিধ ব্যাপারে আপনার ও আমার ধারণা শুধু মুখোমুখি হতে পারে, পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে না ? শ্রীযুক্ত যামিনী রায় বলেন যে কোনো-একটা ঘটি-বাটি দেখলেই সেই বিশেষ জাতির সমগ্র মানসতা ও জীবনধর্মের বিবরণ বলে দেয়া যায় ; তা কতদূর সম্ভব জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে কোনো-একজন কবিকে তাঁর রচনা থেকেই রচনা করে নেয়া যায়, কবিতা যে-পরিমাণে খাঁটি ঠিক সেই পরিমাণেই কবির ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে তার মধ্যে ; সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম

প্রভৃতি বিষয়ে কবিতা যদি ভাষার দ্বারা একটি কথাও না বলে, তবু প্রচ্ছন্নভাবে, কিংবা নীরবতার দ্বারা কিংবা শুধু ভঙ্গির সাহায্যে সব কথাই বলে দেয়। আপনার কবিতার প্রতি দুর্বার আমার অনুরাগ, অথচ আমি জানি যে আপনার আর আমার পথ প্রথম থেকেই ভিন্ন হয়ে গেছে ; আপনি যোগ দিয়েছেন মিছিলে, আর আমি স্বভাবত বিবরবাসী ; আপনি ঘোষণা করেছেন মিলন, আর আমি বিচ্ছেদবেদনায় সন্তপ্ত ; আপনি ইতিমধ্যেই অতিথিকে প্রাণলক্ষ্মীর পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে দিয়েছেন, আর কিমিয়া-ক্লান্ত আমার দ্বার থেকে আজকের দিনের আগন্তুকেরা ফিরে যাচ্ছে। এবং এ-সব কথা আপনিও জানেন, তরুণতর বাঙালি সাহিত্যিকেরাও জানে না তা নয়। অতএব, আমাকে এখন যা বলতে হচ্ছে তা নতুন কথা নয়, বুদ্ধিমান পাঠকের মনে তা অনেক আগেই প্রতিভাত হয়ে থাকবে : সে-কথা এই যে সাহিত্য বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, ধর্ম বলতে আপনি যা বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, এবং সাহিত্যব্যাপারে রাজনীতিকে আপনি যে-আসন দিয়ে থাকেন আমি তা দিতে প্রস্তুত নই।

এই স্বীকারোক্তির পর তর্কের অবকাশ কোথায় ? জ়িভাগোর প্রতি যে-সব বিশেষণ আপনি নিন্দার অর্থে প্রয়োগ করেছেন—'আত্মকেন্দ্রিক', 'চৈতন্যসাধক', 'আত্মবিভক্ত', 'জটিল'—আমি সেইগুলোই প্রশংসার অর্থে ব্যবহার করবো। আপনার আপত্তি জ়িভাগো এমন একজন মানুষ হননি, 'লোকেরা' যাঁর 'যশোগান' করতে পারে ; আমার মতে, 'লোকেরা' তাঁর যশোগান করলে তাঁর বিষয়ে উপন্যাস লেখা নিষ্প্রয়োজন হতো, কিংবা কেউ লিখলেও সে-উপন্যাস পাঠযোগ্য হতো না। 'খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতা'রূপে জ়িভাগোর ব্যবহার আপনার 'বিচিত্র' বলে মনে হয়েছে, কিন্তু আমি দেখছি জ়িভাগো ধর্মের 'ব্যাখ্যাতা' নন, তিনি এক ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি, যাঁর বিশেষ ও ব্যক্তিগত খ্রীষ্টের সঙ্গে ডস্টয়েভস্কি ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। যদি আপনাকে ভুল বুঝে থাকি তো ক্ষমা করবেন ; কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে লৌকিক সাধুতাকে আপনি ধর্মপ্রবণতা বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক করে দেখেছেন ; আর আমার ধারণা, ও-দুই বস্তু পরস্পর-সম্পৃক্ত হলেও সব সময় সহবাসী হয় না। রবীন্দ্রনাথের পানুবাবু 'সাধু' ব্যক্তি সন্দেহ নেই ; কারো কাছে চার আনা ধার নিয়ে তিনি তা ফেরৎ দিতে ভুলে যাবেন এমন কথা কল্পনাতীত, কিন্তু তবু—অথবা সেইজন্যেই—তিনি হীন আত্মার মানুষ, তাঁর চরিত্রে বহু সামাজিক গুণ বিরাজ করলেও আধ্যাত্মিকতা অসম্ভব। পক্ষান্তরে, ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে যারা চোর, প্রতারক বা কামমোহিত (আপনার ভাষায় 'কামুকতায় দুর্বল'), বা এমনকি হত্যাকারী, তাদের মধ্যেই সবচেয়ে তীব্র হয়ে ফুটেছে ঈশ্বরের জন্য আকাঙ্ক্ষা, তাদের তুলনায় সাংসারিক সজ্জনেরা কৃতী হলেও, সুখী হলেও, জীবনের প্রধান প্রশ্নগুলি

সম্বন্ধে অচেতন অথবা নির্বোধ। যারা 'খারাপ লোক', তাদের উঁচু ও উজ্জ্বল করে তুলে ধরে ডস্টয়ভেস্কি যে পাপের সমর্থন করছেন না তা না-বললেও চলে, কিন্তু এইভাবে যে-সত্যের মুখোমুখি তিনি আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন তা প্রায় সহনাতীত। 'অমুক ব্যক্তি খারাপ'—এই উক্তির মধ্যেই অন্য একটি কথা প্রচ্ছন্ন থাকে—'আমি কিন্তু ভালো' ; অন্যকে উন্মাদ বা অপরাধী বলে ঘোষণা করে নিজেদের আমরা প্রকৃতিস্থ বা সাধু জেনে নিশ্চিন্ত হই ; এই আত্মপ্রসাদের জন্যই নিন্দা অথবা পরচর্চা মানুষের পক্ষে অন্তহীনরূপে তৃপ্তিকর, এবং আইনকানুন ও সামাজিক বিধান—যার সাহায্যে অঙ্ক কষে 'অপরাধ' নির্ণয় করা যায়—নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এবং এই আত্মপ্রসাদ ধ্বংস করে দিয়ে ডস্টয়েভস্কি জাগিয়ে তোলেন আত্মজিজ্ঞাসা ; এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা সাংসারিক ভালোমানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ নিজেদের সাধু বলে জেনেছি, কিন্তু ডস্টয়েভস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী বলেই জানে, তা জানে বলেই পুণ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা তাদের জ্বলন্ত, এবং সেই হিশেবে তারা আমাদের চাইতে উন্নত মানুষ, চৈতন্যে উন্নত, এবং চৈতন্য মানেই আধ্যাত্মিকতা। যারা সামাজিক বিধিবিধানের অনুগত হয়ে কোনোরকমে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দেয়, যারা স্বার্থসিদ্ধির কারণে বাধ্য না-হলে অন্যের কোনো ক্ষতি করে না, এবং অহমিকার কণ্ডূয়ন ব্যতীত অপরের জন্য কড়ে আঙুলটি তুলতে হলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা আসলে না-ভালো না-মন্দ না-কোনোকিছু,—দান্তে তাঁর নরকেও তাদের প্রান্তিকভাবে রেখেছেন—যদিও সংসারে তারাই অধিকাংশ এবং তারাই সজ্জন বলে পরিচিত। দুর্লভ, অতি দুর্লভ সেই সাধুতা, যা সচেতন, সদর্থক ও সকর্মক, যা কতগুলো নিষেধপালনের সমষ্টিমাত্র নয়, মানুষের অন্তঃস্থিত অকল্যাণ ও বৈনাশিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সজ্ঞান, এবং সর্বমানবের দুঃখভার নিজের মধ্যে বহন করা যার তপস্যা। সত্যকার সাধুতা—যাকে পুণ্যময়তা বলা যায়—তার অর্থ আমরা বুঝতে পারি যখন যুধিষ্ঠির নরকবাসীদের আর্তি দেখে নিজেও চান নরকবাসী হতে, কিংবা ফাদার জ়সিমা দ্‌মিত্রি কারামাজ়হবের আসন্ন ও বিপুল দুঃখের সামনে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন। এখন কথাটা এই যে যুধিষ্ঠির বা ফাদার জ়সিমা কোটিতে একজন মেলে না, কিন্তু কোটি-কোটি সাধারণ, স্বভাবী, অজ্ঞান ও সামাজিক হিশেবে নিরপরাধ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি বরেণ্য সেই ইভান ও দ্‌মিত্রি কারামাজ়হবেরা, যারা আইনের অর্থে অপরাধী না-হয়েও নৈতিক অর্থে অপরাধী বলে জানে নিজেদের, এবং সেই জ্ঞানের ফলে বরণ করে শাস্তি, বরণ করে দুঃখ, মাথা পেতে তুলে নেয় আমাদের সকলের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু আপনি, আমি লক্ষ করছি, দুটি পত্রের কোনোখানেই ডস্টয়েভস্কির নাম করেননি, যদিও টলস্টয়, টুর্গেনিহব ও চেখহবের উল্লেখ একাধিকবার ঘটেছে। এই

বর্জনকে আপনার অভিপ্রেত বলে ধরে নিচ্ছি, তা না-নিলে আপনার মনীষিতাকে অসম্মান করা হবে। রাশিয়া বলতেই আমার যাঁকে মনে পড়ে আপনি রুশ সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে এড়িয়ে চলেন, এই তথ্যটিতেই আপনার ও আমার ব্যবধানের মূলতত্ত্বটি লুকোনো আছে। জ়িভাগোর 'সাংঘাতিক আত্মবন্দী দশা' আপনাকে আহত করে, যখন সে 'একেবারে নিছক গুন্ডার হাতে জেনে-শুনে প্রাণতুল্য লারিসাকে তুলে দিল', কিন্তু আমার কাছে এই ঘটনা শুধু বোধগম্য নয়, ইঙ্গিতময়, কেননা এ থেকে আমার মনে পড়ে যায় আরো ভয়ংকর এক ঘটনা, 'দি ইডিয়ট' উপন্যাসে নায়িকার হত্যাকাণ্ড, যার সম্ভাবনা প্রথম থেকে জেনেও, এবং চরিত্রের আশ্চর্য সাধুতা সত্ত্বেও প্রিন্স মিশকিন যা নিবারণ করতে পারেননি। জ়িভাগোর সামনে অন্য একটিমাত্র বিকল্প ছিলো ; লারিসাকে (তার কন্যাসমেত) নিজের কাছে রেখে সমবেত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে পারতো সে ; কিন্তু সে বেছে নিলে সেই পথ, যেটা তার নিজের পক্ষে বেশি দুঃখের। সেই দুঃখের মহিমা যে-পাঠককে স্পর্শ না করে, তিনি মিশকিনের অক্ষমতাকেও ক্ষমা করতে পারবেন না, এবং যে-মানুষ হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিবেকপীড়নে ও আত্মহত্যার জল্পনায় কাল কাটায় সেই হ্যামলেটকে তাঁর মনে হবে 'স্নায়বিক আক্রোশ'-পূর্ণ 'বাক্যশীল বিলুব্ধ মননজীবী'।

আপনাকে জিগেস করতে ইচ্ছে করে : 'ডাক্তার জ়িভাগো' উপন্যাসটির কী-রকম পরিণতি ঘটলে আপনার মনঃপূত হতো। যদি শেষ পরিচ্ছেদে জ়িভাগোকে দেখা যেতো লারিসার বিবাহিত স্বামী এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহলে ? কিন্তু স্থিতি ও পারিবারিক সুখের প্রধান পুরোহিত টলস্টয়ও আনা কারেনিনার সঙ্গে তার স্বামীর অশ্রুপ্লুত ও ক্ষমাসুন্দর পুনর্মিলন ঘটাতে পারেননি, বরং আমাদের সব অনুকম্পা টেনে নিয়ে গেছেন অন্যায়ভোগী স্বামীর দিক থেকে অন্যায়কারিণী অসতী স্ত্রীর দিকে, তার আত্মহত্যারূপ মহাপাপের জন্যও নিন্দার সম্ভাবনা লুপ্ত করে দিয়েছেন। এমনকি রামায়ণও নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলনে শেষ হতে পারলো না, পুনরায় এক চরম বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কবি তাঁর রাম ও সীতাকে করে তুললেন চিরকালের মতো স্মরণীয়। নিষ্ঠুরতা আর্টের একটি মূলসূত্র ; 'জীবনে'র মানদণ্ডে তার কিছুই বোঝা যাবে না। সত্য, আমরা জীবনে চাই সুখ, শান্তি ও স্থিতি ; 'আমরা' অর্থ অধিকাংশ মানুষ ; কিন্তু প্রত্যেক মানুষই তা চায় না, মানুষের মধ্যেই জন্মায় বীর ও শহিদ, বৈরাগী ও সন্ত ; এবং এই বীর, শহিদ ও সন্তদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ যে দুর্বার তাতেই প্রমাণ হয় যে আসলে, এবং মনের গভীরতম স্তরে, আমরাও সুখ, শান্তি ও স্থিতির উপরে অন্য কিছুকে মূল্য দিয়ে থাকি, আমরাও চাই কোনো-এক পরম ও নামহীন সুখ, কোনো-এক চরম ও নামহীন দুঃখ ; এবং যা জীবনে আমরা পাই না, কিংবা যা চাইবার সাহস হয় না

আমাদের, সেই সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই 'জীবনের বাইরে' খুঁজে বেড়াই আমরা, কেউ ধর্মে, কেউ দর্শনে, কেউ সাহিত্যে। যারা নিছকভাবে বাঁধা রাস্তায় জীবন কাটায়, পায়ে-পায়ে সব নিয়ম মেনে চলে, বেআইনি, যুক্তিরহিত, অকথ্য ও অনির্বচনীয়ের দ্বারা কখনো আক্রান্ত হয় না, শুধু তাদের নিয়ে সাহিত্য রচিত হলে সাহিত্যের কোনো প্রয়োজন থাকতো না।

'ডাক্তার জ়িভাগো' উপন্যাসটির বিরুদ্ধে, যতদূর বুঝতে পেরেছি, আপনার প্রধান অভিযোগ এই যে তাতে 'ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান' প্রকাশ পায়নি, যে পাস্টেরনাক 'আপন দেশের অপরাজেয় কল্যাণশক্তির পরিচয় দেননি,' দেখতে পাননি 'দুর্যোগের তলে-তলে নবযুগসৃষ্টির সত্যকে।' অর্থাৎ, রুশীয় বিপ্লব বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা বা সমবেদনার অভাব আপনাকে পীড়িত করেছে, কিংবা আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন 'শত-শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্ত্বেও' তিনি আশাবাদী উপসংহার করেননি বলে। ধরে নিলে বোধহয় ভুল হয় না যে পাস্টেরনাক, যাঁর বয়স সত্তর এবং যিনি যৌবনের পরে আর বিদেশে যাননি, তিনি রুশীয় বিপ্লব বিষয়ে তাঁর বাঙালি অথবা বিদেশী সমালোচকদের চাইতে কিছুটা বেশি জানেন, এমনকি তাঁর বয়ঃকনিষ্ঠ রুশ সমালোচকদের তুলনাতেও তাঁর জ্ঞান 'ব্যাপকতর' না-হবার কথা নয়। 'রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর এত বড়ো ঘটনা জগতে আর ঘটেনি—' এই ছিলো বিপ্লব বিষয়ে জ়িভাগোর প্রথম রোমাঞ্চময় অনুভূতি, কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে যে-ধূসর মোহভঙ্গ সেই উষাকালকে আচ্ছন্ন করে দিলে, সে কি জ়িভাগোর একলার ? ব্লক যেমন বিপ্লবকে ভরে তুলেছিলেন রুশীয় খ্রীষ্টধর্মের অন্তঃসারে (সম্পূর্ণ তাঁর নিজের 'মন-গড়া' ব্যাপার), তেমনি পাস্টেরনাকের সমকালীন কবিরাও বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাঁদের নিজ-নিজ প্রবণতা অনুসারে, প্রত্যেকে তাঁর নিভৃত ও ব্যক্তিগত আদর্শকেই তার মধ্যে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, বিপ্লবের কাছে তাঁরা এমন কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন, যা কোনো বিপ্লব কখনো দিতে পারে না। স্মরণ করে দেখুন এই শতকের রুশীয় লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যা, দেশত্যাগ ও রহস্যময় অন্তর্ধানের তালিকাটি : এসেনিন, আত্মহত্যা ; মায়াকভস্কি, আত্মহত্যা ; মারিনা স্ভেটোইয়েভা, আত্মহত্যা ; বরিস পিলনাইয়িক ও আইজ়াক বাবেল, অন্তর্হিত ; বুনিন, মেরেজ়কহ্বস্কি ও জ়িনাইডা হিপ্পিয়াস, দেশত্যাগী ; ইউজীন জ়ামিয়ান্টীন, নির্বাসনে মৃত ; এবং অবশেষে, ১৯৫৪ সালে, সেই ফাডাইয়েভ-এর আত্মহত্যা, যিনি মাত্র কয়েক বছর আগে এলিয়ট প্রমুখ 'পশ্চিমী'দের রচনাকে বানর-হায়েনার চীৎকারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে মনে হয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিমী চিত্রকলার মস্কো একটি পীঠস্থান হয়ে উঠবে, কিন্তু সে-আশাও চুরমার হতে দেরি হয়নি। কান্ডিনস্কি ও শাগাল দু-জনেই সোৎসাহে স্বদেশে ফিরে যান, সরকারি কর্মভারও গ্রহণ

করেন, কিন্তু কিছুদিন পরে আবার আমরা তাঁদের দেশান্তরী দেখতে পাই। উল্লেখ্য; উপন্যাসে স্ট্রেলনিকভকেও আত্মহত্যা করতে হলো ; মোহভঙ্গ কোনো অর্থেই জ়িভাগোর একলার নয়।

আর-একটি কথা আমি প্রসঙ্গত বলে নিতে চাই। সমকালীন কবি ও বন্ধুরা আত্মহত্যা করলেও পাস্টেরনাক তা করেননি ; সব দুর্যোগের মধ্য দিয়ে শুধু যে দৈহিক অর্থে জীবিত থেকেছেন তা নয়, সৃষ্টিশীলতাকেও রুদ্ধ হতে দেননি। এ থেকে আমি অন্তত এটুকু বুঝেছি যে 'কামুক', 'স্ববিলাসী', 'অভিমানী' প্রভৃতি যে-সব বিশেষণ আপনি জ়িভাগো বা তার স্রষ্টার বিষয়ে ব্যবহার করেছেন, পাস্টেরনাকের আসন তার অনেক ঊর্ধ্বে। স্বাধীনভাবে সাহিত্যরচনায় প্রতিহত হয়ে যিনি বিনীতভাবে অনুবাদকর্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে কি 'অভিমানী' বলা যায়? বরং এক অবিকল ও অবিচল কবিচরিত্র কি উদ্ভাসিত হচ্ছে না তাঁর মধ্যে, আমরা কি আভাস পাচ্ছি না সেই নিস্তাপ হীরকদ্যুতির, বাইরে ঝড় উঠলেও যা বিস্রস্ত হতে শেখেনি?

বলা বাহুল্য, পাস্টেরনাক তাঁর জীবৎকালের রুশীয় ঘটনাবলিকে যে-ভাবে নিজের মনে অনুভব ও উপলব্ধি করেছেন, জ়িভাগো উপন্যাসে ও জ়িভাগোর কবিতাগুচ্ছে তা-ই তাঁর লেখনীকে চালিয়ে নিয়েছে, ভাষাকে দিয়েছে প্রাণ এবং ঘটনাকে বিশ্বস্ততা। সেই বিশেষ দৃষ্টি তাঁর পক্ষে নিতান্ত সত্য ; আপনাকে বা আমাকে খুশি করার জন্য সেই দৃষ্টিকে বিকৃত বা ব্যাহত করলেই তিনি নিন্দনীয় হতেন। এই একই কথা সব লেখকের পক্ষেই প্রয়োজ্য ; কেননা সাহিত্য কখনো নিরপেক্ষ সত্যের বাহন হবার দাবি করে না ; নাস্তিক হয়েও 'গীতাঞ্জলি'র দ্বারা মুগ্ধ হওয়া সম্ভব, জাতিভেদ বা জন্মান্তর না-মেনেও ভগবদ্গীতাকে সত্য বলে স্বীকার করা যায়। সত্য বলে অনুভব করানোই কবির কাজ, তার বেশি সাহিত্যে আর সত্য নেই। বিপ্লবের প্রতি পাস্টেরনাক সুবিচার করেছেন কি করেননি, এই প্রশ্নটাই আমার অবান্তর বলে মনে হয় ; তিনি অন্য কোনো দেশের লেখক হলে এই প্রশ্ন উঠতো কিনা সন্দেহ। এই সহজ কথাটা মেনে নিতে দোষ নেই যে মানুষ, দাম্পত্য থেকে রাষ্ট্রচালনা বা দেবার্চনা পর্যন্ত, তার সমবায়জীবনে যা-কিছু করে তাতে এমন কোনো আদর্শ নেই, যা ভাবনা থেকে বাস্তবে অবতীর্ণ হবার প্রক্রিয়াটিতে ক্লান্ত হয়ে, এমনকি বিধ্বস্ত হয়ে না পড়ে। কীটেরা অন্ধভাবে যে-বল্মীক রচনা করে তার মতো নির্ভুল মানুষের সংসারে কিছু হতে পারে না, কেননা মানুষ 'মন' নামক মহারিপুর দ্বারা আক্রান্ত, এবং সে-মন জনে-জনে ভিন্ন ও ব্যবহারে দ্বন্দ্বময়। মানুষ শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যেতে পারে শুধু নিজেকে ; অন্য সকলের মনের উপর মহাপুরুষেরও কর্তৃত্ব নেই ; আর সেইজন্যে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে যা-কিছু করে তাতেই কলুষের সংক্রাম অনিবার্য। আদর্শের শুদ্ধতা-রক্ষার কথা সেখানেই শুধু কল্পনীয়, যেখানে একলা-মানুষ

নিভৃতে বসে সৃষ্টি করে ; কবিতা লেখায় আর কারো সাহায্য নিতে হয় না বলেই কবি পণ করতে পারেন কিছুতেই আপোশ করবেন না। কিন্তু 'দশজনকে' নিয়ে কাজ করতে হলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায় তা খুবই মোটা অর্থে মোটামুটি রকমের ব্যাপার। মহৎ ঐতিহাসিক কর্মও এই লক্ষণ থেকে মুক্ত নয়। ফ্লোবেয়র, তাঁর 'সেন্টিমেন্টাল এডুকেশন' উপন্যাসে, ১৮৪৮-এর প্যারিস-বিপ্লবকে হিম বিদ্রূপে বিদ্ধ করেন, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদকে বেদনাময় ভর্ৎসনা জানায়, কিন্তু সেজন্য ফ্লোবেয়র বা রবীন্দ্রনাথকে দেশদ্রোহী আখ্যা শুনতে হয় না। পাস্টেরনাককে তাঁর স্বদেশীয়দের কাছে তা শুনতে হলো, তার কারণ বর্তমান রুশ সাহিত্যের এমন একটি অবস্থা, যা আমাদের কাছে অতিশয় অদ্ভুত বলে মনে হয়।

'আসল কথাটা এই যে কোনো-কোনো বিষয়ে আমরা লেখকেরা সকলেই একমত।' আপনাকে মনে করিয়ে দেয়া নিষ্প্রয়োজন যে কথাটা বলেছিলেন আলেক্সী সুর্কভ, সোভিয়েট লেখক-সংঘের কর্মসচিব, যখন, দু-বছর আগে, 'ডাক্তার জ়িভাগো' নিয়ে হুলুস্থুল চলছে। কী ভীষণ এই স্বীকারোক্তি, তা কি সুর্কভ বুঝেছিলেন ? না কি আমরা যারা মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস নিচ্ছি, ইচ্ছেমতো মস্কোতে বা বস্টনে বা পন্ডিচেরিতে যাবার স্বাধীনতা যাদের নির্বাধ—না কি আমরাই বুঝেছিলাম এই কথার অর্থ কী মর্মঘাতী ? সব লেখকেরা একমত ?... কিন্তু উনিশ-শতকী রুশ সাহিত্য যে সারা জগৎকে সম্মোহিত করে রেখেছে তার কারণই কি এই নয় যে পুশকিন থেকে চেখহ্ব পর্যন্ত লেখকবৃন্দ প্রত্যেকেই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে জগৎটাকে অনুভব করেছেন ও প্রকাশ করেছেন ? উদাহরণ বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন ; এটুকু বলাই যথেষ্ট যে যেখানে লেখকেরা সকলেই 'একমত', সেখানে থাকতে পারে শুধু কোটি-কোটি ছাপার অক্ষর, কিন্তু সাহিত্য সেখানে জন্মাতে পারে না। আপনার ও আমার মধ্যে আজকের এই মতভেদের কথাই ভেবে দেখুন না—আসলে এটা মানসতার তফাৎ, আসলে যাতে এসে যায় তা 'মতামত' নয়, তা আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন চিৎপ্রকৃতি—যদি আজ যে-কোনো পক্ষকে বাধ্য করা হতো অন্যের সঙ্গে গলা মেলাতে অথবা মূক হয়ে যেতে, আপনি কি তাহলে তার মধ্যেও 'নবযুগসৃষ্টির সত্য'কে দেখতে পেতেন ? অন্ততপক্ষে, আমরা যারা এমন সব দেশে বাস করছি যেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরোধী মানসতার বিকিরণ থেকে মানুষের মন তার প্রার্থিত সম্পদ ছেঁকে তুলতে পারে—আমরা কী করে ব্যথিত না-হয়ে পারি পাস্টেরনাকের উপর তাঁর স্বদেশীয়দের আক্রমণে, যার আসল কারণ এই যে তিনি 'সকলের সঙ্গে একমত' হতে পারেননি ?—কিন্তু তিনি যে একমত হতে পারেননি এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে সুর্কভ-এর কথা নির্ভুল নয়, এবং এইটুকুই, আমার মনে হয় আশার কথা।

চিঠিটা এখানেই শেষ করে দেবো ভেবেছিলাম, কিন্তু অন্য একটা প্রসঙ্গ মনে

পড়ছে যার উল্লেখ আমার পক্ষে কষ্টকর হলেও এড়িয়ে যাওয়া এখন সম্ভব নয়। 'পাস্টেরনাক আসলে কবি। ...গদ্যেও যেখানে তিনি কবির যথার্থ অবসর পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি জয়ী।' আপনার প্রথম চিঠির কথাগুলিতে আমার মন পূর্ণ সম্মতি জানিয়েছিলো : কেননা প্রথমে জ়িভাগোর কবিতাগুচ্ছ পড়ে আমি পাস্টেরনাককে যতখানি ভালোবেসেছিলাম, উপন্যাসটি পড়ে উঠে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসিনি। কবির লেখা একটি উপন্যাস, 'জ়িভাগো' : এই হলো ওর সবচেয়ে খাঁটি বর্ণনা ; কবি, নিছক কবি, একান্তভাবে কবি—এই হলেন পাস্টেরনাক। কিন্তু এখন আমি ভেবে পাচ্ছি না যে কেমন করে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে, সেই কবিতার বিষয়েও আপনার মন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো। 'রাত্রে ঘরে বসে ভডকা খেলে কী হবে, ঐ মানবত্বহীন অবস্থায় লেখা কবিতার দৌড়ও তথৈবচ'—এই কথাটির আমি কী অর্থ করবো, এর ভাব ও ভাষাকে কেমন করে আপনার প্রতিভা ও চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেবো, তার কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। 'ভডকা খাবার জন্যেই কবিতা খারাপ হয়েছে', 'ভডকা খাওয়া সত্ত্বেও কবিতা খারাপ হয়েছে' ;—এই দুটো প্রস্তাবই সমান অর্থহীন ; কেননা জল ও বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ছাড়া অন্য কিছু যাঁরা পান করেন না, এবং যাঁরা তীব্র সুরায় আসক্ত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষই ভালো এবং খারাপ কবিতা রচনা করেছেন ও করে থাকেন, কখনো বা একই মানুষ উভয় প্রকার ; আমি যতদূর জানি, কবির পানীয়সংক্রান্ত অভ্যাসের সঙ্গে কবিতার দোষগুণের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ নেই। এবং জ়িভাগোর কবিতাও 'তথৈবচ', অর্থাৎ 'মানবত্বহীন', এ-কথা বলতেই বা কী বোঝায়? ধরে নেয়া যাক জ়িভাগো 'অমানুষ', অর্থাৎ 'লোক ভালো নয়' ; কিন্তু লোক ভালো না-হলে ভালো কবিতা লেখা যায় না, এমন কোনো প্রমাণ কি আমরা পেয়েছি? আপনি শেলির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শেলির অবিবেচনার ফলে তাঁর প্রথম স্ত্রীকে জলে ডুবে মরতে হয়েছিলো ; আপনি গ্যেটের উল্লেখ করেছেন, যে-গ্যেটে সজ্ঞানে দগ্ধ করেছিলেন বহু নারীর জীবনযৌবন, এবং বহুকাল পর্যন্ত রক্ষিতাকে পত্নীর মর্যাদা দেননি। যে-সব জীবনী স্কুলের ছেলেদের পড়ানো যায় তা সাহিত্যিকদের মধ্যে না-ই বা আমরা সন্ধান করলাম ; আপাতত শুধু এটুকু দেখা যাক—আর সেটাই বোধহয় বেশি জরুরি—কবিতা তাঁরা কে কেমন লিখেছেন। আর সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে যেমন গ্যেটেকে নড়ানো যাবে না এবং শেলিকেও মানতেই হবে, তেমনি পাস্টেরনাক বা জ়িভাগো নামক কবির রচনাও অপ্রতিরোধ্য, তর্কাতীত ও তুমুল। অবশ্য এটা অনুভূতির কথা, কোনো যুক্তির কথা নয়, শুধু যদি আপনি বলেন—'না, আমার তেমন মনে হয় না', যদি বলেন, জ়িভাগোর কবিতা 'স্ববিলাসী, বাক্যশীল ও বিলুব্ধ', তাহলে আমি তেমনি ভাবে চুপ করে থাকবো, যেমন চুপ করে থাকি টলস্টয়ের সামনে যখন তিনি 'কিং লিয়র'কে

হাস্যকর অপাঠ্য বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু একটি অনুরোধ আপনাকে : একবার ভেবে দেখবেন টলস্টয়কে জগতের লোক কেন মনে রেখেছে— তাঁর সাধু মতামতের জন্য, না তাঁর উপন্যাসরূপী 'পাপাচরণে'র জন্য ?

১৯৫৯

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

[৩০ অক্টোবর, ১৯০১ : ২৫ জুন, ১৯৬০]

পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন : সাহিত্যের আলোচনা আজ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। বড়ো দারুণ এই ঘটনা, বড়ো বেশি আকস্মিক ও প্রত্যক্ষ, দেশে-কালে অত্যন্ত বেশি সন্নিকট। আমার চিন্তায় এখনো জীবন্ত হয়ে আছেন তিনি ; তাঁর হাসি, কথা, ভঙ্গি ও মুখশ্রী আমাকে আবিষ্ট করে রেখেছে ; টেলিফোন বাজলে মনে হয় তাঁর মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবো ; এমনও কি দেখতে পাবো না যে এই ঘরে ঐ চেয়াটিতে তিনি বসে আছেন ? অর্থাৎ তাঁর বিচ্ছেদের শোক আমার পক্ষে ব্যক্তিগত, আর মনের এই রকম অবস্থা নিয়ে একমাত্র যা করা যায় তা বিলাপ, তা শোচনা, তা আর্তিপ্রকাশ।

কিন্তু বিলাপ—তারও কোনো মূল্য নেই কি, এই বিশ্বজীবনে তারও একটি সম্মানিত আসন কি নির্দিষ্ট হয়ে নেই ? যখন সব ঠিকমতো চলছে, আমাদের সুখ, ইচ্ছা ও শৃঙ্খলা কোথাও ব্যাহত হচ্ছে না, শুধু কি তখনই কথা বলার সময়, আর যখন মৃত্যুর আঘাতে অন্য এক মহাসত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে, তখন, সেই আদিগন্ত গহ্বরের সামনে, মূক হয়ে থাকতে হবে কি আমাদের ? যে-ভাষা মানুষের ঐশ্বরিক বিভূতি, তার ব্যবহার কি জীবনের সঙ্গে মাত্র আংশিক সম্বন্ধস্থাপনে : জীবনের অবসান ও পূর্ণতার মুহূর্তেও তার নিবেদন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হবে না ?

নিশ্চয়ই তা-ই ; মানুষের সাহিত্যে তার উচ্চারণ শুনেছি। মহাভারতে ও হোমারের কাব্যে আমরা দেখতে পাই, কোনো বীরের মৃত্যুকালে তাঁর জন্য শোকোচ্ছ্বাস কী উদাত্ত অথচ অপ্রমত্ত আবেগে বায়ুমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হয়ে থাকে। মহাকাব্যের একটি আবশ্যিক অঙ্গ এই বিলাপ, সেখানে পাণ্ডবে-কৌরবে ভেদ নেই, বেদনার তীব্রতম মুহূর্তেও মৌনতা অমার্জনীয়। কেননা সেই মহাকবিদের মনে এমন কোনো অহংকার ছিলো না যাতে শোকের দিনে শোকপ্রকাশ অশোভন বলে গণ্য হয়, বরং তাঁরা জানতেন যে শোক যখন জীবনের মধ্যে সত্য হয়ে দেখা দেয় তখন তাকে উপেক্ষা অথবা পীড়ন করাই অপৌরুষেয়। তাকেও বরণ করে নিতে হবে, তাকেও মাল্যচন্দনে ভূষিত করা চাই, সেই পবিত্র অবকাশের প্রতি অমনোযোগিতাকে মনুষ্যত্ব বলে না। বিলাপ সেই মাল্যচন্দন, যার দ্বারা শোকের রূপান্তর ঘটে, তা হয়ে ওঠে শ্লোক, আদিকবিতা, অর্ফিয়ুসের

মরণ-বিজয়ী বীণাধ্বনি। পৃথিবীর বিবিধ পুরাণ এ-বিষয়ে একমত যে যাকে আমরা ছন্দ বলি, সুর বলি, কবিতা বলি, তা শোকের সন্তান।

আমাদের ছেলেবেলায় বাংলাদেশে আমরা দেখেছি যে বাড়িতে কোনো মৃত্যু ঘটলে মহিলাদের রোদনধ্বনি সারা গ্রামে বিকীর্ণ হয়ে পড়তো। আজকাল কেউ-কেউ একে বর্বরতা বলে থাকেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর নিন্দা করেননি। 'আমি এত বড়ো দুঃখ পেলাম, আর আশে-পাশে অন্য সকলের সংসারযাত্রা তেমনি চলবে!'—এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অবৈধ নয়। 'আমার দুঃখের অংশ নিক জগৎ', এই অত্যন্ত অবাস্তব ইচ্ছাও স্বাভাবিক। মাত্র একবর্ষভোগ্য বিরহদুঃখে যদি চেতনে-অচেতনে ভেদজ্ঞান নষ্ট হতে পারে, তাহলে যে-বিচ্ছেদ স্থায়ী ও অসেতুসম্ভব তার আঘাতে তখনকার মতো বুদ্ধিভ্রংশ হলে দোষ দেয়া যায় না।

কিন্তু, কবির কাছে না হোক সর্বসাধারণের কাছে, মৃত্যুর মধ্যেও স্তরভেদ স্বীকার্য। যে-কোনো মৃত্যুই শ্রদ্ধেয়, কিন্তু বীরের মৃত্যু মহান। আমরা সকলেই জানি যে মৃত্যু আমাদের নিত্যসহচর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তা নির্বস্তুক ধারণামাত্র হয়ে থাকে, অনেক সময় তাকে চোখে দেখেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। মৃত্যুকে বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব হতে হলে তাকে আঘাত করতে হবে এমন কোনো ব্যক্তিকে, যিনি তাঁর ক্ষমতার উদ্যমে বহু মানুষের চিত্ত ও জীবনকে স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ, বীরের মৃত্যুকালেই জীবনের এই অন্তিম সত্যকে আমরা সকলে চিনতে পারি, কবি যে-ভাবে 'বজ্রের আলোতে মুখোমুখি' দেখতে চেয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই ; যে-ভাবে পুরাণ-কাব্যে বর্ণিত আছে, ঠিক তেমনি সংশয়াতীত অন্তরঙ্গতায়। সেই বেদনা শুধু পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত নয় বলে তার প্রকাশ গোষ্ঠীর মধ্যেও নিষ্কুণ্ঠ হতে পারে ; জন্ম হতে পারে বিলাপের, যার বুক ফেটে ক্ষরিত হবে বিন্দু-বিন্দু বেদনার পুণ্যস্নান। ব্যক্তিগত দুঃখকে এইভাবে রূপান্তরিত করতে সকলে পারেন না, কিন্তু যে-দুঃখ অনেকের, তার অভিঘাতে, অন্ততপক্ষে মুহূর্তের জন্য, অনেকের মনেই মৃত্যু একটি আবির্ভাব হয়ে ওঠে।

বীর কাকে বলবো? বলা বাহুল্য, পৃথিবী থেকে দ্রোণবংশ লুপ্ত হয়েছে ; আধুনিক যুগে যুদ্ধ মানেই বিশুদ্ধ বিভীষিকা। দ্রোণ কর্ণ অভিমন্যুরা আজকের দিনে ভিন্নভাবে মূর্ত হয়ে থাকেন। জ্ঞানী, শিল্পী, স্রষ্টা তাঁরা ; রূপ অথবা চিন্তার জনয়িতা ; কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক। আমরা জেনেছি সৃষ্টিশীলতাই শৌর্য ; জেনেছি, সৃষ্টিশীল মানুষ নিজেকেও অনবরত সৃষ্টি করে চলেন। তেমনি এক পুরুষ আজ আমাদের মধ্য থেকে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হলেন ; এই মৃত্যুকে, তাঁর জীবনের মতোই, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করবো আমরা, দূরে সরে না-গিয়ে এতে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবো, আমাদের বিলাপের

দ্বারা তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জানাতে দ্বিধা করবো না।

কী কাজ কবির? কেন তিনি নমস্য? কোনো সন্দেহ নেই, বীর মানেই যোদ্ধা, কিন্তু সব যুদ্ধ ধনুর্বাণ দ্বারা সম্পন্ন হয় না ; কিংবা ঐ ধনুঃশর এক প্রতীকমাত্র, এক স্পৃশ্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য, যার অন্তরালে ব্যঞ্জনার বিস্তীর্ণ বীথিকা আমরা দেখতে পাই। মহাভারতের বীরেরা অসাধ্যসাধন করেছেন, জগতের কবিরাও তা-ই করে থাকেন। জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম ; এই হলো মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র। পাত্রভেদে রূপভেদ হয় সংগ্রামের এবং একটা স্তরে এসে তাকে বাইরে থেকে আর সংগ্রাম বলে চেনা যায় না। মানুষের বুদ্ধিবল যখন কর্দমাক্ত স্থূল ধাতুকে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করে তাকে সংস্কৃত, নম্য ও ব্যবহার্য করে তোলে, তখন সেই যন্ত্রমুখর বহুশ্রমজাত ক্রিয়াকাণ্ডকে সহজেই যুদ্ধ বলে মনে হতে পারে ; কিন্তু গণিতের সাহায্যে বিশ্বের রহস্য যিনি সন্ধান করছেন, সেই একলা মানুষটির কঠিন সংগ্রাম অনভিজ্ঞ চোখে প্রায় ধরাই পড়ে না। কবির অবস্থাও তা-ই ; একান্তে ও গোপনে তিনি কাজ করেন, প্রত্যক্ষভাবে সহকর্মী বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাঁর হয় না, এবং তিনি যা সৃষ্টি করেন তাও এক বায়বীয় বস্তু, প্রায় কোনো বস্তুই নয়, শাদায়-কালোতে পঙক্তিবদ্ধ শব্দ শুধু ; সেটা যে সভ্যতার বা আমাদের অস্তিত্বের এক প্রধান উপাদান, তা অনেকেরই উপলব্ধির বাইরে থেকে যায়। কিন্তু তিনিও যোদ্ধা, তাঁর শৌর্য অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত, শুধু অনুভূতির গোচর, ভাবনার অধিগম্য। ভাষা আমরা সকলেই ব্যবহার করি, কিন্তু সে তার স্বভাবগুণে ছন্দোবদ্ধ বা অর্থময় হতে জানে না ; আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে কিছু-না-কিছু চিন্তা করে থাকি, বিদ্ধ হই কোনো-না-কোনো আবেগে, কিন্তু সেই সব আবেগ অথবা চিন্তার নিজের মধ্যে এমন কোনো শক্তি নেই যার দ্বারা আমাদের নিজেদের কাছেও তার রূপসত্তা উন্মোচিত হতে পারে। আমাদের চিন্তা স্বভাবত অস্পষ্ট, আমাদের ভাষা স্বভাবত বিশৃঙ্খল, আমাদের আবেগ স্বভাবত অপরিচ্ছন্ন ; এবং এই প্রাকৃত ব্যবস্থা অথবা অব্যবস্থাতেই যাকে বলে কাজ চলে যায়, সর্বসাধারণ এই নিয়েই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু কবি চান আত্মোপলব্ধি, তাই তাঁর জীবন এক অনবচ্ছিন্ন সংগ্রাম : চিন্তার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দের, ছন্দের সঙ্গে অর্থের, অর্থের সঙ্গে ইঙ্গিতের যুদ্ধ, ক্ষমাহীন, বিরামহীন, পর্যায়ধর্মী ; সন্ধি হয় না কখনো ; একটি যুদ্ধে যদি বা কষ্টেসৃষ্টে জেতা গেলো, তখনই নতুন ও তীব্রতর আর-একটি আরম্ভ হয়ে যায় ; কবির যন্ত্রণারও চিরযৌবনের রহস্য এ ছাড়া আর-কিছুই নয়। যে-ভাষা হাটে-বাজারে মুখে-মুখে ঘূর্ণিত হতে-হতে মলিন হয়ে যাচ্ছে কিংবা যা অভিধানের অবরোধে মৃতপ্রায়, কবি তাতে সঞ্চার করেন প্রাণ, তাপ, দ্যুতি, ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, তাকে করে তোলেন একাধারে চঞ্চল ও স্থির, সনাতন ও সদ্যোজাত, অবাধ্য ও উত্তাল প্রকৃতিকে বিরাট চেষ্টায় সংহত করেন

একটি আত্মবশ স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টির মধ্যে। আমাদের সমকালীন বাংলাদেশে এই সৃষ্টিক্রিয়ার দুর্বিষহ গৌরব যিনি সবচেয়ে প্রসন্ন মুখে বহন করেছেন, তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৩১ সালে, কিন্তু আমাদের ভিন্নগামী জীবনের ধারা অনেকবার মোড় নিয়ে-নিয়ে কিছুটা সমান্তরভাবে প্রবাহিত হতে লাগলো ধরা যাক দশ-বারো বছর আগে থেকে। ক্রমে আমরা আরো বেশি সমীপবর্তী হয়েছিলাম, সম্প্রতি প্রায় ঘনিষ্ঠ। নানা সূত্রে যত বেশি দেখা হয়েছে, তত বেশি তাঁকে ভালোবেসেছি আমি ; আমার সেই অনুরাগে যেমন মোহ ছিলো না, তেমনি ছিলো না তিলতম সংশয়ের অবকাশ। ভাগ্যদোষে অনেক বন্ধু হারিয়ে কোনো-এক অজ্ঞাত পুণ্যফলে আমি বন্ধু পেয়েছিলাম সুধীন্দ্রনাথকে ; অবশেষে এমন হয়েছিলো যে আমার সমবয়সী বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আমার স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো অবাধ, আলাপ অপর্যাপ্ত, মানস-বিনিময় ফলপ্রসূ। আমার তুলনায় অনেক বেশি জ্ঞানী তিনি, তাঁর আগ্রহের পরিধি অনেক বেশি বিস্তীর্ণ ; তবু যে আমি তাঁর পাশে দাঁড়াতে পেরেছিলাম তার কারণ সাহিত্যপ্রেমে আমাদের সমকক্ষতা। লেখকমাত্রেই সাহিত্যপ্রেমিক হন না, অনেকে শুধু সহজাত শক্তির প্রভাবেই লেখক হিশেবে যশস্বী হয়ে থাকেন, আবার এমনও দেখা যায় সাহিত্যে যাঁর সংবেদনশক্তি প্রখর, রচনায় তিনি অকৃতী অথবা উদ্যমহীন। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও বিদ্বান, স্রষ্টা ও মনস্বী, যেমন তিনি স্বাধীন রচনায় শক্তিশালী, তেমনি পঠনপাঠন অনুশীলনে তিনি তৃপ্তিহীন। বিশ্বের সাহিত্য তিনি জানতেন, এবং সৃষ্টিক্রিয়ার গোপনতম সমস্যাগুলি তাঁর অন্তঃস্থ ছিলো। আর এইজন্যেই তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিলো দুর্বার ; যে-কথা শুধু দু-জন লেখকের মধ্যেই সম্ভবপর, তেমন কথা বলার জন্য তাঁকে আমি অনন্য বলে জেনেছিলাম।

তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই আক্ষরিক সাদৃশ্য ছিলো না ; কী জীবনে, কী সাহিত্যে, অনেক সময়ই আমাদের মন ভিন্ন সুরে বেজে উঠতো। যে-সব স্বদেশী ও বিদেশী লেখক তাঁর ও আমার প্রায় সমান প্রিয় তাঁদের সংখ্যা অল্প বলা যায় না, এবং তাঁদের কারো-কারো সঙ্গে তাঁরই প্ররোচনায় আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। কিন্তু যে-সব স্থলে পার্থক্য ছিলো, তাও আকারে-প্রকারে উপেক্ষণীয় নয় ; দর্শনে তাঁর অবিরল আগ্রহ, আমার দুর্মর অনীহা ; তিনি মার্সেল প্রুস্তের ভক্ত, আমি, ডস্টয়েভস্কির ; মালার্মে, তাঁর কাছে কাব্যের পরম, আমার কাছে কবিতার যাত্রাশেষ ; যুক্তিবাদ, তাঁর পক্ষে স্পৃহণীয়, আমার পক্ষে অপাচ্য ; সামাজিকতা, তাঁর মতে অবশ্যকৃত্য, আমার মতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সময়ের অপব্যয় ,—এই রকম গরমিলের তালিকা অনায়াসেই বাড়িয়ে যেতে পারি। তিনি ছিলেন মধুসূদন বিষয়ে উৎসাহী ও জীবনানন্দ বিষয়ে উদাসীন, আর আমি জীবনানন্দর দ্বারা অনবরত আন্দোলিত এবং মধুসূদন বিষয়ে নিস্তাপ। অথচ স্বভাবের

গভীরতম স্তরে যে ঐক্য ছিলো, মৌলিক আদর্শে বা বিশ্বাসে যে পার্থক্য ছিলো না, তা এতেই বুঝতে পারি যে এই সব মতভেদ অথবা রুচিভেদ মুহূর্তের জন্যও বিরোধের সৃষ্টি করেনি, বরং মিলিত হয়ে যেন এক বৃহত্তর স্বরসংগতি রচনা করেছিলো। বিপরীত নয়, পরস্পরের পরিপূরক যেন ; অনুরূপ নয়, কিন্তু নয় বলেই আরো বেশি নির্ভরযোগ্য—তাঁর কাছে এলে, বা তাঁর কথা চিন্তা করলেও, এই রকম একটি সম্বন্ধ আমি অনুভব করেছি। ঠিক ততখানি আদর্শগত সাদৃশ্য, যা না-থাকলে কোনো বন্ধুতা দৃঢ় হতে পারে না ; এবং ঠিক ততটুকু ব্যবহারিক পার্থক্য, যা বন্ধুতাকে সুস্বাদু ক্লান্তিহীন করে তোলে। যদি কখনো নতুন কিছু ভেবেছি, জেনেছি তিনি নির্ভুলভাবে সাড়া দেবেন ; যখনই মনে কোনো প্রশ্ন জেগেছে, দেখেছি সেই সংশয় তাঁর পরিচিত ; এমন কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারিনি যেটা তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে। যা আমার নিজের মধ্যে নেই, অথচ যা আমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তারই প্রতিমূর্তি যেন সুধীন্দ্রনাথ।

বহু দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপার জ্ঞানস্পৃহা, চারিত্রিক কৌলীন্য, নয়নাভিরাম কান্তি, ঐহিক বিত্তোচ্ছলতা, ভাস্বর ব্যক্তিত্ব, সর্বোপরি সেই অমরতার মুকুট, তাঁর কবিপ্রতিভা। তাঁর প্রতিভায় একটি আশ্চর্য সার্বভৌমতা ছিলো—যা কবিদের অনেক সময়েই থাকে না ; সাংসারিক জ্ঞান, সামাজিক আচরণনৈপুণ্য, গুণগ্রাহিতা ও সুবিচারবোধ, দৈনন্দিন জীবনে সুশৃঙ্খল বৈভবসাধন, আলাপ, আনন্দ, বন্ধুতা—এই সমস্ত বিষয়েই তাঁকে প্রতিভাবান বললে ভুল হয় না। এবং এতগুলো গুণের সন্নিপাতের ফলে তিনি বন্ধু হিশেবে ছিলেন অতুলনীয়রূপে সক্ষম, সপ্রতিভ, বৎসল ও নিষ্ঠাবান ; যেমন উদার তাঁর অভ্যর্থনা তেমনি তিনি স্বমতঘোষণায় নির্ভীক, যেমন অনাবিল তাঁর সহৃদয়তা তেমনি তিনি মঙ্গলসাধনে ক্লান্তিহীন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিলেন বিশ্বাসে তাঁর বিপরীত*—সেই ব্যবধানকে মেরুপ্রতিম বলা যায় ; আদর্শগত আক্রমণে প্রখর হয়েও সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের প্রতি ব্যক্তিগত দরদ হারাননি। দেশে ও বিদেশে এমন অনেকেই আজ তাঁর বিচ্ছেদে কাতর, যাঁরা সাহিত্যের প্রতি অত্যন্ত বেশি আসক্ত নন, বা আসক্ত হয়েও তার চিন্তাধারার বিরোধী বা যাঁরা বাংলা ভাষা পর্যন্ত জানেন না ; মাত্র একবার দু-বার তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন এমনও অনেকের চক্ষুকোণ বেদনায় গাঢ়

---

* কম্যুনিজ়ম ও ফাশিজ়ম-এর প্রতি সুধীন্দ্রনাথের ঘৃণা ছিলো তীব্র, তুল্য ও সোচ্চার, অথচ তাঁরই ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এলেন বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবীরা—'পরিচয়' পত্রিকার শোচনীয় রূপান্তরে ইতিহাসের একটি পরিহাস প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু শুধু পরিহাস নয়—মানবধর্মের উদারতার আশ্রয়ে তারাও কী-রকম প্রবল হয়ে ওঠে যারা মানবধর্মকে ধ্বংস করতে চায়, এই ঘটনা তারই একটি দৃষ্টান্ত। মানবধর্মের দুর্বলতা এটা? —না, আমরা বলি এটাই তার মহত্ত্ব।

হতে দেখেছি। তাঁর এই গুণটিকে একজন বলেছেন মোহিনী শক্তি, স্বল্পকালের জন্য তাঁকে দেখে থাকলেও যেন আর ভোলা যায় না। তা-ই যদি হয়, তাহলে আমরা যারা সাহিত্যকর্ম ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল ধরে তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম, আমাদের জগৎ যদি আজ ধূসর হয়ে গিয়ে থাকে, যদি জাগরণে ও নিদ্রায় অন্য কিছু চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়, তাহলে কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি কি বিস্মিত হবেন ?

সাহিত্যে বহুকাল ধরে তিনি আমার সহযাত্রী। আমার রচনা ও সম্পাদনাকর্মে তাঁর সহযোগ ও পরামর্শ যে কত মূল্যবান ছিলো, তার আংশিক স্বীকৃতি অন্যত্র আমি করেছি, যদিও সব কথা কোনোদিনই হয়তো বলা যাবে না। সাহিত্যব্যাপারে আমার কোনো প্রস্তাবে আমি কখনো তাঁকে 'না' বলতে শুনিনি, এবং অনুরোধরক্ষায় তাঁর তৎপরতা, যত্ন ও অধ্যবসায় আমাকে বার-বার মুগ্ধ করেছে। অবশেষে অন্য একটি বিষয়েও আমার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করলেন না ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করতে রাজি হলেন, তাঁর বন্ধুপ্রীতি ও আমার সৌভাগ্যের প্রসাদে সেখানেও তাঁকে সহযোগীরূপে লাভ করলাম। যাঁরা রবারস্ট্যাম্প-চিহ্নিত দলিলপত্র দ্বারা সমস্ত কিছু বিচার করেন, তাঁদের মুখে এই সংযোগের ঔচিত্য বিষয়ে সংশয় শোনা গেলো। 'হতে পারেন ভালো কবি, কিন্তু অধ্যাপনা পারবেন কি ?' এর আগে সুধীন্দ্রনাথের কোনো বৈদ্যালয়িক সংস্রব ঘটেনি ; কলকাতার কোনো সরোবর অথবা ইংলন্ডের কোনো তটিনীর তীরবাসিনী ছিলেন না তাঁর সরস্বতী ; তিনি না করেছিলেন এম. এ. পাশ, না লিখেছিলেন ছাত্রব্যবহার্য কোনো গ্রন্থ। আমার অবশ্য এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিলো না যে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে, এবং সেই সঙ্গে আবহমান পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তাঁর মতো বিস্তীর্ণ ও যত্নলব্ধ জ্ঞান ভারতভূমিতে বিরল ও বিস্ময়কর, আর এও আমি জানতাম যে তিনি, তাঁর কবিচিত্তের উপলব্ধির বলে ও মনোমুগ্ধকর বাচনভঙ্গির দ্বারা, যে-ভাবে সেই জ্ঞানকে জীবন্ত করে তুলতে পারবেন, তাও অত্যন্ত শ্লাঘনীয়। এই অধ্যাপনার কাজ তিনি পূর্ণমনস্ক চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন, এতে আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি, এর জন্য সোৎসাহ পরিশ্রম করে একটি অব্যক্ত তৃপ্তি ছিলো তাঁর, বিদ্যালয়ের সীমিত সময়ের মধ্যে যা সম্ভব হতো না, ছাত্রদের বাড়িতে ডেকে এনে তা পূরণ করে দিতেন। আর—যদিও এই সংযোগ অনবচ্ছিন্ন হতে পারেনি—শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে কতখানি পেয়েছিলো, কী গভীর ছিলো তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ও ভালোবাসা, তা তাঁর মৃত্যুর দিনে অনেকেই হয়তো প্রত্যক্ষ করেছেন। পাংশু মুখে আরক্ত চোখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা অপেক্ষা করেছিলো, তাঁর অন্ত্যক্রিয়ায় বাহকদের মধ্যে অনেকেই ছিলো তারা ও তাদের বন্ধুবর্গ, সর্বশেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত তাঁর সেবায় তারা নিয়োজিত ছিলো, এবং তাদের মুখের ম্লানিমা আজ পর্যন্ত অপসৃত হয়নি। আর শুধু কি তারা ?

বাংলাদেশের তরুণ কবিদের মধ্যে এমনও কেউ-কেউ আছেন, যাঁরা এতদূর পর্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত যেন জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য তাঁদের হারিয়ে গেছে।

আমার সমকালীন আর-একজন মৃত কবিকে মনে পড়ছে আমার : জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ : এই দুটি নাম উচ্চারণ করামাত্র আধুনিক বাংলা কবিতার দুই বিপরীত প্রান্ত ঘোষিত হয়ে গেলো— যেন অনতিক্রম্য ব্যবধান। একদিকে 'কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়' ভরে-যাওয়া ভোরবেলার পৃথিবী, আর-এক দিকে 'নাস্তিগর্ভ ব্যাপ্ত অমানিশা'। একদিকে 'ধূসর প্রাসাদে' 'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ', আর-এক দিকে 'দেওয়ালের খোপে খোপে' 'গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন্, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস'। একদিকে স্বজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়, আর-এক দিকে সুতীক্ষ্ণ মেধা ও জগতের সংস্কৃতি। সুধীন্দ্রনাথ যেন কালিদাসের উত্তরাধিকারী, আর জীবনানন্দর পূর্বপুরুষকে বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুধীন্দ্রনাথ জীবনযাত্রায় য়োরোপীয় ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভারতীয় চিত্ত তাঁর রচনার ছত্রে-ছত্রে উদ্ঘাটিত হয়েছে ; রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'গুরুদেব' বলতেন না, বলতেন 'আমার গুরু', তাঁর গদ্য রচনায় যে-সব দৈশিক বাগ্‌ধারা ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর মতো 'খাঁটি বাঙালি' বস্তু খুব বেশি নেই। আর জীবনানন্দ ছিলেন ব্যক্তিজীবনে নিতান্তই বাঙালি, কিন্তু এখন ক্রমশ ধরা পড়ছে যে বাংলা ভাষায় অন্য কোনো কবি তাঁর মতো 'য়োরোপীয়' নন ; তাঁর সমগ্র রচনায় মহাভারতের একটি উল্লেখ নেই, এবং তিনিই আমাদের মধ্যে একমাত্র, যিনি আযৌবন চেষ্টাহীনভাবে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলতে পেরেছেন। আর যদি জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে চিন্তা করি, তাহলেও কি এই দু-জনের ব্যবধান আশ্চর্য মনে হয় না ? একজন, কবিতা ভিন্ন অন্য প্রায় সমস্ত বিষয়েই অকৃতী, ভীরু, সশঙ্ক, সংসর্গহীন, মনীষীমণ্ডলে অবহেলিত ; অন্য জন, এত বড়ো সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ প্রায় বৈদগ্ধ্যেরই নামান্তর বলে গণ্য। আকস্মিক অকালমৃত্যু দু-জনেরই, কিন্তু মৃত্যুতেও কত ভিন্ন তাঁরা! জীবনানন্দর মৃত্যু যেন এক নম্র ও নিঃশব্দ প্রস্থান, তাঁর জীবনের মতোই গোপন ও স্বল্পভাষী ; আর সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু যেন মুহূর্তের ভূকম্পে কোনো বিশাল প্রাসাদের অবলুপ্তির মতো, টেলিফোনের তারে-তারে বেপথুমান বিদীর্ণ ও অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত। তবু, শেষ পর্যন্ত, এই সমস্ত বৈসাদৃশ্য কি আপতিক নয়, একই পবিত্র উৎস থেকে দু-জনেই কি উৎসারিত হননি, দু-জনেই কি নন আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বপ্রসূত বেদনার সন্তান ? যে-'মানুষীর রূপ' 'ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত', হতে-হতে অবশেষে 'শুয়ারের মাংস হয়ে যায়', তার পরপারে জীবনানন্দ যেমন দেখেছিলেন 'নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া', তেমনি 'জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল' অতিক্রম করে সুধীন্দ্রনাথেরও 'স্বপ্নের নিভৃতে' স্বর্গের আবির্ভাব

ঘটেছিলো। এই দু-জন, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, স্থাপত্য-ক্ষোদিত অর্ধ-দেবতার মূর্তির মতো, আমাদের সমগ্র আধুনিক কবিতাকে দুই প্রান্তে ধারণ করে আছেন, তাঁদের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন করে গর্বিত হতে পারি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলে, নতুন করে প্রণত হতে পারি ঈশ্বরের কাছে, যেহেতু মানুষের পাপক্ষালনের জন্য মানুষের মুখেই কবিতা তিনি দিয়েছেন।

আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেলো, গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা ভাষার কবিতার বিবর্তনে লিপ্ত আছি। স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না ; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদের গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম। আজ যখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এই যুদ্ধে আমাদেরই জয় হয়েছে, যখন আজকের দিনের তরুণের দল আমার প্রিয় কবিদের আমারই কাছে প্রিয়তর করে তুলছেন, তখন আমার নিজেকে মনে হচ্ছে অবসন্ন, আজ এতদিন পরে আমি বিশ্রাম প্রার্থনা করছি, আকাঙ্ক্ষা করছি স্তব্ধতার অবসর, যাতে নিজের প্রতি অবশিষ্ট দু-একটা কর্তব্য অবশেষে নিঃশব্দে সম্পাদন করতে পারি। মৃত্যু মৃতকে মহিমান্বিত করে তোলে তা সত্য—কিন্তু নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর সেই নিষেধ, যার দ্বারা জীবিতকে তার পরম রহস্য থেকে সে অমোঘভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়! আমি জানি, বাংলাদেশের আসন্ন বৎসরগুলিতে সুধীন্দ্রনাথ ধীরে-ধীরে অমরতার পথে অগ্রসর হবেন এবং তার দ্বারা আমিও চরিতার্থ হবো ; কিন্তু আমাদের এই মহামূল্য মর্ত্য জীবনে তাঁকে যে হারিয়েছি সে কথাও ভুলতে পারি না। আমাদের সংহতির শেষ সূত্র ছিন্ন হলো, চলার পথে সঙ্গী আর নেই, আমি ক্লান্ত, অপরাহ্নে একলা বসে আছি।

১৯৬০

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি

এই বইয়ের* কবিতাগুলি যাঁর রচনা, তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। বহুকাল ধরে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম বলে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে একটি প্রশ্ন মাঝে-মাঝে আমার মনে জাগছে : যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সে বস্তুটি কী ? তা কি বুদ্ধিরই কোনো উচ্চতর স্তর, না কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য ? ইংরেজি 'genius' শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হলে প্রতিভাকে এক ধরনের আবেশ বলতে হয়, আর সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হয়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর। যদি প্রতিভাকে অলৌকিক বলে মানি, তাহলে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব, রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হতে পারেন এবং হলে কিছু এসে যায় না, উপরন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে ও সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নত বুদ্ধি বলে ভাবলে কবি হয়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর ধীশক্তি কোনো-কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারণে কাব্যরচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই কারণসমূহ ভিন্ন হলে যিনি বণিক বা বিজ্ঞানী বা কূটনীতিজ্ঞরূপে বিখ্যাত হতে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয় ?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন আমরা শুধু উত্থাপন করতে পারি, এর উত্তর দেয়া সকলেরই সাধ্যাতীত। কেননা ইতিহাস থেকে দুই পক্ষেই বহু সাক্ষী দাঁড় করানো যায়, তাঁরা অনেকে আবার স্ববিরোধে দোলায়মান। বহুমুখী গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' আছেন একান্ত হ্যেল্ডার্লিন ও জীবনানন্দ, মনীষী শেলি ও কোলরিজের পাশে উন্মাদ ব্লেক ও অশিক্ষিত কীটস, উৎসাহী বোদলেয়ারের পরে শীতল ও নিরঞ্জন মালার্মে। জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহলে বা অনীহায় তাঁরা আক্রান্ত, এত বিভিন্নভাবে তাঁরা কর্মিষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়, এবং উৎসুক ও উদাসীন ছিলেন, যে ঠিক কোন লক্ষণটির প্রভাবে তাঁরা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করার আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। এবং কবিত্বের

---

* নাভানা-কর্তৃক প্রকাশিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহে'র ভূমিকা।

সেই সামান্য লক্ষণ—যদি-বা কিছু থাকে—তা আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ও নয় ; এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি, যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান ; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, বেশবাসে সযত্ন, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাতবৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হতে পারতেন তিনি ; আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত যে সুধীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক হলে অনিবার্যত নেতৃপদ পেতেন, বা আইনজীবী হলে সেই পেশার উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে তাঁর দেরি হতো না ; তাঁকে অনায়াসে কল্পনা করা যেতো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতরূপে, তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট হলে নতুন কোনো দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না তাও নয়। অথচ এর কোনোটাই তিনি করলেন না, কবিতা লিখলেন। পিতার কাছে আইনশিক্ষা আরম্ভ করে শেষ করলেন না ; এম. এ. পড়া অসমাপ্ত রেখে ছেড়ে দিলেন ; সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওঅর্ড' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েও রাজনৈতিক কর্মের দিকে প্রবর্তনা পেলেন না ; বীমাপ্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন আরম্ভ করেও লক্ষ্মীর বাসস্থানটিকে পরিহার করলেন। এ কি এক তরুণ ধনীপুত্রের খেয়ালমাত্র, না কি এর পিছনে কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্যম কাজ করে যাচ্ছে ? কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি যেমন তাঁর পিতার 'বৈদান্তিক আতিশয্যে' উত্ত্যক্ত হয়ে 'অনেকান্ত জড়বাদে'র আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর দেশহিতৈষী কর্মবীর পিতাকে থিয়জ়ফিতে আত্মবিলোপ করতে দেখে সমাজসেবায় তাঁর আস্থা ভেঙে যায়। এই যুক্তিকে আর-একটু প্রসারিত করে হয়তো বলা যায় যে দেশ, কাল ও পরিবারের আপতিক সন্নিপাতের ফলে জনকর্মে উৎসাহ হারিয়ে, তিনি বেছে নিলেন সেই একটি কাজ, যা শব্দময় হয়েও নীরব, এবং সর্বজনের প্রতি উদ্দিষ্ট হলেও নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু সত্যি কি তা-ই ? না কি তাঁর নাড়িতেই কবিতা ছিলো, দেহের তন্তুতে ছিলো বাক্ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ, তাই অন্য কোনো পথে যাবার তাঁর উপায় ছিলো না, অন্যান্য এবং অধিকতর প্রভাবশালী বৃত্তির দিকে বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও তাই তাঁকে কবি হতে হলো ? তিনি কি অন্যবিধ কীর্তির আহ্বান উপেক্ষা করে কবিতা লিখতে

বসেছিলেন, না কি মন্ত্রমুগ্ধ কান নিয়ে অন্য কোনো আহ্বান তিনি শুনতেই পাননি ? মূল্যবান জেনেও কোনো-কিছু ত্যাগ করেছিলেন, না কি বর্জন করেছিলেন শুধু সেই সব, যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর, বরণ করেছিলেন শুধু তা-ই, যেখানে তাঁর সার্থকতা নিহিত ?

এ-কথার উত্তরে আমি বলতে বাধ্য যে জগতের অন্যান্য উত্তম কবিদের মতো, সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন—স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি। তা যদি না হতো, তাহলে তাঁর মতো মেধাবী ব্যক্তি কবিতা নামক বায়বীয় ব্যাপার নিয়ে প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না। তাঁর সামনে, রবীন্দ্রনাথের মতো, সুযোগ ছিলো অপর্যাপ্ত, ব্যক্তিত্বে ছিলো অন্য নানা গুণপনা ; সে-সবের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমি যাঁদের স্বাভাবিক কবি বলছি—আর তাঁরা ছাড়া সকলেই অকবি—তাঁরা লোকমানসে নিতান্ত কবিরূপেই প্রতিভাত হয়ে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতার অন্যান্য বিকিরণ শেষ পর্যন্ত সেই একই অগ্নিতে লীন হয়ে যায়। গ্যেটেকে জগতের লোক কবি ছাড়া অন্য কিছু বলে ভাবে কি ? জমিদার, ধর্মগুরু, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক, গ্রামসেবক, বিশ্বপ্রেমিক—রবীন্দ্রনাথ তো কত কিছুই ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটিমাত্র মৌলিক পরিচয়ের মধ্যে অন্য সব গৃহীত হয়ে গেলো। তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের অন্য যে-সব চরিত্রলক্ষণ উল্লেখ করেছি, বা করিনি—তাঁর অধীত জ্ঞান, মনীষিতা, আলাপনৈপুণ্য, অসামান্য প্রফুল্লতা ও সামাজিক বৈদগ্ধ্য, সম্পাদক ও গোষ্ঠীনায়ক হিশেবে স্মরণীয় কৃতিত্ব তাঁর—এই সবই তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গ, তাঁর কবিতার পক্ষে অনুকূল বা বিরোধী ধাতু হিশেবে প্রয়োজনীয় ; যদি তিনি কবি না-হতেন, তাহলে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব এ-রকম হতো না, এবং যদি ভিন্ন ধরনের কবি হতেন তাহলে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের হতো।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যক্রমে সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তাছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ১৯২২, সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ। নামপত্রে লেখা 'শ্রীশ্রী দুর্গামাতা সহায়। শ্রীসুধীন্দ্র নাথ দত্ত। ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।' (মূলের বানান উদ্ধৃত হলো)। ভিতরের পাতাগুলোতে আছে কম্প্র হাতে মেলানো পদ্য, ছয় বা আট পঙক্তি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্তি তাদের, তাতে বানান অস্থির ও ছন্দ ভঙ্গুর ; বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ—এই দুই অনমনীয় উপাদানের সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হস্তলিপিও কাঁচা, এবং একেবারে ভিন্ন ধরনের, অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারে নেই, এবং আমাদের পক্ষে

তা সুধীন্দ্রনাথের বলে ধারণা করা সহজ নয়। এটা কেমন করে সম্ভব হলো যে সুধীন্দ্রনাথ, একুশ বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সমগ্র কাব্য বেরিয়ে গেছে, তখন ঐ রকম কাঁচা লেখা লিখেছিলেন ?

এর উত্তরে আমি এই তথ্যটি উপস্থিত করবো যে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলো না। তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটেছিলো কাশীতে ; আনি বেসান্ট কর্তৃক স্থাপিত সেই বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালোভাবে শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি। শুনেছি, কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে-মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন। মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে কিছু বেশি সময় লেগেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই ; যা লক্ষণীয়—এবং বতর্মান ও ভাবীকালের তরুণ লেখকদের পক্ষে শিক্ষণীয়—তা এই যে মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য, ও নিজের কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন। তাঁর খাতাগুলিতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার কবিতার পঙক্তিতে ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষ করে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন, কোথাও দেখা দিচ্ছে পঠিতব্য পুস্তকের তালিকা, কোথাও পর-পর কতগুলো মিল লিখে রাখছেন। এরই পরিণতিস্বরূপ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, "পথ" নামক কবিতার আদি লেখনের প্রতিটি পঙক্তি উচ্ছেদ করে তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক- একটি নতুন পঙক্তি রচনা করছেন ; দেখতে পাই "সংবর্তে"র ঈশিত্ব, "যযাতি"র অতুলনীয় কলাকৌশল।

আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে আমি যা বুঝিনি, তাঁর পাণ্ডুলিপি-পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে তাঁর সেই গোপন কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, কেন জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাত্মবোধ ঘটেছিলো—ধরা যাক তাঁরই মতো আত্মজৈবনিক কবি পোল ভের্লেনের সঙ্গে নয়, স্বভাবে যিনি তাঁর একেবারে বিপরীত, সেই মালার্মের সঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো বলে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো বলে তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন—যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো—যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে—সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, 'পরিশ্রমী হও।' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম

শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাঁর প্রথম খাতায় অঙ্কিত সেই মর্মস্পর্শী 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা-সহায়'—তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি পরিবারের স্বাক্ষরটুকু—এতেও বোঝা যায় কী-রকম নিষ্ঠা নিয়ে, আত্মসমর্পণের নম্রতা নিয়ে, তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে অনেক ছোটোগল্প বা উপন্যাসেরও খশড়া পাওয়া যায়, তার কোনো-কোনোটি সমাপ্ত ও ঔৎসুক্যজনক। সাত বছরের অনুশীলনের ফলে পৌঁছলেন 'তন্বী' পর্যন্ত, যে-পুস্তক, তার বিবিধ আকর্ষণ সত্ত্বেও, তাঁর পরবর্তী কবিতাসমূহের তুলনায় আজকের দিনে কৈশোরক রচনা বলে প্রতিভাত হয়।

১৯২৯-এ প্রথমবার তিনি দেশান্তরে গেলেন, প্রায় সংবৎসরকাল প্রবাসে কাটলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে ও আমেরিকায়, তারপর একাকী য়োরোপে। এই সময়টি তাঁর কবিজীবনের ক্রান্তিকাল ; এই সময়েই, তিনি যাকে অভিজ্ঞতা বলতেন, তা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে। সঙ্গে খাতাপত্র নিয়েছিলেন, জাপানের জাহাজে আরম্ভ করলেন একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত, পেন্সিলে ও কালিতে বিবিধ গদ্য-পদ্য রচনা, দেখে মনে হয় রোজই কিছু-না-কিছু লিখছেন। আমরা সাগ্রহে লক্ষ করি, কেমন করে, সেই প্রথম খাতার পর থেকে ক্রমশ তাঁর ভাষা বদলাচ্ছে, ভাব বদলাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভাবুকতা ও সংহতি, সুন্দরভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে হস্তাক্ষর। তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আবিষ্কার করি আমাদের বহুপরিচিত কতিপয় কবিতা—'অর্কেস্ট্রা'র পর্যায়ভুক্ত—কোনোটির রচনাস্থল আমেরিকা থেকে য়োরোপগামী তরণী, কোনোটির বা রাইনের তীরবর্তী নগর। ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘটে গেছে ; ভূলোক হয়েছে আরো বাস্তব, দ্যুলোক উজ্জ্বলতর ; জেমস জয়েস যাকে 'এপিফ্যানি' বলেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্নভঙ্গ', তেমনি কোনো উন্মীলনের প্রসাদ তিনি লাভ করেছেন ; প্রকৃতি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগে ও চক্রান্তে বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হয়েছেন এক নতুন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

তিনি কি বুঝেছিলেন যে তাঁর সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রম এবারে পুরস্কৃত হয়েছে ? বোঝেননি তা তো হতে পারে না, কেননা তাঁর নিরন্তর সাধনা ছিলো আত্মোপলব্ধি। আর সেইজন্যেই, তৃপ্তির তিলতম অবকাশ নিজেকে না-দিয়ে, তিনি আরো ব্যাপকভাবে প্রস্তুতির যজ্ঞে অবতীর্ণ হলেন ; প্রকাশ করলেন 'পরিচয়', পাঠ করলেন যা-কিছু পাঠযোগ্য, বৈঠক জমালেন শুক্রবারে, বন্ধু বেছে নিলেন সাহিত্যিক ও মনীষীদের মধ্যে, লিখলেন পুস্তক-সমালোচনা, প্রবন্ধ, ও ছদ্মনামে ছোটোগল্প, তিনটি য়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা ও গদ্য অনুবাদ করলেন। আর তাঁর নিজের কবিতা ? এই সবই তো তাঁর কবিতারই ইন্ধন, এই সমস্ত-কিছুর প্রভাব ও অভিঘাত, উদ্বৃত্ত ও অনুষঙ্গ, তাদের যোগ ও বিয়োগের অঙ্কে সর্বশেষ যে-ফলটুকু দাঁড়ায়, তাঁর কবিতা তো তা-ই। তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর কবিতার পাঠক সৃষ্টি করেছে, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি করেছে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দসমূহ,

দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ স্থাপন করেছে সমকালীন জগতের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধ, সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহ বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতার আদর্শ কী এবং সিদ্ধি কোনখানে, এবং অনুবাদগুচ্ছ বর্ধিত করেছে স্বাধীন রচনার উপর তাঁর কর্তৃত্ব। সবই কবিতার জন্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ন্যূনতম কথা এই বলা যায় যে তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলাভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি ; আর অন্য একটি কথা—উচ্চতম কিনা জানি না—যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন করে অঙ্কিত করে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে এমন এক শৃঙ্খলা ও সার্থকতা, যা একাধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত— এই লোমহর্ষক প্রক্রিয়াটিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনো-কোনো কবি প্রক্রিয়াটিকে গোপনে রেখে যান, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রামের চিহ্ন বীরের মতো অঙ্গে ধারণ করেছেন। জয়ী হয়েও তিনি এ-কথা ভোলেননি যে শান্তি দেবতারই ভোগ্য, মানুষের জীবনকে অর্থ দেয় শুধু প্রচেষ্টা। আর এইজন্যেই প্রৌঢ়বয়সে তিনি বলেছিলেন যে 'মালার্মের কাব্যাদর্শ তাঁর অন্বিষ্ট' ; এইজন্যেই প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এমন পৌনঃপুনিক। তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়— তা নয় বলে আমি অন্তত খেদ করি না ; ভুল হবে তাঁকে সিম্বলিস্ট বলে ভাবলে ; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈববর্জন কি সম্ভব ? এই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তি, এও কি দৈবেরই দান নয় ? অন্তত সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে সেই প্রথম কাঁচা হাতের খাতা থেকে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'তে তাঁর উত্তরণ পর্যন্ত যে-গতিবেগ কাজ করে গেছে, তারই অন্য নাম 'প্রেরণা'। আত্মোপলব্ধির এক স্বচ্ছ মুহূর্তেই তিনি নিজের বিষয়ে লিখেছিলেন : 'আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি'। বলা বাহুল্য, এই উক্তির প্রথমার্ধ সব কবির বিষয়েই প্রয়োজ্য, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ সত্য শুধু তাঁদের বিষয়ে, যাঁদের মনের প্রয়াসপ্রসূত উদ্বর্তন তাঁদের আয়ুর সঙ্গেই পা মিলিয়ে চলতে থাকে। আমাদের এই দেশে ও কালে, অনেক কবির মধ্যপথে অবরোধ ও অনেক প্রতিশ্রুতির তুচ্ছ পরিণাম দেখার পরে, সুধীন্দ্রনাথের এই বিরতিহীন পরিণতি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু হয়ে রইলো।

য়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হলো, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ : এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল : প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী', প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত' ও 'কুলায় কালপুরুষে'র প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন।

'পরিচয়ে'র সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-১৯৩৬—তাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমনও দিন গেছে যখন তিনি একই দিনে সাতটি শেক্সপিয়র-সনেট অনুবাদ করেছেন, একই দিনে রচনা করেছেন কবিতা ও গদ্য, কোনো লেখা শেষ করামাত্র আর-একটিতে হাত দিয়েছেন। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার করেছিলো এই সময়ে, এক স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছিলো, কোনো-এক অপূরণীয় ক্ষতির পরিপূরণস্বরূপ অনবরত ভাষাশিল্প রচনা করে যাচ্ছিলেন : জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহলেও মানুষ তার অমর আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ করেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০-এ লেখা "সংবর্ত" কবিতা ; ঐ কবিতাটি রচনা করার পর তিনি যেন মুক্তিলাভ করলেন, কবিতার দ্বারা পীড়িত অবস্থা তাঁর কেটে গেলো।

মুক্তি ? না। মায়াবিনী কবিতার দেখা একবার যে পেয়েছে সে কি মুক্তি পেতে পারে ? রচনার পরিমাণ হ্রাস পেলেও, আরাধ্যা সেই দেবীই থাকেন। জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেননি, কিন্তু অনবরত নতুন করে রচনা করেছেন নিজেকে, এবং সেটিও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর—যা বন্ধুমহলে মাঝে-মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পঙক্তি প্রসব করেছে ; তাঁর নতুন সংস্করণের ভূমিকা ; 'দশমী' কবিতাগুচ্ছ ; এবং তাঁর আলাপ-আলোচনা : এই সব-কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন একজন মানুষ, জগতের সঙ্গে যাঁর ব্যবহার বহুমুখী হলেও যাঁর ধ্যানের বিষয় বাণীমাধুরী। কবিতার প্রকরণগত আলোচনায় দেখেছি তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ ; 'আজি' ও 'আজই' শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য তাঁকে ভাবিয়েছে ; বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি—আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিলো জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন ; জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো 'দ্বিধা-মলিদা' বা 'শুরু-অগুরু'র মতো বিস্ময়কর অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্ত্যানুপ্রাস। সাহিত্যের তত্ত্ব বিষয়ে অনেকেই কথা বলতে পারেন ও বলে থাকেন, কিন্তু কতগুলো

অস্পষ্ট ও অনিচ্ছুক ভাবনা-বেদনাকে ছন্দ ও ভাষার নিগড়ে বাঁধতে হলে যে-সব সমস্যা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে শুধু এক কবির সঙ্গে অন্য এক কবির : এবং এই রকম আলোচনার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের শূন্য স্থান পূরণ করার কেউ নেই বলে আজ আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি যে 'কবি' শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের রচনা ও জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়েছিলো।

তাঁর বিষয় অনেকেই বলে থাকেন যে তিনি বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক'। এই কথার প্রতিবাদ করে আমি এই মুহূর্তেই বলতে চাই যে সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। এর প্রমাণস্বরূপ আমি দুটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করবো : প্রথমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চীৎকার—যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে তাঁর যন্ত্রণাবোধ—এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ। তিনি ভগবানের অভাব কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি, জনগণ বা ইতিহাস দিয়েও না : তাই, তিনি নিজেকে জড়বাদী বলে থাকলেও, তাঁর কবিতা আমাদের বলে দেয় যে তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য। তিনি ছিলেন না যাকে বলে 'মিনারবাসী', স্বকালের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হয়ে আছে তাঁর কবিতা ; কিন্তু যেহেতু তাঁর স্বকালে ভগবান মৃত, তাই কোনো মিথ্যা দেবতাকেও তিনি গ্রহণ করেননি ; যারা প্রফুল্ল মনে 'সমস্বর নামসংকীর্তনে' যোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, তাদের বীভৎসতার পাশে নিজের স্বর্গের কল্পনাটিও রেখে গেছেন। যা মর্ত্যভূমিতে সম্ভব নয় তা যাঁর গভীরতম আকূতি, তাঁকে কী করে জড়বাদী বলা যায় ?

আর-একটি কথা বহু বছর ধরে শুনে আসছি : সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য। এ-বিষয়ে একটি পুরোনো লেখায় যা বলেছি, এখানে তার পুনরুক্তি করা ভিন্ন উপায় দেখি না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন : তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হলো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হয়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দসমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর

বাক্যবিন্যাস, পঙক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার, এবং শব্দপ্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতার উদাহরণ বলেই গণ্য হতেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে, তাঁর কবিতা হতো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ, তাঁর চরিত্র প্রকাশ পেতো না। আর এই দুরূহতা নিয়ে আপত্তি—পঁচিশ বছর আগেকার তুলনায় তা এখন অনেক মৃদু হওয়া উচিত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক ও পাঠকসমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে ; অল্পবয়সীরা হয়তো জানেনও না যে 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', 'প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলাকৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ—যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমনকি 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটিও তাঁরই উদ্ভাবনা। এই ধরনের শব্দসমবায়ের সাহায্যে তিনি যুগল সিদ্ধিলাভ করেছেন : একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না-করে বা অগত্যা চিন্তাকে তরল না-করে, লিখতে পেরেছেন জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ, এবং তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন এমন এক শ্রবণসুভগ সংহতি ও গম্ভীর ঐশ্বর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব বললে বেশি বলা হয় না। এবং, এই সব শব্দরচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি কতদূর পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে। আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই কাব্যসংগ্রহ যাঁরা প্রথমবার পড়বেন, তাঁরা আমার ঈর্ষাভাজন, আর যাঁরা চেনা কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবেন, আমি নিজেকে তাঁদেরই সতীর্থ বলে মনে করি, কেননা আমি জানি যে আমার অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে স্বল্প যে-ক'টি গ্রন্থ আমার নিত্যসঙ্গী হবে, এটি তারই অন্যতম।

১৯৬০

রাজশেখর বসু

[১৮ মার্চ, ১৮৮০ : ২৭ এপ্রিল, ১৯৬০]

কোনো-এক দেশবিশ্রুত অধ্যাপক কর্ম থেকে অবসর নিচ্ছেন। তাঁর বিদায়সভায় বক্তৃতা হলো : 'ডক্টর ক. হলেন সত্যিকার খাঁটি পণ্ডিত, আজকালকার শৌখিন ডিলেটান্টেদের মতো নন ;—সেই যাঁরা চায়ের পেয়ালায় আড্ডা জমিয়ে তাঁদের বিদ্যাচর্চাকে একটা ড্রয়িংরুমের বিনোদ করে তোলেন, তাঁদের মতো একেবারেই নন ইনি ; এঁর পাণ্ডিত্য এতই খাঁটি যে এঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে গেলে তাকে বসতে বলারও এঁর সময় হয় না, চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয়া তো দূরে থাক।' —দুর্ভাগ্য আমাদের, এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি ও তাঁদের ভক্তদের সংস্রব সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলা হয়তো সম্ভব হয় না, কিন্তু সৌভাগ্য এই যে দৈবাৎ দু-একজন প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বা রাজশেখর বসুর দেখা পাওয়া যায়, এবং বাংলাদেশে এঁদের বংশ লুপ্ত হবে বলেও আশঙ্কা করি না। আনন্দের সঙ্গে, ঈষৎ বেদনার সঙ্গে ও, একটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি : একবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্য ভোগ করে এতই মুগ্ধ হয়েছিলুম যে ফিরে এসে, কিছুটা সোচ্ছ্বাসে, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা না-জানিয়ে পারিনি ; আমার চিঠিতে 'সৌজন্য' বা 'কৌলীন্য' শব্দের ব্যবহার ছিলো। রবীন্দ্রনাথ যে-উত্তর লিখলেন তাঁর শেষ বাক্যটি এই : 'একে আমরা সৌজন্য বলিনে, বলি মনুষ্যত্ব।'* মনে আছে ঈষৎ ব্যথিত হয়েছিলুম বাক্যটি পড়ে—না-হয়ে পারিনি ; আমার আনন্দনিবেদন যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে এলো। তারপর অনেক বছর কেটে গেলো, কিন্তু ঐ বাক্যটি আমি ভুলতে পারিনি, এবং এতদিনে এও বুঝেছি যে রবীন্দ্রনাথ সত্য বলেছিলেন। যাকে আমরা সৌজন্য বলি, বলি আতিথেয়তা, তা কোনো আলাদা বাক্সে তুলে রাখা, ছুটির দিনে বের করার মতো পদার্থ নয়—তা যদি হয় তাহলে তার মূল্যই নেই—সেটা মানুষের মৌলিক মনুষ্যত্বেরই এক বিচ্ছুরণ।

---

* বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' ষোড়শ খণ্ডে বুদ্ধদেব বসুর ১৩ নম্বর চিঠি ও রবীন্দ্রনাথের ১৮ নম্বর চিঠি দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'সৌজন্যকে বিশ্বাস করেছি—সমাজের নিয়মে নয়, অন্তরের স্বাভাবিক প্রবর্তনায়—সেটাকে আভিজাত্য বলিনে, বলি মনুষ্যত্ব।' (স.)

অথচ এই মনুষ্যত্ব বস্তুটি এত বিরল যে কোথাও তার স্পষ্ট কোনো প্রকাশ দেখলেই আমরা ভুল করে তার নাম দিয়ে ফেলি 'সৌজন্য' বা—এমনকি—'আভিজাত্য'। কিন্তু সত্যি কি ভুল এটা ? মনুষ্যত্ব যদি সেই গুণ হয় যা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহলে—অন্তত ব্যাকরণের সংগতিরক্ষার খাতিরে—তার জন্য অন্য কোনো নাম উদ্ভাবিত হওয়া কি উচিত নয় ? আর সেই চেষ্টাই কি আমরা করি না—যখন কোনো মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের দীপ্তি দেখতে পেলে তাঁকে আমরা সুন্দর বিশেষণে ভূষিত করি ?

অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা তাঁদের গদির জোরে প্রতাপশালী। যে-আসনে তাঁরা বসেছেন তা চলে গেলে, যে-ধন তাঁরা ব্যবহার করেন তা কোনোক্রমে লুপ্ত হলে—তখন আর তাঁরা কেউ নন। তাঁরা নিজেরাও তা জানেন ; আর সেইজন্য সেই ধনের বা আসনের উপর তাঁদের মর্মান্তিক আসক্তি দেখা যায়, আর আশে-পাশে যারা থাকে বা তাঁদের সামীপ্যে যাদের আসতে হয়, তাদের সকলকেই তাঁরা টের পাইয়ে দিতে ভালোবাসেন তাঁরা কত বড়ো ক্ষমতাশালী পুরুষ। এঁরাই তাঁরা, যাঁরা পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে হলেও সাক্ষাৎপ্রার্থীকে এক-আধ ঘণ্টা বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে রাখতে কিছুই মনে করেন না ; যাঁরা এত ব্যস্ত যে কিছুরই জন্য কোনো সময় নেই ; যা তাঁদের অব্যবহিত স্বার্থসম্পৃক্ত, তার বাইরে জগৎটার যেন অস্তিত্বই নেই তাঁদের কাছে।—কিন্তু অন্য কোনো-কোনো বিরল মানুষ আছেন যাঁদের মূল্য তাঁদের ধনে বা আসনে নয়—তাঁদের নিজেদেরই মধ্যে ; যদি সাংসারিক অর্থে তাঁরা কিছুও না হন তবু যে তাঁরা বিশেষ-কিছু তা, আশ্চর্যের বিষয়, সাংসারিক ব্যক্তিকেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। এই যাঁদের অন্তরে কিছু সম্পদ আছে, তাঁদের ব্যক্তিস্বভাব বিভিন্ন ও বিচিত্র হলেও তাঁদের সকলের মধ্যেই মনুষ্যত্বের একটি সহজ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

বহুকাল আগে, কোনো কাজে বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যালবার্ট বিল্ডিং-এর দপ্তরে আমাকে একবার যেতে হয়েছিলো। প্রয়োজন হলো কর্মসচিবের সঙ্গে দেখা করার। নাম পাঠিয়ে দেবার আধ মিনিটের মধ্যে তাঁর কামরায় ডাক পড়লো আমার, দেড় মিনিটের মধ্যে কাজটির সমাধা হয়ে গেলো, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই সেই সাহিত্যিক-কর্মসচিবের চরিত্র আমি অনুভব করেছিলুম : শাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট-পরা প্রৌঢ়, মুখের ভাবটি প্রথমে একটু কঠোর মনে হয়, যাকে বলে 'কাজের লোক' সেই রকম তাঁর ধরনধারণ, কিন্তু ওরই মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্য কিছুর ঝিলিক দিচ্ছে—তাঁর স্বভাবের গভীরতর কোনো উদ্ভাস যেন। দেখে চমৎকৃত হলাম যে আপিশের খাতায় পরিষ্কার বাংলা হরফে তিনি স্বাক্ষর করলেন। সেই প্রথম রাজশেখর বসুকে চোখে দেখলাম।

পরে, মাঝে-মাঝে তাঁর বকুলবাগানের বাড়িতে গিয়েছি। সব সময় কোনো উদ্দেশ্য

নিয়ে নয়, ভালো লাগতো বলেই। তিনি দোতলা থেকে নেমে আসতে দেরি করতেন না, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চা পৌঁছতো। কখনো জিগেস করতেন না অতিথিরা ইচ্ছুক কিনা, কেউ না খান তো না-ই খাবেন, কিন্তু পরিবেশিত হওয়াই চাই। এই ব্যাপারটা আমার মতে তুচ্ছ নয়, এতে মনের একটা বিশেষ ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ; 'চার অধ্যায়ে'র অন্তুর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছিলেন 'জেস্‌চার' বা ব্যঞ্জনা, এ ঠিক তাই। ডক্টর জনসন বলেছিলেন : 'যে-ভাবে প্রবেশ করলাম ঠিক সে-ভাবেই বেরিয়ে এলাম—মাঝে একপাত্র চা বা লেমনেডও অন্তঃস্থ হলো না—এমন বাড়িতে কখনোই কারো যাওয়া উচিত নয়।' আর এই কথাটাকেই ভাবের স্তরে উন্নীত করে রবীন্দ্রনাথ কি বলেননি ?—'যাকে আমরা হৃদয় দিতে পারি না তাকেও আমাদের কিছু দেবার আছে।'

আকারে-প্রকারে কিছুই মিল নেই, মনের দিক থেকে বরং দুস্তর ব্যবধান দু-জনের মধ্যে, তবু রাজশেখর বসুর সঙ্গে ব্যবহারকালে রবীন্দ্রনাথকেই আমার বার-বার মনে পড়েছে। অসংখ্যবার পত্রাঘাত করেছি তাঁকে—করতে হয়েছে—বাংলা ব্যাকরণ, বানান, উচ্চারণ বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন বা তর্ক : বিদ্যুদ্বেগে উত্তর এসেছে, যেমন এককালে শান্তিনিকেতন থেকে আসতো, কখনো, কোনো তুচ্ছ বিষয়েও, নিরাশ করেননি। এই তো সেদিন, যখন 'মেঘদূত'-অনুবাদের টীকা রচনা করছিলাম, হাৎড়ে-হাৎড়ে এগোতে হচ্ছিলো আমাকে, পদে-পদে আমার সংশয় তিনি ভঞ্জন করেছেন, কত তথ্য, কত উপকারী পরামর্শ, এবং আমার অজ্ঞতা বিষয়ে তাঁর সহিষ্ণুতা—এই সবই আজ আর-একবার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাঁর চিঠি ছিলো পড়তে ভালো, চোখে দেখতেও কম ভালো নয়—তাও রবীন্দ্রনাথের মতো—এক-একটি পোস্টকার্ডও তাঁর হস্তাক্ষরের গুণে নয়নাভিরাম। নির্মল ও নিষ্কণ্টক তাঁর অক্ষরবিন্যাস, পঙক্তিগুলো সমান, এক-একটি চিঠি যেন কয়েক মিনিটের সংহত মনোনিবেশের প্রতিচ্ছবি। রাজশেখরের হাতের লেখা ছিলো সাবেকি দিশি ছাঁদের, অক্ষরগুলোর ধরন একটু ঋজু, তাদের স্পষ্টতা অসামান্য—তা একেবারেই রাবীন্দ্রিক নয় বলেই রাবীন্দ্রিকের সঙ্গে তুলনীয়। আর, রবীন্দ্রনাথের চিঠি যেমন উচ্ছল ও বর্ণাঢ্য, তাতে যেমন বোঝা গেছে কোনো সাধারণ কথাকেও কত মনোমুগ্ধকর করে বলা যায়, অলংকরণের কী অসীম সম্ভাবনা ভাষার মধ্যে নিহিত হয়ে আছে, তেমনি রাজশেখরের চিঠিতে দেখেছি ভাষা কত পরিমিত ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে, কত অল্প কথায় সব কথা বলা যায়, অথচ সৌহার্দ্যজনিত উদ্বৃত্ত কিছু থাকে না তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের চিঠি থেকে সব সময় কিছু উপরি-পাওনা জুটতো আমাদের, আর রাজশেখরের চিঠি যেন আক্ষরিক অর্থে যথেষ্ট—একটু বেশি নেই তাতে, কিন্তু একফোঁটা কমতিও নেই ; আর এই নিরাভরণ সৌষ্ঠবেও ভারি একটি তৃপ্তি আছে আমাদের।

বলতে ইচ্ছে করে বাংলাদেশের বিশ শতকে রাজশেখর বসু যেন ক্লাসিক মানসের

প্রতিভূ, ইংলন্ডের আঠারো-শতকী লক্ষণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ—শৃঙ্খলা, ভারসাম্য, মাত্রাজ্ঞান, সংশয়ধর্মিতা ; তাঁর পথ আবেগের নয়, বুদ্ধির ; তাঁর লক্ষ্য স্বর্ণমৃগ নয়, 'সুবর্ণমধ্যম'। এই সব গুণের সন্নিপাত কিছু পূর্বে প্রমথ চৌধুরীতেও ঘটেছিলো, কিন্তু কিছুতেই বলা যাবে না যে এই দু-জনকে এক দেবতা গড়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদের সঙ্গে মিশেছিলো তাঁর কৃষ্ণনাগরিক ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও ভারতচন্দ্রীয় শব্দব্যসন ; পাঠককে ছত্রে-ছত্রে চমকে দিতে চেয়েছেন তিনি ; তাঁর ঝোঁক ছিলো—ফরাশিদের মতো—নিটোল নিখুঁত বাক্যগঠনের দিকে, প্রত্যেকটিকে চেঁছে-ছুলে কঞ্চির মতো ছিপছিপে আর ধারালো করে না-তোলা পর্যন্ত থামতেন না—সেজন্যে রচনার প্রবাহকে সুদ্ধ ব্যাহত করতে রাজি হতেন—একেবারে পুরোদস্তুর শিল্পী তিনি, প্রায় শিল্পবিলাসী। আর রাজশেখর বসু—যিনি নিজেকে 'আধা-মিস্ত্রি আধা-কেরানি' বলে ভাবতেন, যিনি মধ্যবয়সে মৃদুভাবে সাহিত্যে প্রবেশ করে তারপর দিনে-দিনে, ধীরে-ধীরে, আমাদের মাতৃভাষার প্রধান নির্ধারক ও অভিভাবক হয়ে উঠলেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংসর্গ এড়াতে পারলেন না—তাঁর রচনার প্রধান গুণ একটি সরল গাম্ভীর্য বা সংযত সচ্ছলতা ; তাঁর বাক্যবিন্যাস সরল, অর্থবোধ অনবরত অবাধ, কোনো শিল্পসম্মত চাতুর্যের আশ্রয় বিনা তিনি যে তাঁর সংবাদটিকে সরাসরি পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেন এটাই তাঁর সবচেয়ে বড়ো চাতুরী। প্রমথ চৌধুরী বলতেন : 'সাহিত্য আমার পেশা নয়, নেশা', আর রাজশেখর বলতে পারতেন : 'সাহিত্য আমার পেশা নয়, নেশাও নয়—কাজ।' বিলম্বে যাত্রা করেও তিনি যে সাহিত্যের পথে বহু দূরে পৌঁচেছিলেন, তার কারণ তাঁর সাধু, বিনীত ও পরিশ্রমী স্বভাব ; নিষ্ঠা, প্রযত্ন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যা লভ্য তা নির্ভুলভাবে গড়ে তুলেছিলেন : আমরা চোখের উপর জন্মাতে দেখলুম তাঁর 'চলন্তিকা', তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'—যে-তিনখানা বই হাতের কাছে না-থাকলে আমাদের এক দণ্ড চলে না আজকাল। আধুনিক চলিত বাংলার প্রতিষ্ঠা—যে-কাজ আরম্ভ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ—তা সম্পূর্ণ হলো এই আশ্চর্যরকম আধুনিক মনোভাবাপন্ন প্রবীণের হাতে ; তাঁর 'চলন্তিকা'র পরে তর্কাতীত হলো এই কথা যে বাংলাভাষা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুশাসনে আর সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর কেমন করে বাংলা, তার স্বাভাবিক বাগ্‌ধারার বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন না-করে সংস্কৃতের চারুতাকে আয়ত্তে আনতে পারে—হতে পারে একই সঙ্গে নির্ভার ও সংবৃত, পরিশীলিত ও গতিশীল, তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সহযোগে শিষ্টালাপের মতো প্রাঞ্জল, যথোচিত ও নির্বহুল, তার কোনো প্রকৃষ্ট উদাহরণ যদি খুঁজতে হয় তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র গদ্যকে সর্বাগ্রে স্থাপন করতে চাইবো। এই পুরুষোচিত অনার্দ্র স্নিগ্ধতা, এই উত্তেজনাহীন বিনয়ী বৈদগ্ধ্য—এটাই তাঁর রচনাকে দিয়েছে আস্বাদ,

এবং তাঁর ব্যক্তিত্বকে সুষম ও শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে।

আমি ভুলিনি যে রাজশেখর বসুর নামান্তর 'পরশুরাম', আর যা লিখে প্রথম তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তা কৌতুক বা ব্যঙ্গরচনা। কিন্তু তাঁর 'গড্ডলিকা'র খ্যাতির সঙ্গে তাঁর আজকের প্রতিষ্ঠার কি কোনো দিক থেকেই তুলনা হয়? তার রঙ্গব্যঙ্গে আমরা যাঁকে পেয়েছি তিনি একজন উৎকৃষ্ট লেখক, আর তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষীয় অতীতে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছে। কৌতুকসৃষ্টির জন্য তাঁকে সমকালীনকে খণ্ডিতভাবে দেখতে হয়েছিলো—তা না-করলে কৌতুক সম্ভব হয় না—কিন্তু তাঁর পুরাণের পুনর্লিখনে অতীত সমগ্রভাবে সঞ্জীবিত হলো; আগামী পঁচিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত—যতদিন না আবার কোনো প্রতিভাশালী অনুবাদ দেখা দেয়—'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বলতে তাঁর গ্রন্থ দুইটিকেই বোঝাবে—অন্তত অধিকাংশ শিক্ষিত ও সাবালক পাঠকের কাছে। যে-সমগ্রতাগুণে ঐ গ্রন্থ দুটি মূল্যবান, তা ব্যঙ্গ রচনায় সঞ্চার করতে হলে যে-সব গুণ বা দোষের প্রয়োজন হয়—যেমন বিবমিষা, অন্তর্দাহ, আদর্শের প্রতি আসক্তি, অসম্ভবের জন্য আকাঙ্ক্ষা—সেগুলো ছিলো 'পরশুরামে'র পক্ষে অস্বভাবী, আর সেইজন্যই তাঁর কৌতুক এমন বিশুদ্ধ ও সর্বজনের পক্ষে প্রীতিকর। তিনি, বাঙালি লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে কম যিনি পাগল, সবচেয়ে বেশি যাঁর মাথা ঠান্ডা—যেমন একদিকে তিনি রোমান্টিকদের পরপারে, তেমনি সুইফট অথবা ভলতেয়ারের যন্ত্রণাও তাঁর জগতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। হয়তো—ঠিক বলতে পারবো না—ঐ রকম জ্বালাময় বিদ্রূপ আমাদের মৌলিক স্বভাবেরই বহির্ভূত; অন্ততপক্ষে এতকালের মধ্যে বাংলা ভাষায় একটিও 'ইউটোপীয়' উপন্যাস রচিত হয়নি এবং বঙ্কিম থেকে রাজশেখর পর্যন্ত যাঁরা ব্যঙ্গরচনায় হাত দিয়েছেন তাঁরা সকলেই, শেষ পর্যন্ত, এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রসন্ন বা সহনশীল। মানুষের ছোটো-ছোটো দুর্বলতা নিয়ে পরিহাস করেছেন তাঁরা, সমাজের কোনো-কোনো ত্রুটির বিচ্ছিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সমগ্রভাবে সমাজজীবনে বা মানবস্বভাবে রূপান্তর আকাঙ্ক্ষা করেননি। প্রমথ চৌধুরী একবার লিখেছিলেন : 'মানুষ খারাপ বলে দুঃখ করি না, মানুষ দুঃখী বলে মন-খারাপ করি'; অথচ, মানুষ যে খারাপ এই অতি সাধারণ সত্যটা অসহ্য হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত বিদ্রূপের জমি উর্বর হতে পারে না।— কিন্তু যা হয়নি তা কেন হয়নি, এই দূরকল্পনা আমার অভিপ্রায়ের বাইরে, আপাতত এ-কথা ভেবে দুঃখ না-করা অসম্ভব যে কৌতুকরচনায় পরশুরামের উত্তরাধিকারী বাংলা সাহিত্যের দিগন্তে এখনো দেখা যাচ্ছে না।

১৯৬০

শিশিরকুমার ভাদুড়ী
(১৮৮৯-১৯৫৯)

তিরিশ বছর, পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমরা 'কল্লোলে'র দল এই কলকাতায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিলাম। ছাপার অক্ষরে সবেমাত্র বেরিয়েছি আমরা—কেউ-কেউ কলেজের ছাত্র, কেউ বা অবজ্ঞাভরে কলেজ থেকে ফেরার, কেউ ভ্রাম্যমাণ, কেউ বিবাহিত। সারাক্ষণ আমরা উৎসাহে উদ্বেল হয়ে আছি, সেই উৎসাহের বিষয়গুলি বিচিত্র, পরিবর্তনশীল, অসংখ্য এবং অনেক সময়ই ঐকাহিক। তবু তারই মধ্যে কয়েকটি স্থায়ী বিষয় ছিলো না তা নয় : য়োরোপীয় মহাদেশে এমন কয়েকজন সাহিত্যিককে আমরা আবিষ্কার করেছি যাঁদের রচনার অনবরত পশ্চাদ্ধাবনে আমরা প্রতিশ্রুত, এবং মাতৃভাষায় যাঁরা নতুন লিখছেন তাঁদের দিকেও বিরামহীন আমাদের মনোযোগ। ঠিক সাহিত্য নয় অথচ সাহিত্যের সংলগ্ন, এমন কোনো-কোনো বিষয়েও আমরা উচ্ছ্বসিত ছিলুম : যেমন নজরুল ইসলামের কণ্ঠসংগীত ও শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয়।

কিন্তু কলকাতার, সারা বাংলার, শিক্ষিত সমাজে কেউ কি ছিলেন যিনি শিশিরকুমারের অভিনয় বিষয়ে উৎসাহী নন ? মনীষীদের মধ্যে এমন কেউ, যাঁর অন্যতম গন্তব্য নয় নাট্যমন্দির ? ইতিমধ্যেই, মাত্র কয়েক বছরের মঞ্চজীবনের পরে, শিশিরকুমার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন, প্রায় একটি রূপকথায় ; আমরা তাঁকে তখনই গল্পের মানুষের মতো দেখছি, যেন তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে, সাংসারিক আইন-কানুনের পরপারে। পণ্ডিত বলে যশস্বী তিনি, আলাপশিল্পে সুদক্ষ বলে ; আর তাঁর অভিনয়প্রতিভা এমন স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও তর্কাতীত যে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অচিন্ত্যকুমারকে কবিতা লিখতে হলো। তাঁর কণ্ঠের 'সীতা' ডাক শুনে পুলকবেদনায় আপ্লুত হলো কলকাতা।

যেমন তিনি অভিনয়ে অনন্য, তেমনি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা সৃষ্টি করে নেবার। তাঁকে কেন্দ্র করে আর যাঁরা বিকশিত হলেন : যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী—এই সব মৃত মানুষের নাম, আজকের তরুণদের কাছে যার কোনো অর্থ নেই আর, সেই সব নাম কৃতজ্ঞ বেদনায় স্মরণ করা আমাদেরই কর্তব্য, আমরা যারা

সেই সময়ে তরুণ ছিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চে নতুন, কিন্তু শিশিরকুমারের এক-একটি প্রয়োজনায় প্রথম থেকে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কোথাও ছিলো না আড়ষ্টতা বা ছন্দপতন ; আদ্যন্ত ছিলো একই সামঞ্জস্যের অন্তর্ভূত, একই পরিকল্পনার অনুগামী। 'সীতা', 'আলমগীর', 'ষোড়শী'—এই তিনটি নাটক অভিনীত হবার পরেই এই সত্যটি অনুভূত হলো যে নাট্যমন্দির একটি রঙ্গমঞ্চমাত্র নয়, নয় এমন কোনো প্রমোদভবন যা থেকে বেরিয়ে এলে তার কথা আর বেশিক্ষণ মনে রাখতে হয় না ; তা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে, হয়ে উঠেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালির অবশ্যকৃত্য।

অথচ নাট্যমন্দির টিকলো না। কেন টিকলো না তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা আলোচনা করবেন, আমরা এর পরে শিশিরকুমারকে দেখতে পাচ্ছি রংমহলে : 'বিরাজবৌ', 'রমা' ('পল্লী-সমাজ') ও 'বিজয়া'র ('দত্তা') অভিনয়ে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যেন এক রহস্যময় আত্মিক যোগ আছে তাঁর ; যিনি নিজের হাতে কখনো একখানা নাটক লেখেননি, তিনি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার হয়ে উঠলেন, তা শিশিরকুমারেরই জন্য। কী জীবানন্দ, কী রমেশ, কী বিরাজের স্বামী—প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি যেন ঠিক সেইভাবেই মূর্ত ও সজীব করে তোলেন, যে-ভাবে বাংলাদেশের পাঠকরা বহুকাল ধরে তাদের কল্পনা করে এসেছে। শুধু 'বিজয়া'তে তাঁর রাসবিহারী আমাদের ম্লান করে দিলে ; আমরা বইতে যার কথা পড়েছিলাম সে-ব্যক্তি এক গৃধ্নু, কপট ও চক্রান্তকারী ব্রাহ্ম, আর রঙ্গমঞ্চে যাকে দেখলাম সে এক প্রহসনের স্থূল বিদূষক।

বলতে ইচ্ছে করে, শিশিরকুমারের স্বাভাবিক উন্মুখতা ছিলো বীরত্ব ও কারুণ্যের দিকে ; যা আবেগে আর্দ্র বা বীর্যে উদ্ধত তার বাইরে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না। তাঁকে কল্পনা করা যেতো ম্যাকবেথ অথবা ওথেলোর ভূমিকায়, কিন্তু ইয়াগো অথবা শাইলকের নয়। হাস্যরসও যে তাঁর অধিকারভুক্ত নয়, এ-কথা বুঝেছিলাম তাঁর 'শেষরক্ষা' দেখে। পুরোনো স্টার থিয়েটারের প্রধান কৃতি 'চিরকুমার সভা'র যখন গৌরবের চরম ক্ষণ, তখন তার প্রতিযোগীরূপে শিশিরকুমার 'শেষরক্ষা' অবতীর্ণ করলেন। কিন্তু দর্শকদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত সম্মোহনও এ-নাটকটিকে ধরে রাখতে পারলে না ; স্পষ্ট বোঝা গেলো যে তিনি চন্দ্রবাবু নন।

তবু—কী আশ্চর্য—এই শিশিরকুমারই 'সধবার একাদশী'তে এক তুলনাহীন রূপসৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়ে এই নাটকটি দেখার সুযোগ ঘটেনি আমার ; আমি দেখেছিলাম শ্রীরঙ্গমে, তাঁর প্রতিভার অবক্ষয়কালে, কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশত যোগেশ চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এই তিনজনই জীবিত ছিলেন তখনও, এবং এঁদের প্রণীত ডেপুটি, অটল ও বাঙালটিকে আমার মনে হয় না আমি কখনো

ভুলতে পারবো। যদিও লোকপ্রিয়তায় 'সীতা' সর্বাগ্রগণ্য, তবু শিশিরকুমারের সৃষ্টির তালিকায় 'সধবার একাদশী'কে আমি প্রথমে স্থান দিতে চাই ; অমন একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর রূপকর্ম তিনিও আর পরিবেশন করেননি।

আরো আশ্চর্য এই যে নিমচাঁদের ভূমিকায় যিনি অপ্রতিরোধ্য, সেই তিনি মাইকেল মধুসূদনকে রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। যেমন 'যোগাযোগে'র মধুসূদন, তেমনি কবি মধুসূদনকেও তাঁর আকারে আমরা যেন চিনতেই পারলাম না ; নাটক যত এগোয়, ততই অবিশ্বাস্য মনে হয় যে ইনিই কুমুদিনীর স্বামী বা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রণেতা। তার উপর এই নাটক দুটির বিন্যাস ছিলো অত্যন্ত শিথিল,* বিদ্যাসাগরের ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরী ছাড়া পরিপোষক অভিনেতারা ছিলেন দুর্বল, আর অভিনেত্রীরা শোচনীয় ;— সব মিলিয়ে এ-দুটি যেন প্রমাণ করে দিয়েছিলো যে শিশিরকুমারের স্রোত এবার শুকিয়ে এলো। আমরা, যারা তাঁকে দীর্ঘকাল ধরে ভালোবেসেছি, আমরা সেদিন গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছিলাম।

তাঁর প্রধান ব্যর্থতার কথা কারোরই অজানা নেই ; অভিনয়ে ভাস্বর তিনি, নটনটী ও রঙ্গমঞ্চ রচনায় প্রতিভাবান, অথচ তাঁর হাতে বাংলা ভাষার নাটক জিনিশটি এক পা অগ্রসর হতে পারলে না, তাঁর ধাতৃত্বে ভূমিষ্ঠ হলো না কোনো নতুন অর্থাৎ নতুন ধরনের, নাট্যকার অথবা নাট্যশিল্প। বাংলা ভাষার কবিতা, উপন্যাস, বা সাধারণভাবে 'লিখিত' সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ব্যবধান যে এখনো এমন পীড়াদায়করূপে বিপুল, তার কারণস্বরূপ প্রথমেই বলতে হবে যে অভিনীত নাটকগুলির পাঠযোগ্যতা বিষয়ে শিশিরকুমার উদাসীন বা অমনোযোগী ছিলেন। সেই গুণ থাকলে ভালো, না-থাকলেও এসে যায় না, এ-কথা না-ভাবলে তিনি 'মধুসূদন' মঞ্চস্থ করতে পারতেন না। তাঁর মঞ্চের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধুনিক নাট্যকার যিনি, সেই শরৎচন্দ্র যে নাট্যকারই নন, এই তথ্যটিকে আমি অর্থপূর্ণ বলে মনে করি। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে শিশিরকুমার এক অবশ্যমান্য পুরুষ।

---

*কেন, 'বনফুল'-এর 'শ্রীমধুসূদন'কে উপেক্ষা করে, দুটি প্রতিবেশী রঙ্গমঞ্চ সেই পুস্তকেরই দুটি অক্ষম অনুকরণ নিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করেছিলেন, এই প্রশ্ন আমাকে বিস্তর ভাবিয়েছে, কিন্তু কখনো এর উত্তর পাইনি। আর-এক কথা বহুদিন ধরে ভেবেছি : শিবরাম চক্রবর্তী-কৃত 'ষোড়শী' ('দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ) শিশিরকুমার ব্যবহার করেননি কেন? কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি সম্প্রতি 'উল্টোরথে' ; সেখানে শিবরাম বলছেন যে নাট্যমন্দিরে যেটি মঞ্চস্থ হয়েছিলো সেটি তাঁরই রচিত 'ষোড়শী', কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়নি।—পাদটীকা : ১৯৬১

ইতিহাসরচনায় এখনো অভ্যস্ত হইনি আমরা ; তাঁর নট-জীবনের কতটুকু চিহ্ন আজ খুঁজে পাওয়া যাবে জানি না। সমকালীন তথ্য, আলোচনা,ছবি, পত্রিকাদির কর্তিকা— সব একত্র পাওয়া গেলে তাঁর কীর্তিশালা পুনরায় নির্মিত হতে পারে ; আমাদের উত্তরপুরুষের অজানা থাকে না প্রথম-বিশ-শতকের বাঙালি জীবনে শিশিরকুমারের অবদান কত মহৎ। কিন্তু আমাদের দেশে সে-রকম সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই ধরে নিচ্ছি। তবে আজকের দিনে যাঁরা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় তাঁদের স্মৃতিতে এখনো তিনি জীবিত আছেন। তাই আমি এখনই বলে নিতে চাই যে আমাদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয়তমদের অন্যতম, যে-আনন্দ তাঁর কাছে আমরা পেয়েছি তা রত্নের মতো আমাদের মনে গ্রথিত হয়ে আছে, এবং তা আছে বলেই, আমরা ঈর্ষা করি না আমাদের সন্তানদের, যারা ঝাঁকে-ঝাঁকে সিনেমার দিকে ধাবমান, বা যারা রঙ্গমঞ্চ থেকে নতুন সম্পদ আহরণ করছে বলে শুনতে পাই।

১৯৫৯

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প

রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো ; তাঁর গদ্যের গুণ কবিতারই গুণ ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই তাঁর গদ্যের উপঢৌকন। যদি কোনো খণ্ডপ্রলয়ে তাঁর সব কবিতার বই লুপ্ত হয়ে যায়, থাকে শুধু নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, তাহলে সেই প্রবন্ধ নাটক উপন্যাস থেকেই ভাবীকালের পাঠক বুঝে নিতে পারবে যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাকবির নাম।

হ্যাঁ, প্রবন্ধ থেকেও বুঝে নিতে পারবে। প্রবন্ধ : যাতে স্পষ্ট কোনো বিষয় চাই, বিশেষ কোনো পদ্ধতি চাই, যাতে যুক্তির সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে মীমাংসার দিকে পৌঁছতে হয়—অন্তত সেই রকমই ধারণা করি আমরা—তাতেও এই অবিশ্বাস্য কবি পরতে-পরতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন ; যে-কোনো বিষয়ে যে-কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে ওঠে তাঁর স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ—এক কথায়, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থাৎ, প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় বলে আমরা জানি—অন্ততপক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হয়ে থাকে—তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।

যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের পক্ষপাতী নন, বা যাঁরা মনে করেন আলোচনাধর্মী রচনায় কবিতার গুণ দোষ বলে গণ্য, অতএব বর্জনীয়, আমি তাঁদের কথা বেশ বুঝতে পারি। এমনকি তাঁদের কথায় সায় দিয়ে ফেলতেও লুব্ধ হয়েছি মাঝে-মাঝে। সত্যি তো—রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে কত পুনরুক্তি, কত অবান্তর অংশ, অনেক বলেও মীমাংসা যেন অস্পষ্ট থেকে যায়, গুরুমশাই-ধরনে 'বুঝিয়ে' যেন বলতে পারেন না। যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প ; যেখানে পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে তিনি তীক্ষ্ণ করে তোলেন তার ইন্দ্রিয়গুলিকে ; যেখানে বুদ্ধির কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি বেআইনিভাবে আমাদের হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন। সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, ইতিহাস—এই সব বিষয়ে, পূর্বোক্ত দুর্বলতা সত্ত্বেও শব্দালংকার থেকে বক্তব্যকে তবু আলাদা করে নেয়া যায় ও চেনা যায় ; কিন্তু—যা তাঁর প্রিয়তম ও অন্তরতম, সেই সাহিত্য বিষয়ে যখন আলোচনা করেন তখন কোনো বিশ্লেষণযোগ্য 'সারাংশ' যেন দুর্লভ হয়ে ওঠে ; তাতে থাকে না কোনো পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার্থ বা বিধান ; কোনো সুস্পষ্ট সূত্র ঘোষণা করতে তাঁকে অক্ষম বা অনিচ্ছুক বলে মনে হয়,

কিংবা কখনো তা করে ফেললেও নিজেই সেটাকে খণ্ডন করেন—হয়তো বা পরমুহূর্তেই। মানতেই হবে, যে-অর্থে আরিস্টটল, আনন্দবর্ধন বা মল্লিনাথ সমালোচক, সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সমালোচক পর্যন্ত নন।

তা না-ই বা হলেন ; ঐ পদবি তাঁর প্রাপ্য কিনা তা নিয়ে তর্ক করবো না। শুধু বলি : একাধারে সফোক্লেস ও আরিস্টটল কি হওয়া যায়, বা একাধারে কালিদাস ও মল্লিনাথ—সেটা কি স্বাভাবিক, না কাম্য, না সম্ভব, না কি মর্ত্যলোকের পক্ষে সহনীয় ? আর-এক কথা : হোমার ও সফোক্লেস যদি আগে জন্মে না যেতেন, তাহলে কোথায় থাকতেন আরিস্টটল ; বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতি কবিদের সামনে না-রেখে কোনো আনন্দবর্ধনকে কল্পনা করতে পারি কি ? সাহিত্যব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা তাঁর অনুগামী মাত্র ; এবং কোনো উত্তম সৃষ্টিশীল প্রতিভা যখন সমালোচনায় হাত দেন তখন তাঁর পক্ষে যা সম্ভব হতে পারে তা 'সমালোচনাকেই সৃষ্টিকর্ম করে তোলা।' এই কথাটা রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন ; তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায় এটি মনে রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে, পদ্য ও গদ্য রচনা মিলিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অখণ্ডতা প্রকাশ পাচ্ছে সেইটেই তিনি ; কোনো পাঠকগোষ্ঠীকে খুশি করার জন্য তা ছাড়া অন্য কিছু তিনি হতে পারেন না ; আমরা গ্রহণ করি বা না করি তিনি অনবচ্ছিন্নভাবে তিনিই থেকে যাবেন। তাঁর গদ্য অতিভাষী ? তাঁর কবিতাও তা-ই। অলংকারবহুল ? অস্পষ্ট ? উচ্ছ্বাসপ্রবণ ? তাঁর কোনো-না-কোনো পর্যায়ের কবিতা বিষয়ে এর প্রত্যেকটি কথা সত্য। যেমন "বসন্ত যাপনে"র মতো গদ্যরচনায় তিনি প্রবন্ধের আকারে কবিতা লিখেছেন, তেমনি কবিতার আকারে প্রবন্ধ লিখেছেন "এবারে ফিরাও মোরে" বা "বসুন্ধরা"য়। আমরা তাঁকে দোষ দিতে পারি সাহিত্যে বর্ণসংকরতা ঘটিয়েছেন বলে ; গদ্যে কবিতার রীতি, ও কবিতায় গদ্য বিষয়ের সঞ্চার করে তিনি উভয়েরই ক্ষতি করেছেন এমন কথাও স্বীকার্য হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে জরুরি হয়ে ওঠে তা এই : আমরা তাঁকে বর্জন করতে পারি কি ? রবীন্দ্রনাথের দোষগুলি শিশুদের মতো সরল, কোনো ভান নেই তাদের, আত্মগোপনের কোনো চেষ্টাই নেই, নিজের বাড়ির আঙিনায় বসে অত্যন্ত সহজে তারা খেলা করে, দর্শকের হাতে ধরা পড়ে যেতে ভয় করে না, ধরা পড়ে গিয়েও মলিন হতে জানে না। এক বিরাট প্রতিভার আশ্রয়ে খেয়ে-পরে বড়ো হচ্ছে তারা ; যেমন তাদের হ্রাসপ্রাপ্তির লক্ষণ নেই, তেমনি তাদের উৎসস্থল সেই প্রতিভাও পরাক্রান্ত ; প্রয়োজন হলে তা বজ্রপাতের মতো অবিশ্বাসীকে বিদীর্ণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর দোষ আমরা যে-কেউ যে-কোনোদিন ধরতে পারি, আর যাঁকে না-হলে আমাদের কারোরই এক মুহূর্ত চলে না। আর এখানেই তাঁর চরম জয় যে তিনি অপরিহার্য : তাঁর দোষগুলিকে ছাড়াতে গেলে তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়, তাই সব

দোষ নিয়েই—যখন মনে-মনে তাঁর 'বিরুদ্ধে' তর্ক করছি ঠিক তখনই—সব দোষ নিয়েই তাঁকে বরণ করে নিতে হবে ; উৎকর্ষের অন্য বহু উদাহরণ তাঁকে ম্লান করে দিতে পারে না, যেমন পারে না বহু তীর্থের স্মৃতি গৃহদেবতাকে অপসৃত করতে।

কিন্তু কোন অর্থে অপরিহার্য, কোন অর্থে গৃহদেবতা ? তিনি 'কথা ও কাহিনী' না-লিখলে মধ্য বিদ্যালয়ে পড়াবার মতো ভালো বাংলা কবিতার বই পাওয়া যেতো না, সেইজন্য ? 'জনগণমন' রচনা না-করলে সর্বভারতে সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য জাতীয় সংগীত দুষ্প্রাপ্য হতো, তাই ? 'গীতবিতান' প্রণয়ন না-করলে উৎসবে, অন্নপ্রাশনে, শ্রাদ্ধবাসরে ও চলচ্চিত্রে নায়িকাকর্তৃক গীত হবার মতো সংগীতের অভাব ঘটতো বলে ? না কি তাঁর প্রবন্ধের ভাণ্ডার থেকে বক্তৃতায় ও সাংবাদিক রচনায় উদ্ধৃতিযোগ্য বচন আমরা অনবরত পেয়ে যাচ্ছি, সেইজন্য ? বাংলাদেশে ও সর্বভারতে তাঁর যে-প্রাতিষ্ঠানিক মূর্তি স্থাপিত হয়েছে—যাকে বিগ্রহ বললে ভুল হয় না—তার উপর জোর দিতে চাচ্ছি না আমি, যেখানে আমরা উঠতে-বসতে তাঁর নাম করছি, প্রায় যে-কোনো অনুষ্ঠান আরম্ভ করছি তাঁকে স্মরণ করে, প্রায় যে-কোনো মতবাদের সমর্থকরূপে দাঁড় করাচ্ছি তাঁকে, সেখানে তিনি সর্বজনের স্বতঃপ্রাপ্ত আশ্রয়, আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মহিমার একটি প্রতীকরূপে সর্বভারতের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু ও-রকম বিনাব্যয়ে কোনো পা ঠ ক তাঁকে পেতেই পারেন না (কেননা পাঠক হতে হলে নিজের উপর দায়িত্ব নেবার শক্তি চাই) ; তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তাঁকে উপার্জন করে নিতে হবে আমাদের ; তিনি যে একজন বড়ো কবি বা ভালো কবি, এই মোটা কথাটাও আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ। আর, একজন পাঠক হিশেবেই আমি বলতে চাই যে দোষ তাঁর যতই দেখতে পাওয়া যাক, তাঁকে না-হলে আমাদের একদণ্ড চলবে না।

কিন্তু এক বাছাই-করা রবীন্দ্রনাথ কি সম্ভব হয় না ? আমরা কি পেতে পারি না বাহুল্য বাদ দিয়ে তাঁর বাণী, উচ্ছ্বাস বর্জন করে উপলব্ধি কিংবা তার 'শ্রেষ্ঠ' রচনার সমাহার ? সেটা সম্ভব নয় বলতে পারি না, বরং আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর মতো অতিপ্রজ লেখকের পক্ষে সংকলন একটি উপকারী চিকিৎসা। সেদিকে তাঁর নিজের ও অনুরাগী সম্পাদকের প্রয়াস দেখা গেছে, সাহিত্য অকাদেমির এই গ্রন্থেও* সে-চেষ্টা প্রতীয়মান। ভাবীকালেও তাঁর রচনা থেকে চয়নের প্রয়োজন নিরন্তর অনুভূত হবে মনে হয়, কেননা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি ; কোনো বিদেশী অথবা নতুন পাঠকের কাছে তাঁকে উপস্থিত করতে হলে প্রথমেই তাঁর বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে চাই—'জানেন তো তিনি স ব র ক ম লেখা লিখেছেন, আর

---

* সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিতব্য রবীন্দ্রনাথের 'নিবন্ধমালা' দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা।

প্রায় এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে লেখেননি।' পাছে কেউ ভাবে যে তিনি শুধু কান্তকোমল পদাবলি লিখেছেন তাই আমরা চেষ্টা করি তাঁর সমাজবিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে তুলে ধরতে ; পাছে কারো ধারণা হয় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসার ফলে জগৎটাকে তিনি দেখতে পাননি তাই আমরা 'গল্পগুচ্ছ' খুঁটে-খুঁটে তাঁর বাস্তববোধের উদাহরণ বের করি। এই সবই সৎকর্ম, তাঁর বিষয়ে আলোচনার পক্ষে প্রাসঙ্গিক, কিন্তু তাঁকে প্রদক্ষিণ করার পরে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনে যখন উদ্যত হই তখনই ধরা পড়ে যে গভীরতম অর্থে তিনি কবি, কবি ছাড়া আর-কিছুই নন। এক উৎস থেকে, একই উৎসাহের প্রেরণায় তাঁর বিখ্যাত ভিন্ন-ভিন্ন 'দিক'গুলি বিকীর্ণ—ঠিক যে-ভাবে "নির্ঝরের স্বপভঙ্গ" কবিতায় বলা আছে—খোপে-খোপে ভাগ করা মন নয় তাঁর, সাময়িকভাবে জুড়ে-দেয়া কিন্তু আসলে সম্পর্করহিত অনেকগুলো গাড়িকে এঞ্জিনের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে না ; তাঁর সব বৈচিত্র্য যেন প্রতিহত ও অপ্রতিরোধ্য জলস্রোতের গতিভঙ্গি। 'কবি রবীন্দ্রনাথ', 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ' , 'প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ'—এই বিভাগগুলি তাই স্বীকার্য হলেও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষণীয় ; অর্থাৎ তারা পরস্পরে প্রবিষ্ট, পরস্পরের উদ্দীপক ও পরিপূরক, এবং এক অখণ্ড সত্তার প্রতিরূপ। যে-মৌলিক উপাদানে রবীন্দ্রনাথ গঠিত সেটা কবিত্বশক্তি, সেটাই তাঁর গদ্যরচনাকে সপ্রাণ ও সার্থক করে তুলেছে ; আগুন যেমন যে-কোনো ইন্ধনে ভাস্বর, তেমনি তাঁর কবিপ্রতিভাও যে-কোনো রূপকল্পে প্রদীপ্ত। দীপ্তির তারতম্য নিশ্চয়ই আছে, নিশ্চয়ই 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে ও 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধমালায় কবিত্বের একই প্রকার ঘনতা নেই ; কিন্তু কবিতার দ্বারা স্পৃষ্ট বলেই তাঁর প্রায় যে-কোনো সন্দর্ভে কিছু-না-কিছু যৌবনশোণিমা লক্ষ করা যায়—হোক না তার প্রসঙ্গ পুরাতন বা বক্তব্য সুপরিচিত বা উপদেশ আজকের দিনে অবান্তর। হাড়ে-হাড়ে কবি নন এমন কেউ কি লিখতে পারতেন "ছেলেভুলানো ছড়া"র মতো সমালোচনা বা 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে'র মুখবন্ধ, বা 'সহজপাঠে'র মতো বর্ণপরিচয়পুস্তক ? 'কবিতা আছে ভাষার সর্বত্র—ছন্দ থাকলেই কবিতা থাকবে—সর্বত্র আছে, নেই শুধু বিজ্ঞাপনে ও সংবাদপত্রে। সাহিত্যের যে-বিভাগটিকে আমরা "গদ্য" নাম দিয়েছি তাতেও কবিতা আছে—মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা—নানা রকম ছন্দে তারা রচিত। আসলে গদ্য বলে কিছু নেই : আছে বর্ণমালা, আর নানা ধরনের কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া। যেখানে স্টাইলের দিকে প্রযত্ন, সেখানেই পদবিন্যাস।' স্তেফান মালার্মের এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ কোনো-একজন—সারা জগতের মধ্যে কোনো-এ ক জ ন কবিকে যদি দাঁড় করাতে হয়, তাহলে সেই কবি—মালার্মে নন, তাঁর শিষ্য পোল ভালেরিও নন—তর্কাতীতরূপে তিনি রবীন্দ্রনাথ। কেননা মালার্মে ও ভালেরির গদ্য তাঁদের কবিতার মতোই সাংকেতিক,

গদ্যরচনার বিষয়গুলিও ‘বিশুদ্ধ’ ও নির্ভার— বলতে গেলে তাঁদের কবিতা ছাড়া বিষয় নেই, আর কবিতার বিষয়ে কবির মতো লিখতে গেলে অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক প্রতিবন্ধক অল্পই থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন সাধারণ ভাষায়, অনেক সময় নিরুৎসাহজনক সাংসারিক বিষয় নিয়ে (সমবায়নীতি বিষয়েও তাঁর প্রবন্ধ আছে), গদ্যকে কবিতার স্তরে উন্নীত করার সচেতন চেষ্টা বার্ধক্যের আগে তাঁকে করতে দেখি না। অথচ, যেহেতু স্টাইল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, ছন্দ তাঁর মজ্জাগত, তাই তাঁর সমগ্র গদ্যের মধ্যে এমন লেখা আপেক্ষিক অর্থে অল্পই (কিছু নেই তা নয়), যা প্রতিধ্বনি তোলে না, রেশ রেখে যায় না, স্পন্দিত হয় না স্মরণে, দেয় না সেই অপার্থিব অনুভূতি আমরা যার নাম দিয়েছি আনন্দ। এমনি করে তাঁর গদ্যের ভিতরে কবিতাকে পাচ্ছি—‘মাঝে-মাঝে খুব ভালো কবিতা, কোনোটি শিথিল, কোনোটি সংহত, কোনোটি বা একটু বেশি ছড়িয়ে-যাওয়া।’

২

‘নিবন্ধমালা’র এই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে পাঁচ অংশে ভাগ করা হয়েছে : ‘আত্মপরিচয়’, ‘পত্রধারা’, ‘ভ্রমণ’, ‘ভাষা ও সাহিত্য’ ও ‘বিচিত্র’। অংশের শিরোনামা থেকেই তার অন্তর্ভূত রচনাগুলির প্রকৃতি অনুমান করে নেয়া যাবে ; শুধু ‘বিচিত্র’ অংশ বিষয়ে একটু বলা দরকার। এই বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যবহার করেছিলেন—তাঁর ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় ; তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা সেই সব রচনাকে ‘বিচিত্র’ বলে অভিহিত করছি, যেগুলোকে অন্য কোনো বিভাগের মধ্যে সঠিকভাবে ফেলা যায় না। আমরা বলতে চাচ্ছি, এই অংশের রচনাগুলিতে রচনাটাই প্রধান, বিষয়টা উপলক্ষ মাত্র ; যে-কোনো একটি প্রসঙ্গ অবলম্বন করে লেখক বিস্তার করে দিলেন তাঁর ভাবনা ও কল্পনা, তাঁর মূল্যবোধ ও পক্ষপাত। এই ধরনের রচনার জন্য আধুনিক বাংলা ভাষায় একটি নতুন নাম উদ্ভাবিত হয়েছে—‘রম্যরচনা’ : ফরাশি বেল্ লেৎর্-এর অনুকরণ এটি ; কেউ-কেউ বলে থাকেন—বা আগে বলতেন—‘ব্যক্তিগত প্রবন্ধ’। নতুন নামকরণের বিপদ এই যে তা অযোগ্যকে আকর্ষণ করে, ‘রম্যরচনা’কেও— বাংলা ভাষায় তার সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাব দিয়ে বিচার করলে—অক্ষমের আশ্রয়স্থল বলার ইচ্ছে হলে অন্যায় হয় না। যাঁরা কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস কিছুই লিখতে পারেন না, এবং সত্যিকার সাংবাদিক পর্যন্ত নন, যাঁদের না আছে তথ্য বা জ্ঞান, না উদ্ভাবনশক্তি বা কলানৈপুণ্য, সংগতিরক্ষা করে কোনো বিষয়ে এক দণ্ড চিন্তা করতে, বা পরস্পর দুটো বাক্য রচনা করতে যাঁরা স্বভাবত অক্ষম, তাঁদের বিশৃঙ্খল প্রগল্‌ভতা ছাপার অক্ষরে উদ্ধত হয়ে উঠতে পারতো না, যদি না ‘রম্যরচনা’ শব্দটির সৃষ্টি হতো। কিন্তু যেহেতু

বহু নিকৃষ্ট রচনা প্রশ্রয় পাচ্ছে সেহেতু আমরা বলতে পারি না যে ঐ শব্দই পরিত্যাজ্য, বা গদ্যরচনার ঐ বিশেষ রূপটির অস্তিত্ব নেই। 'কবিতা' নামে প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই কবিতা নয় এটা যদি মেনে নিতে পারি তাহলে, অধিকাংশ 'রম্যরচনা' যদি রম্য না হয়, বা রচনাও না হয়, তাহলে অত্যন্ত বেশি বিচলিত হলে চলবে কেন ? নতুন নামকরণের পারিভাষিক ঔচিত্য নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, কিন্তু নতুন নামকরণের প্রয়োজন নেই বললে ভুল করা হয়। য়োরোপীয় ভাষায় 'essay' বলতে বিশেষ এক প্রকার সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনাকেই বোঝায়, কিন্তু আমাদের 'প্রবন্ধ' (সংস্কৃতে যার অর্থ ছিলো পদ্যে বা গদ্যে যে-কোনো রচনা) শব্দের অর্থ এত বেশি ব্যাপক যে এক-এক সময় তাকে সীমিত করে না-নিলে ঠিক কাজ চলে না। 'নাতিদীর্ঘ সাহিত্যগুণসম্পন্ন গদ্য রচনা' অর্থে 'essay' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মিশেল মঁতেন—সাহিত্যের এই রূপটিও তাঁরই আবিষ্কার ; পরবর্তী চারশো বছরে উদ্ভূত অন্য বহু উদাহরণের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আজকের দিনের পশ্চিমী পাঠকরা 'essay' শব্দটি দেখলেই বুঝতে পারেন কী-ধরনের রচনা পরিবেশিত হচ্ছে। যদি কোনো জীববিজ্ঞানী সর্বাশী প্রাণীদের পাকস্থলী বিষয়ে কোনো গবেষণা প্রকাশ করেন, বা কোনো ধর্মবিদ প্রণয়ন করেন খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের এক নতুন ব্যাখ্যা, বা কোনো ইতিহাসের অধ্যাপক রুশ বিপ্লবে লেনিন ও ট্রটস্কির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা করেন—এর কোনোটিকেই কোনো পশ্চিমী পাঠক 'essay' বলবেন না ; ও-সব জ্ঞানগর্ভ, বিধিবদ্ধ ও উদ্দেশ্যনির্ভর রচনার জন্য 'monograph', 'dissertation', 'tract', 'treatise' প্রভৃতি অন্য বহু শব্দের প্রচলন আছে। কিন্তু আমাদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত'ও প্রবন্ধের বই, বঙ্কিমের 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'ও তা-ই, আর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বিধবাবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব'কেও, অন্য কোনো নামের অভাবে 'প্রবন্ধ' না-বলে উপায় নেই। অস্বীকার করা যায় না আরো দু-একটা ব্যবহারযোগ্য শব্দ হলে ভালো হয়।

যা দেখতে-শুনতে প্রবন্ধের মতো, এ-রকম গদ্যরচনার মধ্যে দুটো স্পষ্ট ভাগ দেখা যাচ্ছে : তার একটাতে বিষয় হলো সর্বস্ব বা মুখ্য, লেখক সেখানে নতুন জ্ঞান দিতে চাচ্ছেন, বা নতুন মত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায়। এ-সব রচনার সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির একান্ত নির্দেশক হলো বক্তব্য ; প্রতিপাদ্য প্রমাণ করার জন্য যে-ক'টি যুক্তি ও উদাহরণের প্রয়োজন, লেখক তা পূর্বেই সংগ্রহ করে নিয়েছেন—'লেখক' হিশেবে তাঁর সমস্যা শুধু সেই উপাদানগুলিকে ভাষার মধ্যে সংবদ্ধ করা ;—ভাষা তাঁর কাছে বাহনমাত্র, অপরিহার্য যন্ত্র একটি — বলতে গেলে তাঁর উপাদানসমূহের শৃঙ্খলাসাধনই তাঁর রচনা। আর অন্যটিতে বিষয়টা গৌণ ; লেখক রচনাকর্ম শুরু করার আগে—তাঁর বাঁচা, মেলামেশা সাধারণ পড়াশুনোর বাইরে—কোনো 'গবেষণা' করেননি ; কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা

বা সমাজের পক্ষে হিতকারী কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও লিখতে বসেননি তিনি ; লিখতে-লিখতে ভাবনা আসে তাঁর, নিজেকে অনুসরণ করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যান ; তাঁর সূচনা, মধ্যভাগ ও সমাপ্তির পিছনে থাকে—'বক্তব্য'কে উপস্থিত করার গরজ নয়, সেই সব অমোঘ ও অলক্ষ্য বিধান, যা কোনো কবিতা, নাটক বা উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁর ভাষায় থাকে রূপ, ছন্দ ও স্বাদুতা, পাঠকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সৌজন্য, আসক্তি, হাস্যরসবোধ, জগতের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে থাকে সংরাগ ও দূরকল্পনা। শিরোনামায় যে-'বিষয়ে'র উল্লেখ থাকে তা নিয়ে যতটা বলেন, হয়তো ততটাই থাকে তাঁর নিজের কথা ; আমরা জানতে পারি কী-ভাবে এই জগৎ তাঁর চেতনার মধ্যে প্রবেশ করছে, কোথায় তাঁর প্রেম, কোন সংশয়ে তিনি দষ্ট, কোন গোপন বেদনাকে রচনার মধ্য দিয়ে পরিপাক করে নিচ্ছেন। অর্থাৎ, বিষয় যা-ই হোক না, তিনি ব্যক্ত করছেন নিজেকে (এই সূত্রটিও মঁতেনের), আর এই অর্থে তাঁর রচনা ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিনির্ভর, বলা যেতে পারে তাঁর ব্যক্তিতারই দর্পণ। মঁতেন নিষ্কুণ্ঠভাবে 'আমি' শব্দ ব্যবহার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'টিও 'আমি'র একটি বিনয়ী ও চতুর প্রকরণ ; এবং এই 'আমি'—গীতিকাব্যের বক্তার মতোই—দেশকালের বিশেষ লক্ষণদ্বারা চিহ্নিত হয়েও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। জীববিজ্ঞানী যখন সর্বাশী প্রাণীর পাকস্থলী বিষয়ে 'প্রবন্ধ' লেখেন তখন তাঁর ব্যক্তিত্বের একটিমাত্র অংশকে উদ্যোগী হতে হয়, কিন্তু অন্য যে-ধরনের প্রবন্ধের আমরা বর্ণনা করছি, তা লেখকের সমগ্র সত্তা থেকে নিঃসৃত ; শুধু বুদ্ধির বা চিত্তের নয়, সেটা প্রাণের ও অন্তঃকরণেরও কাজ ; যে-মানুষ তার শিশুকন্যার বিনোদের জন্য মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়, সর্দির ভয়ে সারা শীত স্নান করে না, অবসর পেলেই মহাভারত পড়ে, আলকাৎরার গন্ধ ভালোবাসে—সেই ইন্দ্রিয়বদ্ধ অসংগতিময় মানুষটিও তাতে সঞ্চারিত ও প্রতিফলিত হচ্ছে। যাকে বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি তা এই বিরাট জগতের একটি বিচ্ছিন্ন কণিকার উপর সংহত হয়ে থাকে, অন্য সব-কিছুর অস্তিত্ব সেখানে লুপ্ত ; নিরঞ্জন জ্ঞান সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। আমরা যাঁকে প্রবন্ধকার বলছি, তিনি এই বিচ্ছেদপ্রবণ ঐকান্তিক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত। জগৎটা তার বিচিত্র উপাদান নিয়ে তাঁর চৈতন্যের উপর অনবরত আঘাত করছে ; সুখেদুঃখে আকাঙ্ক্ষায় স্পন্দমান রক্তমাংসের মানুষকে তিনি কখনো ভোলেন না ;—আর তাই তাঁর রচনা হয়ে ওঠে—সত্য নয়, জীবন্ত, শিক্ষণীয় নয়, নন্দনজনক ; তাতে থাকে না কোনো অমোঘ যুক্তি, কোনো ধ্রুব মীমাংসা, নিশ্চিতভাবে কিছুই বলেন না তিনি ; কিন্তু এমন কতগুলো ইঙ্গিত বিকীর্ণ করে দেন যা সহৃদয় পাঠকের মনে বীজের মতো উড়ে এসে পড়ে —হয়তো ছড়িয়ে দেয় শিকড়, হয়তো কোনোদিন সেখানেও এক নতুন ভাবনাকে ফলিয়ে তোলে। বিজ্ঞানীর মতো কোনো প্রস্তুত সত্য তিনি আস্ত তুলে দেন না আমাদের হাতে—দিতে পারেন না ;

তিনি পাঠককে তাঁর সহকারী করে নেন ; যা তিনি আভাসে বলেন, উপমায় বলেন, বলেন গুঞ্জরণে ও বর্ণহিল্লোলে, তাঁর 'অর্থ' পূর্ণতা পায় পাঠকের মনে—যদি পাঠক অযোগ্য না হন।

অতিরঞ্জন হচ্ছে কি ? বড্ড বেশি দাবি করা হচ্ছে ? কিন্তু আমি তো কোনো আদর্শ স্থাপন করছি না, রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করছি। এই প্রবন্ধ—বা প্রবন্ধের এই বিশেষ ধরন—য়োরোপে মঁতেন যার স্রষ্টা—আমাদের সাহিত্যে তার মহাশিল্পী হলেন রবীন্দ্রনাথ। এতে সিদ্ধিলাভের পক্ষে যে-সব গুণ প্রয়োজনীয় বা কাঙ্ক্ষণীয় মনে হতে পারে, তাঁর প্রতিভায় সেগুলোর সন্নিপাত ঘটেছিলো। শুধু 'বিচিত্র' নামধারী অংশ নয়, এই গ্রন্থের সব রচনাই পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন, সবই সৃষ্টিশীল সাহিত্য ; তাদের মূল্য রচনার মধ্যেই, আধেয়বস্তুতে নয় ;—এমনকি তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মধ্যে যেগুলি কালপ্রভাবে মলিন হয়ে যায়নি, সেগুলোতেও এই একই লক্ষণ বিদ্যমান। কেননা রবীন্দ্রনাথ সেই লেখক, যাঁর পক্ষে যে-কোনো সময়ে শিল্পী না-হওয়া দুঃসাধ্য ছিলো, যাঁর কোনো-কোনো প্রবন্ধগ্রন্থে (যেমন 'ছন্দ', 'বাংলাভাষা-পরিচয়') আমরা পাই গবেষণা ও নন্দনধর্মিতার সমন্বয়, বিশ্লেষণদক্ষতার সঙ্গেই কবিতার উদ্বোধনীশক্তি। সাহিত্যের নিয়ম ও সংজ্ঞার্থগুলিকে তিনি সাবলীলভাবে অতিক্রম করে যান : তাঁর আত্মজীবনী, ভ্রমণপঞ্জি ও চিঠিপত্রে আশানুরূপ তথ্য পাই না আমরা ; পাই না সমালোচনায় যথাযোগ্য তত্ত্বকথা। পক্ষান্তরে সমালোচনার মধ্যে আত্মজীবনীর অবতারণা করতে বাধে না তাঁর, ভ্রমণপঞ্জিতে ভ্রমণ ভুলে গিয়ে জীবন, মৃত্যু ও শিল্পকলা বিষয়ে দূরকল্পনাকে প্রশ্রয় দেন। কোনো পাঠক ভুলেও যেন না ভাবেন যে তাঁর 'সমালোচনা'-চিহ্নিত বইগুলিতেই সাহিত্য বিষয়ে তাঁর সব বক্তব্য বিধৃত হয়ে আছে, বা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'র বাইরে আর কোথাও আত্মজীবনী নেই। সাহিত্য বিষয়ে তিনি কী ভেবেছেন তা সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে তাঁর চিঠিপত্র, আত্মজীবনী ও ভ্রমণপঞ্জিও পড়তে হবে, আর তাঁর জীবন বিষয়েও যথেষ্ট আমরা জানতে পাবো না, যদি-না তাঁর সমালোচনার প্রতি মনোযোগী হই। এই গ্রন্থের বিভাগগুলি করা হয়েছে সুবিধের জন্য বা নিয়মরক্ষার খাতিরে ; আসলে এই সব প্রবন্ধই পরস্পরসম্পৃক্ত।

৩

এবং তাঁর কবিতার সঙ্গেও এদের সম্বন্ধ নিবিড়। কবিতার বিষয়ে সাধারণভাবেই সত্য এই কথা, কিন্তু সব কবির কবিতা ও গদ্যরচনা একই ভাবে অন্বিত হয় না। যেমন রিলকের বিষয়ে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমরা বলতে পারি না যে তাঁর কবিতা হৃদয়ংগম করতে হলে তাঁর পত্রাবলির সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক। মালার্মে বা ভালেরির

মতো নন তিনি : ঘুরিয়ে, ফিরিয়ে, বেঁকিয়ে, পেঁচিয়ে, লুকিয়ে, ভুলিয়ে, ছলে, কৌশলে, সংকেতে, ফাঁদ পেতে—শিল্পকলার এমন একটি ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন না, যা তাঁর স্বীয় কবিতার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়। ইয়েটসের মতো আমাদের নিয়ে যান না তাঁর কবিতার অন্তঃপুরে ; কবিজীবনের বিবৃতিরূপে 'জীবনস্মৃতি' নিঃসন্দেহে নৈরাশ্যজনক। রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন তা পুনরুক্তি ; একই কথা পদ্যে ও গদ্যে বলেছিলেন ; পরস্পরের পরিপূরক শুধু নয়, তাঁর কবিতা ও গদ্য এক-এক সময় প্রায় বিনিময়ধর্মী। পাছে যাঁরা আধুনিক কবিতায় দীক্ষিত, একথা শুনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা কমে যায়, তাই এখানে উল্লেখ করি যে শার্ল বোদলেয়ার—আধুনিক কবিতার আদি উৎস যিনি—তাঁর গদ্যেও তাঁর কবিতার প্রতিধ্বনি বিরল নয় ; প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার স্তবকসুদ্ধ রচনা করে দেন তিনি, ছিটিয়ে দেন কবিতার ভাণ্ডার থেকে আহৃত চিত্রকল্প, শব্দবন্ধ ও অলংকার, কখনো-কখনো একই উপাদান থেকে রচনা করেন তাঁর কবিতা ও সমালোচনা। দুই কবিতে প্রভেদ এইখানে—আর এই প্রভেদ তাৎপর্যময়—যে একই কথা রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বলেছেন কম কথায় আর কবিতায় কলোচ্ছ্বাসে, আর বোদলেয়ার গদ্য লেখেন সবিস্তারে, কিন্তু কবিতায় তিনি কঠিনরূপে সংহত। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ দুটিমাত্র অনুচ্ছেদে যা বলেছিলেন, 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ তারই ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ ; কিন্তু বোদলেয়ারের শিল্পবিষয়ক প্রচুর সমালোচনার নির্যাস তাঁর "আলোকস্তম্ভ" ('Les Phares') কবিতার এগারোটি চতুষ্পদীতে বিধৃত আছে। বোদলেয়ারের গদ্য যেন তাঁর ছুটির ঘণ্টা—এই রকম মনে হয় আমাদের : ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের ক্ষমাহীন শর্তপূরণের পরে, চতুর্দশপদীর ব্যূহের মধ্যে আদর্শকে সংবদ্ধ করার অরুন্তুদ প্রয়াসের পরে, গদ্যে যেন নিজেকে নিষ্কৃতি দেন তিনি ; সেটা তাঁর বিনোদ ও বিচরণের ক্ষেত্র, কৌতুকের মণ্ডপ এবং বিচারবুদ্ধির মৃগয়াভূমি ; অর্থাৎ, তাঁর ব্যক্তিত্বের যে-অংশ সামাজিক, রসিক ও তত্ত্বদর্শী, যা তাঁর কবিতায় প্রচ্ছন্ন থেকে কবিতাকে মেঘচ্ছুরিত রৌদ্রের মতো রঞ্জিত করে তুলেছে, তার স্বাধীন ক্রীড়া গদ্যপ্রবন্ধে তাঁর অনুমত ছিলো। বোদলেয়ারের গদ্য যত ভালোই হোক, তাঁর কবিতার বিকল্প বা সমকক্ষ হবার দাবি তা করে না ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে সংবৃত করার চেষ্টা করেননি বলে, কখনো-কখনো তাঁর কবিতা ও গদ্যের পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে শুধুমাত্র পদ্যছন্দের ব্যবহার অথবা পঙক্তিবিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতির দ্বারা। 'পূরবী' থেকে 'জন্মদিনে', এই পর্যায়ের মধ্যে বহু কবিতা আমরা খুঁজে পাই, যা গদ্যে একই প্রকার বা অধিকতর মনোরম করে রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারতেন বা লিখেই গিয়েছেন ; 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র অনেক অংশকে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ছন্দে-মিলে রূপায়িত করেছেন তিনি, 'শেষের কবিতা'র গদ্যশিল্প অনেক স্থলে কবিতাকে ম্লান করে দিচ্ছে ; গদ্যকবিতা "বাসা"

একখানা পত্রের সংস্কারসাধন ; এবং পরবর্তী পত্রাবলিতে এমন কোনো-কোনো চমকপ্রদ বাক্য আমরা পাই, বা পলাতক ক্ষণকালীন ভাবচ্ছায়া, যাকে কাব্যরূপ দিতে গিয়ে তাঁকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিতা ও সমুদয় গদ্য পাশাপাশি রেখে চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে তাঁর কবিতা ও গদ্যের বিবর্তন সমান্তর নয় ; তাঁর হাতে গদ্য যে-ভাবে বারে-বারে পরিবর্তিত হয়েছে, কবিতা সে-রকম হয়নি ; কবিতায় তিনি যেন প্রকৃতির হাতে অভিষিক্ত এক সম্রাট, পদ্যাকারে যা-কিছু লিখবেন তা-ই কবিতা হবে, বা তা না-হলেও অন্ততপক্ষে উপাদেয় হবে, এই রকম একটা বিধান তিনি নিজেও প্রায় মেনে নিয়েছিলেন ; কিন্তু গদ্যে তিনি অনেক বেশি সচেতন শিল্পী, নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করতে অনবরত সচেষ্ট।

এমনি করেই বাংলা সাহিত্যে এই অঘটন ঘটলো যে আমাদের ভাষার যিনি কবিগুরু, এবং যাঁর সমকক্ষ কবি আবহমান ভারতে আর নেই, তিনিই আমাদের গদ্যরীতির স্রষ্টা। 'স্রষ্টা' কথাটিতে ঐতিহাসিক দিক থেকে আপত্তি হতে পারে। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি ভুলে যাচ্ছি না ; আমি বলতে চাচ্ছি যে বঙ্কিম থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বাংলা গদ্য যে-ভাবে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে, এবং আজকের দিনে আধুনিক বাংলা ভাষা বলতে যা বোঝায়, তার সাক্ষ্য প্রমাণ ও উদাহরণের প্রধান ভাণ্ডার রবীন্দ্রনাথ। 'বৌ-ঠাকুরানীর হাট' থেকে 'শেষের কবিতা' বা 'বিচিত্র প্রবন্ধ' থেকে 'ছেলেবেলা' এই গ্রন্থপর্যায় বাংলা গদ্যের ইতিহাসকে ধারণ করে আছে ; বঙ্কিমী ও বীরবলী গদ্য, 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা, ঘরোয়া, বৈঠকি ও দরবারি রীতি, প্রাচীন, আধুনিক ও আধুনিকতর শৈলী : এই তাঁর পঞ্চাশ বছরের কৃতিকে বাংলা গদ্যের অণুবিশ্ব বলতে পারি আমরা, হয়তো মহাবিশ্ব বললেও ভুল হবে না। এর মধ্যে সবই আছে : ভারী, হালকা, গম্ভীর, চপল, সংস্কৃত ও দেশজ, সমতল ও বন্ধুর ; অত্যুক্তি, বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি ; আছে বহু মিশ্র রাগিণী ; সাত্ত্বিক মিতাচারের পাশে বিলাসীর উচ্ছ্বাস, সামাজিক সৌজন্যের পাশে ঐশ্বর্যের আত্মবিকিরণ। 'জীবনস্মৃতি'র পরিমিত, যথোচিত, প্রাঞ্জল ও প্রসন্ন গদ্য যাঁর রচনা, তাঁকে আমরা আঠারো-শতকী ইংরেজি অর্থে 'ভদ্রলোক' বলতে পারি ; কিন্তু তার পরে হঠাৎ 'ঘরে-বাইরে' খুললে অলংকরণের আতিশয্যে আমাদের প্রায় দম আটকে আসে ; মনে হয়, কালিদাসের ভাষা যদি বাংলা গদ্য হতো তাহলে তিনি যে-কাব্য লিখতেন, এ যেন তা-ই। আবার 'লিপিকা'য় আমরা জাদুকরের এক উল্টো খেলা দেখতে পাচ্ছি ; 'ঘরে-বাইরে'র প্রায় সমকালীন এই গদ্যকে বলতে ইচ্ছে করে মহনীয় অর্থে 'মেয়েলি' : যেন ললনাকুলের মৌখিক ভাষার গ্রাম্যতাদোষ নিষ্কাশিত করে রবীন্দ্রনাথ ছেঁকে নিয়েছেন তার ঋজুতা, লাবণ্য ও সারল্য ; যা নিতান্ত প্রাকৃত, তারই উন্নয়নজনিত এই সম্মোহন পূর্ববর্তী 'ডাকঘরে'ও তিনি ঘটিয়েছিলেন।

শুধু তাঁর লেখা পড়ে বাংলা গদ্যের সবগুলি সবীজ ধারাকে আমরা জানতে পারি, এবং ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কারণে অন্য কোনো বাঙালি লেখক সম্বন্ধে এ-কথা বলা যায় না। আমাদের গদ্যের অবিকল দর্পণরূপে তাকে স্বীকার না-করে আমাদের উপায় নেই।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের অনুকরণ করেছেন, মধ্যবয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করে, এবং এ-দুজন ছাড়া তাঁর সমকালীন বা পূর্বসূরির মধ্যে আর-কেউ নেই, যাঁর সঙ্গে গদ্যশিল্পের দিক থেকে তাঁর তুলনা সম্ভব। সেইজন্য, যদি আমরা অন্বেষণ করি তাঁর 'বঙ্কিমী' গদ্য কোথায় বঙ্কিম থেকে সরে এসেছে, আর তাঁর 'সবুজপত্র' যুগের রচনাই বা কোনদিক থেকে অ-প্রামথিক, তাহলে হয়তো ধরা পড়বে তাঁকে বাংলা গদ্যের স্রষ্টা বলার সংগত কারণ আছে কিনা। সেই পার্থক্যটি, আমার মনে হয়, এই। বাংলা গদ্যে রমণীয়তা বঙ্কিমের দান, তাঁর আগে ঐ গুণটি দেখা দেয়নি এবং তাঁর উপন্যাস ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধ রমণীয় গদ্যে রচিত বলেই আজ পর্যন্ত অম্লান। কিন্তু এই রমণীয়তা পদ্যের অধমর্ণ। অর্থাৎ বঙ্কিমের গদ্যে মাঝে-মাঝেই পদ্যছন্দের বোল শোনা যায়, পদ্যের ধ্রুবপদের মতোই তাতে অনুলাপী অংশ অবিরল, তাঁর কোনো-কোনো বাক্য প্রায় পয়ারের পঙক্তি হতে পারে—অন্ততপক্ষে মধ্যখণ্ডনে তাদের উন্মুখতা স্পষ্ট, এবং আঠারো-শতকী ইংরেজি দশমাত্রার পদ্যের মতো উক্তি ও প্রত্যুক্তির দোটানার মধ্যে তাদের অবস্থান। তাঁর বাক্যগুলি ঋজু, শিক্ষিত সৈন্যদলের মতো তারা তালে-তালে পা ফেলে চলে, তাদের শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য যুক্তিনির্ভর, অভিপ্রায়ের ঐক্যের দ্বারা সংবদ্ধ। এবং, সমগ্রভাবে দেখতে গেলে, প্রমথ চৌধুরীর চরিত্রলক্ষণও এই : বাক্যবন্ধের এই ঋজুতা, এই যুক্তিনির্ভর বাগনুক্রম। 'সাধু' ও 'চলিত' ভাষা-সম্পৃক্ত বাদানুবাদের ফলে এই সাদৃশ্যটি আমরা বহুদিন পর্যন্ত লক্ষ করিনি ; কিন্তু আজকের দিনে, যখন ঐ গৃহযুদ্ধ অবসিত হয়েছে, তখন 'লোকরহস্য' বা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র পরে 'হালখাতা' বা 'নানাচর্চা' পড়লে সহজেই ধরা পড়ে যে এই দু-জনের গদ্যের চলন একই ধরনের, গঠনেও উল্লেখযোগ্য তফাৎ নেই। কিন্তু এদের পরে রবীন্দ্রনাথ খুললে তৎক্ষণাৎ এক ভিন্ন সুর ধ্বনিত হয় ; আমরা অনুভব করি আর-একটি গুণ, যাকে দীপ্তি বা শৃঙ্খলা বা রমণীয়তা বললে যথেষ্ট হয় না, যাকে বলতে হয় প্রবাহ বা প্রবহমানতা—যা রবীন্দ্রপূর্ব গদ্যে নেই, তাঁর পরবর্তী সব গদ্যেও লক্ষণীয় নয়।

বঙ্কিমে, বা পূর্বসূরি বিদ্যাসাগরেও, গতি আছে ; কিন্তু যাকে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবাহ বলছি তা ভিন্ন প্রকৃতির ; এবং এই প্রভেদের আকার খুব বড়ো না-হলেও প্রকরণে তা দূরস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যেটি কল্প বা ইউনিট সেটি বাক্য নয়, অনুচ্ছেদ ; একসঙ্গে এক-একটি অনুচ্ছেদে তিনি চিন্তা করেন এবং অনুচ্ছেদগুলির যোগফলের চাইতে তাঁর সমগ্র রচনাটিকে বড়ো বলে মনে হয়। বাক্যের সঙ্গে বাক্যের, অনুচ্ছেদের

সঙ্গে অনুচ্ছেদের সম্বন্ধের জন্য ব্যাকরণের বা যুক্তির যোগই যথেষ্ট এবং তার দ্বারাও উৎকৃষ্ট গদ্য সম্ভব হয়ে থাকে ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেই যোগসূত্রটি এমন এক রহস্যময় প্রাণস্পন্দন, যাকে আমরা অবশেষে ভাষার ধ্বনিস্পন্দন বলেই চিনতে পারি। তাঁর বাক্যপর্যায় শুধু সান্নিধ্যগুণে প্রতিবাসী নয়, একটি অবিচ্ছেদী ধারাবাহিকতায় অন্যোন্যশ্লিষ্ট ; তারা একে অন্যের অনুসরণমাত্র করে না, গড়িয়ে-গড়িয়ে পরস্পরকে যেন স্পর্শ করে থাকে ; জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো তারা নমনীয়, তারা লীলা জানে, ব্যত্যয় ঘটাতে ভয় করে না, মানসাম্য ভেঙে দিয়ে আশাতীতকে সম্ভব করে তোলে। তাঁর একই রচনার মধ্যে নিঃসংকোচে পাশাপাশি স্থান করে নেয় ক্ষুদ্র ও সরল এবং জটিল ও দীর্ঘায়িত বাক্যবিন্যাস ; তাঁর দুটি প্রতিবেশী বাক্য একই ভাবে আরম্ভ বা শেষ হয় না ; স্বরান্ত ও হলন্ত শব্দের সন্নিবেশে তিনি যেন অচেতনভাবেই ব্যবধান রক্ষা করে চলেন, একই স্বরের পৌনঃপুনিকতা সহ্য করেন না ; দ্রুতি, বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের সাধনায় স্বীকার কবে নেন ইংরেজি ধরনের অন্বয়—যা তাঁর আগে বঙ্কিম ও বিদ্যাসাগরও করেছেন, কিন্তু পার্শ্বোক্তি, সর্বনাম ও ব্যুৎক্রমের ব্যবহারজনিত যার পূর্ণ রূপটি রবীন্দ্রনাথের আগে প্রতিভাত হয়নি, যদিও সমালোচকেরা তাঁকে ভুলে গিয়ে কখনো-কখনো এমনও বলেছেন যে কতিপয় অযোগ্য আধুনিক লেখকই বাংলা গদ্যে ইংরেজি রীতির প্রবর্তক। কিন্তু ইংরেজি তো আর নেই, সেটাই বিশুদ্ধ বাংলা হয়ে গেছে, কিংবা ধরনটাকে হয়তো ইংরেজি বলাই ভুল ; কেননা কমা-সেমিকোলনাদি বিরতিচিহ্ন বাংলা গদ্য যেদিন স্বীকার করে নিলে, সেদিনই বলে দেয়া যেতো যে, আপন প্রতিভার নির্বন্ধেই, সে বহুলাঙ্গ রূপকরণে অন্যান্য আধুনিক ভাষার প্রতিযোগী হয়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পরে এ-কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য যে এক-দাঁড়ি-দুই-দাঁড়ি-নির্ভর কৃত্তিবাসী পয়ারের সঙ্গে বাংলা গদ্যের কোনো সম্বন্ধ আছে, কিংবা 'খাঁটি বাংলা অন্বয়' নামক অন্য কোনো পদার্থ আর সম্ভবপর। বরং আমাদের এ-কথাই তর্কাতীত বলে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত নূতনত্বের যা উৎস ও আশ্রয়, তা বাঙালির মুখের ভাষার নিজস্ব মৌলিক ছন্দ ; যে-সুরে আমরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, যে-ভাবে আমাদের কণ্ঠস্বরের উত্থানপতন ঘটে থাকে—আমাদের আবেগ ও নৈরাশ্য, সংশয়, উত্তেজনা ও দীর্ঘশ্বাস এই সব-কিছুর এক আর্দশ ধ্বনিরূপের নামান্তর হলো রবীন্দ্রনাথের গদ্য। এবং এই যাকে ছন্দ বলছি তা পদ্যের নয়, গদ্যেরই ছন্দ, পারিভাষিক যাথার্থ্যের খাতিরে তাকে ছন্দস্পন্দ বলতে পারি ; তাতে পদ্যের বা গানের মতো তাল নেই, কিন্তু রাগসংগীতে আলাপের মতো লয় আছে ; রবীন্দ্রনাথের অসামান্য কৃতিত্ব এইখানে যে আজীবন কবির মতো গদ্য লিখেও—এমনকি গদ্যকবিতায়—পদ্যছন্দের প্রতিধ্বনিকে তিনি স্থান দেননি। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নির্ভুল বলেছেন যে তাঁর গদ্য 'মহাকবির গদ্য, সুতরাং কোথাও পদ্যগন্ধী নয়।' এই 'সুতরাং'টি অর্থময়।

৪

এই ছন্দোসিদ্ধির জন্যই রবীন্দ্রনাথের যুক্তি দুর্বল হলেও প্রবন্ধ ভেঙে পড়ে না, ঘটনাগত যাথার্থ্যের অভাবসত্ত্বেও উপন্যাস স্মরণীয় হয়, এবং নাটক অন্যান্য কারণে দুঃসহ বোধ হলেও উল্লেখযোগ্যতার মর্যাদা পায়। ব্যতিক্রম নেই তা নয়, 'নবীন', 'বাঁশরি' ও অংশত 'তিনসঙ্গী'র গদ্যকে কৃত্রিমতার পরাকাষ্ঠা বলতে আমি দ্বিধা করবো না ; বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দের উপর যাঁর স্বাভাবিক ঈশিত্ব ছিলো তিনি কেমন করে ও-সব গ্রন্থ প্রণয়ন করতে পারলেন তা উত্তরপুরুষের সমস্যা হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের যে-একটি লক্ষণ আমাদের অন্তহীনভাবে বিস্মিত করে রেখেছে তা তাঁর আপতিক স্বতঃস্ফূর্তি, ক্লান্ত মুহূর্তে তিনি বরং নিজের অনুকরণ করেছেন, কিন্তু চেষ্টাকৃত নূতনত্ব ঘটাতে চাননি ; আর সেইজন্যই 'বাঁশরি' বা 'তিনসঙ্গী'কে অমন চরিত্রচ্যুত মনে হয়, তাতে পদে-পদে পাঠককে চমকে দেবার যে-প্রয়াস আছে তা ক্লিষ্ট ও ক্লেশকর বলেই গভীরতম অর্থে অ-রাবীন্দ্রিক। অথচ প্রায় একই সময়ে রচিত 'বিশ্বপরিচয়' ও 'ছেলেবেলা'তে গদ্যভঙ্গির একই প্রকার নূতনত্ব থাকলেও কৃত্রিমতার নিপীড়ন নেই ; তার কারণ আমার এই মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের সদ্যতন ভাষা ব্যবহার করলে মানিয়ে যায়, কিন্তু গল্প-নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখে তা অবিশ্বাস্য। কাল্পনিক চরিত্রের মুখে চরিত্রশোভন ভাষা বসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়েছেন, নাটকরচনায় এইটেই তাঁর বিঘ্ন ছিলো ; 'ডাকঘরে'র ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তা প্রকট হয়নি, কিন্তু 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত যেখানেই আছে জনতা বা প্রাকৃতজন সেখানেই তাদের কথা শুনে আমাদের সন্দেহ হয় যে এদের কোনো নিজস্ব সত্তা নেই, এরা কর্তার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সবচেয়ে প্রামাণিক ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে, যখন তিনি নিজের জবানিতে কথা বলতে পারেন ; তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে অবশ্যমান্য তাঁর 'গল্পগুচ্ছ', তাঁর উপন্যাসের বর্ণনার অংশ, এবং তাঁর প্রবন্ধপর্যায়, চিঠিপত্র ও আত্মজৈবনিক রচনাবলি। অন্তত এগুলো থেকে বাছাই করে নিলে আমরা গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃষ্ট পরিচয় পেতে পারি।

প্রবন্ধরচনার একটি গতানুগতিক পদ্ধতির সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি : মাস্টারমশাই ছাত্রকে বলেন, অমুক-অমুক পুস্তক পাঠ করে এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে আনো ; এবং ছাত্র যদি প্রমাণ করতে পারে যে উল্লিখিত বই ক-টি সে পড়েছে, পড়ে অন্তত অংশত বুঝেছে, এবং সেই বোধটুকু তার 'স্বীয় ভাষা'য় প্রকাশ করতেও অপারগ হয়নি, তাহলেই সে পয়লানম্বরি ছাত্র বলে গণ্য হলো। আমরা ধরে নিতে পারি যে উত্তরজীবনে নিজে

অধ্যাপক হয়ে সে এই পদ্ধতির ব্যাপকতর ব্যবহার করবে, শতাধিক পুস্তক অধ্যয়ন করে রচনা করবে নূতন গ্রন্থ, তার অধ্যবসায়ের ফলে কোনো একটি সীমিত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হবে। সম্ভবত সেই বিষয়টি হবে অসামান্য, অর্থাৎ সাধারণ সাহিত্যলিপ্সুর পক্ষে মনোজ্ঞ নয়, কিন্তু বিশেষজ্ঞের আদরণীয়। এ-ধরনের পুস্তক তার নিজের ক্ষেত্রে মূল্যবান, কিন্তু ততদিনই মূল্যবান যতদিন সেই বিশেষ বিষয়টিতে নূতনতর জ্ঞান সংকলিত না হয়। কিন্তু প্রবন্ধরচনার অন্য একটি উপায় আছে, সেই উপায় প্রতিভাবানের। কোনো-এক শুভ মুহূর্তে লেখক তাঁর স্বজ্ঞার দ্বারা অকস্মাৎ একটি সত্যকে অনুভব করেন—সেটা 'সত্য' কিনা তাও সঠিকভাবে বলা যায় না, শুধু এটুকু বলা যায় যে তাঁর অনুভূতিটা সত্য। সেইটিকে প্রকাশ করার জন্য যে-সব তথ্য, যুক্তি ও উদাহরণ তিনি উপস্থিত করেন, সেগুলিও নির্ধারিত বা সুচিন্তিতভাবে আহরিত নয়, তাঁর উৎসাহের তাপে যা-কিছু মনে পড়ে যায় প্রায় তা-ই তিনি গ্রহণ করে থাকেন। এই ধরনের প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে যুক্তি অথবা তথ্যে ভ্রান্তি ধরা পড়লেও রচনাটি অনাহত থাকে, কেননা তাদের মৌলিক অনুভূতিটি প্রমাণনির্ভর নয়, সংক্রামক, অতএব চিরকালই মূল্যবান। উদাহরণত, রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করতে পারি ; আজকের দিনে তার প্রতিটি তথ্য যদি পণ্ডিতেরা বাতিল করে দেন তবু সেটিকে বর্জন করতে পারবো না আমরা, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আমাদের মুগ্ধ করে রাখবে। এবং এই দৃষ্টি এ-অর্থে সত্য যে কোনো-এক সময়ে কোনো-এক পুরুষ তার প্রভাবে ভারতের একটি সমগ্র রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। যেখানে উপলব্ধি আছে সেখানে আমরা তর্ক করতে ভুলে যাই।

এই ধরনের সমালোচনাকে বিম্বধর্মী বা ইম্প্রেশনিস্টিক আখ্যা দিয়ে অনেকে এর মর্যাদালাঘবের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোলা উচিত : বিম্বটি কার মনে প্রতিভাত হচ্ছে ? যদি হন কোনো সমকালীন সাপ্তাহিকের লেখক, যিনি পাঠকের সঙ্গে পাঁচ মিনিট গালগল্প করে প্রসঙ্গত জানিয়ে দিতে ভোলেন না যে কোনো-একটি বই পড়ে তাঁর 'কেমন লাগলো', তাহলে এ-বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু যদি তিনি হন কোনো আলাপচারী স্যামুয়েল জনসন, বা বৃদ্ধ গ্যেটে, বা সদ্যযুবক জন কীটস, বা বোদলেয়ার অথবা টোমাস মান্—কিংবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাহলে এই তথাকথিত বিম্বকে আর অশ্রদ্ধা করার উপায় থাকে না ; আমরা দেখতে পাই যে কোনো-একটি ভাব, তাঁদের মনে বিম্বিত হয়েছে বলেই, ব্যঞ্জনায় গাঢ় হয়ে উঠেছে ; এঁদের একটি অসতর্ক মুহূর্তের মুখের কথা, বা দ্রুতরচিত পত্রের কোনো উক্তি—কখনো-কখনো তাও যেন অর্থে ও ইঙ্গিতে সসত্ত্ব। এর পরে আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানতেই হয় যে ভগবানের রাজ্যে সুবিচার বলে কিছু নেই ; যে প্রতিভা

নামক রহস্যময় ব্যাপারটি অন্যায়ভাবে আমাদের উপর জিতে যায়— নির্দিষ্ট শাস্ত্রসমূহ না-পড়েও, বয়সে প্রায় নাবালক হয়েও, এমনকি আলোচ্য বিষয়টিতে অত্যল্প জ্ঞান নিয়েও—সাবলীলভাবে আমাদের উপর জিতে যায়। যাঁরা নিজেরা সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান লেখক তাঁরা সাহিত্য বা আনুষঙ্গিক বিষয়ে যা বলেন তার মূল্য স্বতঃসিদ্ধ বললে ভুল হয় না ; কেননা আমরা দেখতে পাই যে পণ্ডিতেরা যুগে-যুগে তাঁদের উক্তির ভাষ্য রচনা করেন, কিন্তু পণ্ডিতের গবেষণার সঙ্গে পরিচয়স্থাপন কবিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয় না।

কবি-সমালোচকের মন কী-ভাবে কাজ করে আমাদের ভাষায় তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রবন্ধে উপমার প্রাচুর্য দেখে কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি স্থানে-অস্থানে অকারণ 'কবিত্ব' করে থাকেন। কিন্তু 'কবিত্ব' করার অধিকার সকলের থাকে না, কারো-কারো থাকে—রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয়ই ছিলো। স্মর্তব্য, উপমা ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রায় অচল, উপনিষদ ও প্লেটো থেকে আরম্ভ করে ফ্রয়েড পর্যন্ত তার উদাহরণ অপর্যাপ্ত। পক্ষান্তরে বরং এটাই লক্ষণীয় যে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ রীতিমতো তাথ্যিক ভাষায় রচিত, যাকে গদ্যতম গদ্য বলা যায় তাও তিনি অনেক লিখেছেন ; বস্তুত, 'সবুজপত্রে'র আগে পর্যন্ত প্রবন্ধে বা কথাসাহিত্যে তাঁর কবিসত্তা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায়নি। অথচ তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের রচনায় আমরা একজন কবির উপস্থিতি অনুভব করি ; তার কারণ তাঁর মনের বিদ্যুদ্ধর্মিতা। যেন বিদ্যুতের উদ্ভাসের মতো তিনি মুহূর্তে তাঁর মূল চিন্তাটিকে আমাদের মনের সামনে উপস্থিত করেন : আলোচ্য বিষয় যা-ই হোক না, রাজনীতি বা ধর্ম, শিক্ষা বা ইতিহাস, তিনি তৎক্ষণাৎ বিষয়টির একেবারে মর্মস্থলে চলে যান ; পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁরা নতুন কোনো তথ্য না-পেলেও নতুন একটি দৃষ্টি লাভ করেন ; আর যাঁরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারেন না তাঁরা দেখতে পান যে তাঁদের স্বমতের সপক্ষে নতুন যুক্তি ঐ রচনা থেকেই আহরণ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই দ্রষ্টাদের অন্যতম যাঁরা বুঝিয়ে দেন যে আমরা যাকে 'মতামত' বলি সেটি সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী ; আসল কথা অন্তর্দৃষ্টি—সেই 'বিম্ব' বা বিম্বগ্রহণের সহজ ক্ষমতা, যা বিষয় ও বিষয়ীকে যুগপৎ উদ্ঘাটিত করে। যেহেতু রবীন্দ্রনাথ একজন অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক ব্যক্তি, তাই তিনি যে-কোনো বিষয়ে যা-কিছু বলেন প্রায় তাতেই আমাদের ঔৎসুক্য অনিবার্য।

এখানে বলা দরকার যে তাঁর সাহিত্য ও রসতত্ত্বের আলোচনায় আমরা প্রথম থেকেই একটি ভিন্ন সুর লক্ষ করি ; এখানে তাঁর কবিসত্তার কাজ বেশি, উপমা আরো প্রচুর, মীমাংসা আরো অনিশ্চিত এবং উপস্থাপনা—শাস্ত্রীয় আদর্শে দেখলে—সবচেয়ে কম তৃপ্তিকর। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ 'পঞ্চভূত' সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত

হতে পারি না এটি 'সমালোচনা' না কি 'বিচিত্র' বিভাগে অঙ্গীকারযোগ্য ; এদিকে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র নামেই যদিও 'বিচিত্র' আছে, তবু সেটিকে অনেকাংশে রসতত্ত্বের বিচার বললে ভুল হয় না— বিখ্যাত "কেকাধ্বনি" প্রবন্ধ তো রীতিমতো নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন। পরবর্তী গ্রন্থগুলিকে 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' এই ধরনের সুস্পষ্ট নাম দিয়ে তিনি পাঠক, সম্পাদক, ছাত্র ও অধ্যাপকের সুবিধে করে দিয়েছেন, কিন্তু এখানেও তাঁর লেখার ধরনে 'শোনো বলছি' ভাবটা নেই, নিজেকে সত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বলে ধরে নিয়ে পাঠককে শিক্ষিত করার ভঙ্গি নয় তাঁর ; যেমন 'পঞ্চভূতে', ভিন্ন-ভিন্ন 'চরিত্রে'র সাহায্যে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ উপস্থিত করেছিলেন, তেমনি এখানেও যেন নিজের সঙ্গে তর্ক করতে-করতে তাঁর যাত্রা ; একটু এগিয়ে, আর-একটু পেছিয়ে, মাঝে-মাঝে হুঁচট খেয়ে কখনো কোনো আকস্মিক ও উজ্জ্বল ভাবনার পশ্চাদ্ধাবন করে, কখনো বা দূরকল্পনার উৎসাহে আলোচ্য বিষয় বিস্মৃত হয়ে—এমনভাবে লেখেন যেন সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর আত্ম-পরীক্ষা ও স্বগতোক্তি। যেমন কবিতায়, তেমনি প্রবন্ধরচনায় অনেক সময় আচ্ছাদনের ব্যবহার উপকারী হয় ; সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলার থাকলে তার একটি প্রশস্ত উপায় হলো বিশেষ কোনো কবি অথবা গ্রন্থের সমীক্ষণ, সেই অবলম্বনটিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে লেখকের চিন্তা উন্মীল হতে পারে—এবং কবিরা সাধারণত এইভাবেই সমালোচনা লিখে থাকেন। রবীন্দ্রনাথেও এর উদাহরণের অভাব নেই, কিন্তু 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ও সর্বশেষ 'সাহিত্যের স্বরূপ'—এই তিনটি গ্রন্থে বিশুদ্ধরকম তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলোচনার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখি ; "সাহিত্যের তাৎপর্য", "সাহিত্যের সামগ্রী", "সৌন্দর্যবোধ", "সাহিত্যবিচার", "সাহিত্যধর্ম", "তথ্য ও সত্য"— এই সব শিরোনামা, মানতেই হবে, প্রথম দর্শনে তেমন উৎসাহজনক নয় ; আমাদের মনে হতে পারে যিনি 'সাহিত্য', 'সত্য' বা 'সৌন্দর্য' বিষয়ে তাঁর ধারণাটি বেশ স্পষ্ট কথায় বলে দিতে পারেন তিনি আর যা-ই হোন, কবি নন, এবং রবীন্দ্রনাথ কেমন করে এই বিমূর্ত বায়ুমার্গে বিচরণ করেছিলেন তা ভেবে আমাদের বিস্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। কিছুটা বেদনার সঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় যে ততদিনে এই কবি তাঁর দেশের প্রধান পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; যে-কোনো প্রশ্ন তাঁর সামনে উপস্থিত করতে লোকেরা যেমন আর সংকোচ করে না, তেমনি তাদের সন্তোষসাধনের চেষ্টাও তাঁর কর্তব্য-তালিকার অন্তর্ভূত ; এমনকি, 'কবিতা কাকে বলে' এই রকমের অসম্ভব প্রশ্ন উত্থাপিত হলেও তাঁর মৌন থাকার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, এমন সম্ভাবনাও স্বীকার্য যে জীবনের প্রধান সৃষ্টিশীল অধ্যায় উত্তীর্ণ হবার পর, এবং তার 'বিরুদ্ধে' একদল অর্বাচীনের কলরব শুনতে পেয়ে, তিনি তাঁর অচেতন সাহিত্যকর্মকে সচেতন স্তরে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, হয়তো তাঁর

সাহিত্যিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে নিজেরই কাছে একটা জবানবন্দি দেবার ইচ্ছে তাঁর হয়েছিলো। এই প্রচেষ্টা বিপজ্জনক, কেননা কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্যে কবি তাঁর কবিতাকে ধরাতে পারেন না ; তত্ত্বকে আঁটো করতে গেলে বস্তা ফেটে ধানের আঁটি বেরিয়ে পড়ে, আবার উদার হতে গেলে তা সর্বসাহিত্যের নির্বিশেষ আধার হয়ে যায়। এ-অবস্থায় কবিরা একমাত্র যা করতে পারেন রবীন্দ্রনাথও তা-ই করেছেন ; আরিস্টটল বা আলংকারিকদের মতো বিষয়টিকে মুখোমুখি আক্রমণ না-করে সেটিকে ঘিরে-ঘিরে কথা বলেছেন তিনি ; তাঁর রচনার মধ্যে প্রবেশ করেছে সংশয়, কৌতুক, পুনরুক্তি, অস্থিরতা ; কোনো-একটি উক্তি করে তখনই তাকে সীমিত, খণ্ডিত বা বিস্তারিত করেছেন ; কোনো প্রবন্ধ শেষ করামাত্র সেটিকে আর পর্যাপ্ত বলে মনে হয়নি—তারই জের টেনে, তার প্রতিবাদে ও সমর্থনে, আরো লিখতে হয়েছে। সেইজন্য তাঁর তত্ত্বালোচনা এমন সপ্রাণ ও ঊর্মিল, তাকে আমরা বলতে পারি একটি আন্দোলন ; 'অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে'—লেখকের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটি যেন এইরকম, তা না-হলে যে ফুল ফোটে না। এই 'ফুল' হলো রবীন্দ্রনাথের দু-একটি নিবিড় ও সহজাত অনুভূতি, তাঁর হৃদয়ের মধ্যে অনির্বচনীয়ের উদ্ভাস ; সেটি কোনো প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য নয় বলে উপমা, রূপক ও অলিধর্মী হিল্লোল ভিন্ন তার সঙ্গে ব্যবহারের কোনো পথ নেই। তা নেই বলে তাঁর সব তর্ক গান হয়ে ওঠে—'ঘরে-বাইরে'র বিমলার কথা চুরি করে বলছি ; কিংবা এর চেয়েও সঠিক বর্ণনা যদি দিতে চাই তাও রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পাওয়া যাবে। 'ছন্দ' গ্রন্থের আরম্ভে, 'সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম', এই পঙক্তি উদ্ধৃত করে তিনি মন্তব্য করছেন যে এই সাধারণ সংবাদটিকে ছন্দের মধ্যে এমনভাবে দুলিয়ে দেয়া হয়েছে যে পাঠকের মনে 'কেবলই ঢেউ উঠতে লাগল। ঐ কটি কথা[র]... অন্তরের স্পন্দন আর কোনোদিনই শান্ত হবে না। ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ।' পদ্যছন্দের এই ইন্দ্রজাল আমাদের কারোরই অজানা নেই ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গদ্যের অভিঘাতে কখনো-কখনো অমনি করেই অভিভূত হতে হয়, আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ উঠতে থাকে, কথা শেষ হলেও স্পন্দন থামে না। আরো আশ্চর্য এই যে তাঁর এই কিন্নরকণ্ঠ আমরা সেখানেও শুনতে পাই যেখানে বিষয়টি বৈজ্ঞানিক ; বরং সেখানেই যেন নির্ভুলভাবে শুনতে পাই ; তাঁর ছন্দ ও শব্দতত্ত্বের আলোচনা শুধু আমাদের বুদ্ধির কাছে বার্তা পাঠায় না, আমাদের সমগ্র সত্তাকে পুলকিত করে তোলে। হয়তো কোনো মীমাংসার তীরে তিনি উত্তীর্ণ করেন না আমাদের, কোনো তৈরি সত্য কখনোই হাতে তুলে দেন না ; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে একটি বেগ সঞ্চার করেন, যার ফলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের নিজেদের ভ্রষ্ট স্মৃতি, স্বপ্নের ভগ্নাংশ, চিন্তার রশ্মি, হয়তো ইন্দ্রিয়ের কোনো

নূতন শিহরন। আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি, ভেলা নিয়ে ভেসে পড়ি সমুদ্রে ; তিনি আমাদের স্বাধীনভাবে সত্যানুসরণে যাত্রা করিয়ে দেন—এই তিনি করেন আমাদের—যদি আমরা নিজেদের অক্ষমতাবশত মধ্যসমুদ্রে ডুবে মরি, সে-দায়িত্ব তাঁর নয়, আর যদি বা তাঁর হয় তবু তো মানতে হবে যে বেরিয়ে পড়েই আমরা সার্থক হয়েছি। তাঁর কোনো রচনা অধ্যাপকের কাছে পেশ করলে পাশমার্কাও জুটবে কিনা সন্দেহ ; কেননা কিছু 'প্রমাণ' করা দূরে থাক, কোনো তথ্যও তিনি পরিবেশন করেন না ; তাঁর উল্লেখগুলি অস্পষ্ট, মতামতসমূহ ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা আক্রান্ত, যাকে বলে গবেষণা তার চিহ্নমাত্র নেই। আর-কিছু না, পাঠকের মনে শুধু একটি সুর তুলে দেন তিনি, এবং সুরমাত্রেই গতিধর্মী। 'ওরা অস্থির হয়েছে, এবং অস্থির করাই ওদের কাজ' : তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহের মুখপত্রে এই কথাটি উদ্ধৃতিযোগ্য।

৫

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনাকে অন্য এক ভাবে ভাগ করা যায় ; একদিকে সরকারি বা পোশাকি, অন্য দিকে ঘরোয়া বা আটপৌরে। এই বিভাগ তাঁর প্রবন্ধের পক্ষেও অর্থহীন নয়, কিন্তু পত্রাবলি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিষয়ে আক্ষরিকভাবে প্রয়োজ্য। পত্রাবলিকে বাদ দিয়ে তাঁর গদ্যসাহিত্য বিষয়ে চিন্তা করা যায় না, কেননা তা শুধু পরিমাণে অজস্র নয়, কখনো-কখনো সাহিত্যগুণে ভরপুর। যেগুলো তাঁর সত্যকার চিঠি, এবং সেই সঙ্গে স্মরণীয় সাহিত্য, সেগুলো সবই তাঁর যৌবনের রচনা ; যেদিন থেকে শান্তিনিকেতনের গুরুদেব ও জগতের গুরুস্থানীয় হবার দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটলো, সেদিন থেকে চিঠি লেখার সুযোগ তিনি হারালেন ; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বা পঁচিশ বছরে তিনি পত্রাকারে যা-কিছু লিখেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ অংশ পত্রবেশী প্রবন্ধ, বা অন্তত প্রকাশের জন্যই রচিত ; অন্যগুলো অনুরোধরক্ষার্থে বা কর্তব্যবোধে লেখা, তাতে কখনো কোনো মহিলাকে তিনি সান্ত্বনা বা উপদেশ দিচ্ছেন, কখনো বা সমকালীন পুস্তক বা ঘটনা বিষয়ে তাঁকে কিছুটা অনিচ্ছা কাটিয়ে অভিমত দিতে হচ্ছে। শেষের দিকে তাঁর প্রতিটি চিঠির প্রতিলিপি রেখে তবে তা ডাকে পাঠানো হতো ; চিঠির স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে এত বড়ো বিঘ্ন আর নেই ; তাঁর এই পর্যায়ের চিঠিপত্র সাধারণত এমন অব্যক্তিক যে প্রায় যে-কোনোটি যে-কোনো ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলে অশোভন হতো না। অথচ এই অবস্থাতেও, তিনি নিতান্তই রবীন্দ্রনাথ বলে, অনেক পত্রে অল্পবিস্তর সরসতার তিনি সঞ্চার করেছেন, তাঁর হাতের গুণে খুচরো খবরের চিরকুটও স্বাদু হয়েছে, কাজের কথাও প্রয়োজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। যাকে বলে গুণপনা বা দক্ষতা, তা যেন তাঁর নয়নহরণ হস্তাক্ষরের মতোই তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো ; তা দেখে তাঁকে ধন্য না-বলে যেমন পারি

না, তেমনি আমাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে সেই সুবর্ণযুগ স্মরণ করে, যখন পত্রলেখক ও প্রাপকের মধ্যে মুদ্রাকরের উপচ্ছায়া হানা দেয়নি। সেই যুগের একটি শ্রেষ্ঠ ফসল 'ছিন্নপত্র' —অমর কাব্য 'সোনার তরী', ও 'গল্পগুচ্ছ'কে মনে রেখেই এ-কথা বলছি ; অমন প্রাণোচ্ছল, যুগপৎ অমন ব্যক্তিগত ও সার্বিক, অমন চিরনতুন ও অফুরন্তরূপে পাঠযোগ্য পত্রপর্যায় রবীন্দ্রনাথও আর দ্বিতীয়বার রচনা করেননি। কল্পনা, হাস্যরস, মনস্বিতা ; অনুচিন্তনের আবিষ্কার ও বহির্জগতের বাস্তব তথ্য ; চোখ দিয়ে দেখা ও মনে-মনে ভাবা ;—এই সবই আছে 'ছিন্নপত্রে' আর সেই সঙ্গে আছে আর-একটি ব্যাপ্ত সত্তা, যার নাম বাংলাদেশ ছাড়া আর-কিছুই দিতে পারি না। ঋতু, নদী ও তৃণতরুময় বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, তার কান্তি, গন্ধ ও আর্দ্রতা নিয়ে, এই পুস্তকের অক্ষর থেকে এমনভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যে 'ছিন্নপত্র' নামটি উচ্চারণ করলেই বাংলাদেশের একটি মানসমূর্তি আমরা দেখতে পাই। এবং এগুলো খাঁটি চিঠি, বস্তুতই বন্ধু বা আত্মীয়ের কাছে বার্তাপ্রেরণ, এখানে সচেতন শিল্পিতার কোনো চেষ্টা ছিলো না, লেখার পরে রবীন্দ্রনাথ ভুলেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্তি একান্তভাবে জয়ী এখানে।

অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত ভক্তের কাছে আত্ম-উদ্‌ঘাটন রিলকের পক্ষে যেমন সহজ ছিলো, তেমনি ছিলো রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরোধী ; আমরা দেখতে পাই তাঁর যে-কোনো পর্যায়ের প্রকৃষ্ট চিঠি কোনো নিকট আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে লেখা হয়েছিলো। সতেরো বছর বয়সে, প্রথমবার বিলেতে গিয়ে, তিনি যে-ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন সেটিকে গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর বলা যায় ; 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', তৎকালে সাময়িক পত্রে ছাপা হয়ে থাকলেও, প্রকাশের জন্যই লেখা হয়নি ; জোড়াসাঁকোবাসী আত্মীয়ের উদ্দেশে যথার্থই চিঠি লিখেছিলেন বলে তাতে সেই অন্তরঙ্গতা ধ্বনিত হয়েছে, যা পরে আমরা 'ছিন্নপত্রে' ও 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে পাই, কিন্তু পরবর্তী ভ্রমণগ্রন্থ ও পত্রাবলিতে যা বিলীয়মান। এই পুস্তকত্রয় প্রমাণ করে যে যে-কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সরকারি' সাহিত্য 'সাধু'ভাষায় লিখছিলেন সে-কালেই, প্রমথ চৌধুরীর বহু পূর্বে, তাঁর 'ঘরোয়া' সাহিত্যে 'চলিত' ভাষা স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেছিলো ; অতখানি স্বভাবনৈপুণ্য সত্ত্বেও কেন যে তিনি 'সবুজপত্রে'র পূর্বযুগে চলিত ভাষার প্রকাশ্য ব্যবহারে কুণ্ঠিত ছিলেন, আমরা তা ভেবে অবাক না-হয়ে পারি না।

উত্তরযৌবনে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ ছিলেন না, ছিলো এক বিরাট ভক্তসম্প্রদায়, সৌরকেন্দ্রিক বহু মণ্ডলে বিভক্ত। ততদিনে তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু পরিবর্তন ঘটেছে ; পত্নী এবং দুই পুত্রকন্যা মৃত ; যৌবনের বন্ধু বা পরিবারভুক্ত ঘনিষ্ঠেরা মৃত অথবা ছিন্নযোগ ; বাংলাদেশে কেউ নেই যাঁকে তিনি সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতে পারেন ; সম্রাট তিনি বাংলা সাহিত্যের, জগতের চোখে প্রাচীর প্রতিভূ, ইংরেজ-শাসিত

নিখিলভারতের আত্মমর্যাদার প্রতীক, এবং পূর্বে-পশ্চিমে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ। তৎকালীন পত্রে ও প্রবন্ধে এই সবই প্রতিফলিত হয়েছে। উপরন্তু, এই সময়েই গদ্যরীতি নিয়ে ক্লান্তিহীন পরীক্ষায় তাঁকে প্রবৃত্ত দেখি ; তাঁর জীবনের শেষ কুড়ি বছরের গদ্যে যত নূতন ও নূতনতর ভঙ্গি দেখা যায়, পূর্বতন চল্লিশ বছরের রচনায় সে-তুলনায় প্রায় কিছুই নেই ; যদিও চলিতভাষাকে আগেই একান্তভাবে মেনে নিয়েছিলেন, গদ্যশিল্পে সচেতন পরীক্ষার 'লিপিকা'তেই আরম্ভ। যা কোনোরকমেই পদ্য নয়, গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি জায়গায় অব্যবস্থিতভাবে পড়েও নেই, যা নির্ভুলভাবে গদ্য এবং নির্ভুলভাবে ছন্দ-স্পন্দিত, এই ধরনের রচনাপর্যায় তাঁর অন্ত্যজীবনের প্রধান অবদান। 'লিপিকা'য় তৃপ্ত না-হয়ে 'পুনশ্চ' লিখলেন ; তারপর তিনটি নৃত্যনাট্যে গদ্যকবিতার নূতন রূপকল্প ; 'শেষের কবিতা' থেকে 'মালঞ্চ' পর্যন্ত উপন্যাস ; অবশেষে 'ছেলেবেলা' 'সহজ পাঠ', 'গল্পসল্প'। তুল্যমূল্য নয় এরা, কিংবা আমি এমন কথাও বলতে চাচ্ছি না যে সামগ্রিক বিচারে এই পর্যায় পূর্বরচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট ; কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এই রচনাধারার মধ্য দিয়ে গদ্যশিল্পের এক ত্বরান্বিত বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছে ; বিশেষ অর্থে আধুনিক বলতে পারি এমন বাংলা গদ্যের এরা প্রবর্তক ও বিবর্তক। গদ্যের প্রতি বৃদ্ধ কবির এই নিবিড় মনোযোগের একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে সাধুভাষার তুলনায় চলিত ভাষা অনেক বেশি নম্য, তাতে লীলা ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যের অবকাশ রবীন্দ্রনাথের কানে ও মনে অমোঘভাবে ধরা পড়েছিলো ; এবং যৌবনে যেমন বাংলা পদ্যের প্রতিটি সম্ভবপর ছন্দকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, তেমনি প্রৌঢ় জীবনে গদ্যের ধ্বনিমাধুরীকে নানা রূপে আবিষ্কার না-করে পারেননি। অন্য কারণ হয়তো এই যে তিনি ভিতরের দিক থেকে ক্লান্ত হয়েছিলেন ; বলার কথা আর ছিলো না বলে স্টাইল তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠলো। তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে দুটিরই কাহিনীর অংশ তাঁর নিজের পূর্বরচনা থেকে আহরিত ; 'ছেলেবেলা'য় নতুন কোনো উপাদান নেই ; 'রাজা ও রানী'র রূপান্তর হলো 'তপতী' ; 'রাজা'র, 'শাপমোচন' ; "একটি আষাঢ়ে গল্পে"র, 'তাসের দেশ', ও "পূজারিণী" কবিতার, 'নটীর পূজা'। নৃত্য, সংগীত ও অভিনয়ের আবেদন থেকে চ্যুত করে দেখলেও, শুধু পঠনীয় পুস্তক হিশেবে, এই সব পুনর্লিখনের মর্যাদা যে অনস্বীকার্য তার কারণই এদের গদ্যরীতির কারুকর্মিতা।

এই পর্যায়ের ভ্রমণগ্রন্থের প্রধান লক্ষণ এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো ভুলতে পারছেন না তিনি রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণাঙ্গের ভার' বহন করে পৃথিবীতে বেরিয়েছেন। যেমন এককালে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে বাংলাদেশ ও ইংলন্ডকে অন্তঃস্থ করেছিলেন, জাপান, রাশিয়া বা দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে তেমন ব্যবহার আর নেই তাঁর ; তাঁর চক্ষু আর তথ্য দ্যাখে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় শুধু পূর্বপরিচিত জুঁইফুলে সাড়া দেয় ; নতুন দেশের কোনো দৃশ্য বা আবহ

আর সৃষ্টি করেন না আমাদের জন্য। স্বদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনায় তিনি ব্যাপৃত ; স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় আচ্ছন্ন তাঁর মন ; বিচার, বিতর্ক ও বিশ্লেষণে তিনি এতদূর পর্যন্ত নিযুক্ত যে 'রাশিয়ার চিঠি' প্রায় একটি রাজনৈতিক নিবন্ধ হয়ে উঠলো। অথচ প্রতিটি পুস্তকে গদ্য এমন বেগবান ও দ্যুতিময় যে তার প্রভাব তাত্ত্বিক মূল্যকে ছাপিয়ে পড়ে ; সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কারণে যা পাঠযোগ্য তা শিল্পগুণে স্মরণীয়তার মূল্য পায়। আমার এই কথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'যাত্রী' ; তার ভাবগম্ভীর স্বগতোক্তির মধ্যে জ্ঞানের কথা যা আছে তা অন্য লেখকও শোনাতে পারেন, কিন্তু সুন্দরের সান্নিধ্যলাভে যে-আনন্দ পাই তা রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব দান। এবং, কোনো বিষয়ব্যতিরেকে, শুধুমাত্র ভাষার উপর কর্তৃত্বের ফলে, কতদূর পর্যন্ত মনোমুগ্ধকর রচনা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ; পত্রপ্রাপিকা বালিকাটিকে রবীন্দ্রনাথের কিছু বলার নেই, শুধু খেলাচ্ছলে তার উপযোগী কথা বয়ন করে যাচ্ছেন, এবং ফলত যা দাঁড়িয়েছে তা সকলের পক্ষেই সম্ভোগ্য। একে এক ধরনের 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' বললে হয়তো ভুল হয় না।

মৃত্যুর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনার স্থায়িত্ববিষয়ে সন্দিহান হয়েছিলেন। রোগ ও জরা তাঁর মনকে তখন দুর্বল করে দিয়েছে, তাঁর ভাষার তরুণ লেখকেরা অ-রাবীন্দ্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছেন, সদ্যোদ্ভিন্ন মার্ক্সবাদের প্রভাবে এমন কয়েকটি অপবাদ তাঁকে শুনতে হচ্ছে যা একেবারেই অসাহিত্যিক ও অবান্তর। ভাবতে বেদনা বোধ হয় যে তিনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এর ফলে দুঃখ পেয়েছিলেন ; বিরুদ্ধ মতের উত্তর দেবার সুযোগ তিনি হারাননি, এমনকি তরুণ লেখকদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তিও তাঁর পরিহাসের অন্তর্ভূত হয়েছিলো। বিশেষত তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ বৎসরটিতে তিনি নিজের রচনা বিষয়ে অবিরলভাবে কথা বলেছেন—যা এর আগে কখনোই করেননি ; তার অনেক অংশ শ্রুতিলিখিত প্রবন্ধাকারে বা বিভিন্ন লেখকের স্মৃতিকথায় বিধৃত আছে। বার-বার বলেছেন তাঁর ছোটোগল্পের কথা—যাকে কোনো-এক সমালোচক 'গীতিধর্মী' বলাতে তিনি ব্যথিত হন ; তাঁর ছবির বিষয়ে মুখর হয়েছেন মাঝে-মাঝে ; স্মরণ করেছেন লন্ডনে রটেনস্টাইনের বাড়িতে সেই সন্ধ্যাটি, যখন ইয়েটস তাঁর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। তিনি যে 'চোদ্দ অক্ষর মেলাতে' পারেন তা সহাস্যে মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের ; অবশেষে বলেছেন, 'বাংলাদেশের লোককে আমার গান গাইতেই হবে ; আর-কিছু যদি নাও থাকে, তবু আমার গান থাকবে।' কিন্তু অনেক কথা বলেও তাঁর গদ্য বিষয়ে কিছু বলেননি ; এমন কি হতে পারে যে তাঁর নিজেরও মনে হয়নি যে তাঁর প্রসঙ্গে সেটাও আলোচ্য ? সত্য, যিনি কবির অভিধা নিজের প্রাপ্য বলে জেনেছেন তাঁর আর-কিছু চাইবার থাকে না, ঐ একটি কথাতেই সব বলা হয়ে

যায় ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যের স্বতন্ত্র দাবিকেও উপেক্ষা করা অসম্ভব। আজকের দিনে, তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, সহজেই বলা যায় যে তাঁর গান বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, এমনকি হয়তো উন্মাত্রিকভাবে ; রেকর্ড, রেডিও ও সিনেমার বিপুল প্রচারের ফলে বাংলাদেশে আজ প্রায় এমন কেউ নেই যিনি তাঁর গানের দু-চার কলি না জানেন, কিন্তু অনেকে হয়তো সেটুকুর বাইরে তাঁকে আর কোনোভাবে জানেন না। শিক্ষিত তরুণেরাও তাঁর গানের দ্বারা যতদূর মোহিত তাঁর পঠনীয় রচনাদির সঙ্গে ততদূর পরিচিত নন ; তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেছেন এমন যুবক আজকের দিনে বিরল ; এবং তা নিয়ে আক্ষেপ করাও বৃথা, কেননা যুগধর্ম অপ্রতিরোধ্য, রবীন্দ্রনাথের 'প্রত্যাবর্তনে'র জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন উপায় নেই। সেই দিনের উদ্দেশে বলে রাখতে চাই যে কোনো ভাবী পাঠক যখন সযত্নে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গদ্যরচনা পড়বেন, তাঁর ধারণা হবে তিনি গদ্যশিল্পে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং বিশ্বসাহিত্যেও গরীয়ান। বৈদেশিক কোনো-কোনো লেখকের কথা আমরা ভাবতে পারি যাঁরা তাঁর চাইতে ভালো নাটক, ভালো উপন্যাস বা প্রবন্ধ লিখেছেন, কিংবা যাঁদের গদ্য আরো তীব্র বা গভীর ; কিন্তু গদ্যশিল্পের এমন ঐশ্বর্য, এমন বিচিত্র বৈভব আর কারো রচনায় প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। একজন কবির বিষয়ে এই কথাটা খুব আশ্চর্য শোনায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে অপরিমেয়রূপে প্রতিভাবান ছিলেন সেটা তো তাঁর অপরাধ নয়।

১৯৬১

রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য

ব্যাকরণগত অশুদ্ধির ভয়ে যাঁরা গদ্যকবিতার নাম মুখে আনেন না, গদ্য-গানের উল্লেখ শুনে তাঁদের অত্যন্ত বেশি কাতর হয়ে পড়া স্বাভাবিক। গদ্যের স্বাধীনতার মধ্যে কাব্যের সুষমা যদি বা প্রকাশিত হতে পারে, গান কি তার চিরাচরিত ছন্দ-মিলের বাঁধন ছেড়ে বেরোতে পারে কখনো? কিন্তু প্রতিভা বস্তুটির একটি লক্ষণ এই যে তা নিয়ম মেনে চলে না, কারো অনুমতির অপেক্ষা না-রেখে কখনো-কখনো সৃষ্টি করে সেই অপূর্বকে, শাস্ত্রমতে যার সত্তাই অসিদ্ধ। কত ভিন্ন-ভিন্ন শৈলীতে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, তা চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে সম্ভবপরতার সম্প্রসারণেই প্রতিভাবান সার্থক হয়ে থাকেন। যা নিয়মিত ছন্দে-মিলে বিন্যস্ত, যা ছন্দোবদ্ধ কিন্তু মিলের কোনো বাঁধা নিয়ম মানেনি, যাতে ছন্দ মিল দুয়েরই ব্যবহার আংশিক ও অস্পষ্ট, যাতে মিল নেই আর ছন্দের আছে আভাসমাত্র—এই সব রকম গানের উদাহরণই রবীন্দ্রনাথে প্রচুর, আর সর্বশেষে এমন গানও তিনি রচনা করলেন যার ভাষা গদ্য, আর যা শুনে আমাদের আনন্দিত হবার বাধা হচ্ছে না। গদ্য-গান হতে পারে কি পারে না তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে তর্ক হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাটা যে গানই তা আমাদের অশাস্ত্রীয় হৃদয়স্পন্দনেই অনুভব করা যায়, প্রমাণের জন্য পাঁজিপুঁথির দ্বারস্থ হতে হয় না।

বাংলা গান রচনার অনেকগুলো প্রচল রবীন্দ্রনাথ লঙ্ঘন করেছেন, এই কথাটা কারোরই অবশ্য অজানা নেই। প্রথম মিলটির অনুলাপ বাংলা গানের একটি বড়ো নিয়ম, কিন্তু এর বিরুদ্ধে উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন তিনটি গান যা আমাদের সকলেরই চেনা: 'দুঃখের বরষায়', 'এ শুধু অলস মায়া' ও 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু'। উপরন্তু প্রথমোক্ত গান দুটির আর-এক বৈশিষ্ট্য এই যে কোনো অংশই ফিরে-ফিরে গাওয়া হয় না। ছন্দ ও মিলের দিক থেকে 'আঁধার অম্বরে' মনোযোগের যোগ্য; তার যুক্তবর্ণের ঢেউ-তোলা কল্লোল, 'মদিরা' ও 'ঝটিকা'র স্বরানুপ্রাস, চতুর্থ ও অষ্টম পঙক্তির মিলহীনতা—এই সবের মিলিত প্রভাব, শুধু শ্রোতার নয়, পাঠকের মনেও মোহসঞ্চার করে; যে-ভাবে, একটু টেনে-টেনে আমরা কবিতাটি পড়ি, সুর যেন তারই উন্নত ও সম্প্রসারিত প্রকরণ। এর ঠিক উল্টো ধরনের বিস্ময় আনে 'এ শুধু অলস মায়া':

ছাপার অক্ষরে এটি একটি পরিচ্ছন্ন চতুর্দশপদী, প্রতি পঙক্তির মাত্রাসংখ্যা ষোলো, মিলের বিন্যাস চতুর ও অপ্রত্যাশিত (কখকখকগঘগঘগঘঙঘঙ)* । কিন্তু ছাপার অক্ষরে দেখে কল্পনা করাও যায় না এর সুর কী রকম হবে, গানটি শুনতে-শুনতে যেন অন্য এক জগৎ খুলে যায় আমাদের সামনে । মিলের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঁধাধরা নিয়ম মানেননি, তেমনি ছন্দ ব্যবহারেও তিনি সাহসিকভাবে অভিনব । সুর থেকে বিশ্লিষ্ট হয়েও পদবিন্যাস ছন্দোবদ্ধ হবে, এই হলো বাংলা আধুনিক গানের সর্বস্বীকৃত রূপ, এর ব্যত্যয় দেখলে আমাদের উৎসাহ কেমন ম্লান হয়ে আসে । বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল ইসলামের সব গানে, আর অতুলপ্রসাদের অধিকাংশে, কবিতার ছন্দ অনাহতভাবে বিরাজমান । বলা বাহুল্য, গানের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা রবীন্দ্রনাথ ঐশ্বরিকভাবে পূরণ করেছেন । ক্বচিৎ কোনো ব্যতিক্রম ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত, আমার অনুমান 'মায়ার খেলা' থেকে 'প্রবাহিণী' পর্যন্ত, তাঁর গানগুলিতে কাব্যের ছন্দোবন্ধন শুধু যে অক্ষুণ্ণ তা নয়, রীতিমতো বিস্ময়কর । বিস্ময়কর এইজন্যে যে গানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ছন্দ লেখেননি, ছন্দ সৃষ্টিও করেছেন ; স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের অনেক নতুন ভঙ্গি, মিলের অনেক সূক্ষ্ম কৌশল, অনুপ্রাসের অন্তর্লীন চাতুরী—বাংলা কবিতায় এই সব কারুকর্মের উত্তম উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আমাদের 'গীতবিতানে'র—আর বিশেষভাবে 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ের—শরণাপন্ন হতেই হবে । কিন্তু তাঁর উত্তরজীবনের সবগুলি গানকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি না ; কেননা তাদের মধ্যে ব্রাত্য অনেক, ছন্দ-মিলের প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে তারা ; যেমন কবিতায় তিনি এই সময়ে স্বীকার করলেন গদ্যকে, তেমনি গানকেও ছন্দ থেকে ছুটি দিলেন । হয়তো এমনও বলা যায় যে তাঁর পূর্ব ও মধ্য জীবনের অধিকাংশ গান নির্ভুলভাবে কবিতা, এবং কবিতা বলেও (বা এমনকি কবিতা বলেই) আদরণীয়, কিন্তু উত্তরজীবনে তাঁর গান অনেক বেশি গান হয়ে উঠলো, আর সেইজন্যই তাতে ছন্দোরক্ষার আর প্রয়োজন হলো না ।

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ষোলো মাত্রার পয়ারের ব্যবহার বাংলা কবিতায় বিরল, তার কারণ এই যে ষোলো মাত্রায় কবিতার পঙক্তি ঠিকমতো শেষ হতে পারে না, কেমন টলমল করে। হয়তো সেইজন্যেই 'এ শুধু অলস মায়া'র সুর এমন চঞ্চল ও রুদ্ধশ্বাস, একটি বাক্যাংশ শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই পরেরটিকে ধরে ফেলা হচ্ছে। রচনাটি গান হিশেবে এত বিখ্যাত যে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিলে ধৃষ্টতা হয় না যে এটি "গান-রচনা" নামে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ; এবং ঐ পুস্তকেই অন্য কয়েকটি চতুর্দশপদীতে মিলের ব্যবস্থায় তুলনীয় কৌশল দেখা যায়। যেমন "যৌবন-স্বপ্ন"—কখককখকখগঘগঘঙঙঘ, "ক্ষণিক মিলন"—কখকখগকগঘঘঙঙঙচচ।

'গীতবিতান' সর্বশেষ (১৯৬০) সংস্করণের ১০১৮ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি কৈশোরক গানের উল্লেখ আছে যা 'অল্পাধিক অমিত্রাক্ষরে' রচিত। শুধু মিলের নয়, ছন্দোবন্ধন বা এমনকি ধ্বনিস্পন্দেরও অভাব দেখা যায় এই রচনাগুলিতে, ধরে নেয়া যায় যে অনভিজ্ঞতাই তার কারণ : সাহিত্যের দিক থেকে এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা আলোচ্য হতে পারে না। পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর না হোক, গানে মিলবর্জন ও ছন্দোমুক্তির প্রথম উল্লেখ্য উদাহরণ 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'। গানটির রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১৩০২। সমকালীন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা ও গানের প্রতিবেশে দেখলে এটিকে বলতে হয় আকস্মিক। কিন্তু 'নীলাঞ্জনছায়া'র সূক্ষ্ম ও সচেতন শিল্পকর্মের সঙ্গে সমকালীন অন্য অনেক গানের আত্মীয়তা নিবিড় :

নীলাঞ্জনছায়া,
        প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
        বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
        পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
        কান্তাবিরহকান্তারে ॥

এই ক্ষুদ্র রচনাটিকে পরীক্ষা করলে অনেক বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। প্রথমত, এটি প্রায় অমিত্রাক্ষর, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অমিত্রাক্ষর ('বনান্ত-সুগন্ধ-দিগন্ত'কে মিল না-বলে বরং অর্ধ-মিল বা স্বরানুপ্রাস বলা ভালো), আট পঙক্তির মধ্যে একটিও ক্রিয়াপদ নেই, 'মোর' ছাড়া সবগুলো শব্দই তৎসম, আর কবিতার বিচারে ছন্দোবদ্ধ একে বলা চলে না। ছন্দের ধ্বনিস্পন্দ আছে, কিন্তু তাল নেই, পুঞ্জিত যুক্তবর্ণের অনুপ্রাস কানে শোনাচ্ছে ভালো, দীর্ঘ স্বরগুলি যেন দীর্ঘায়িত উচ্চারণ দাবি করছে, 'কান্তারে' শব্দের 'এ' স্বর যেন একটি অন্তিম দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে রচনাটিকে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে দিলে।

কিন্তু এত রকম কারুকার্য সত্ত্বেও আমাদের মানতেই হবে যে বাংলা ভাষার একটি কবিতা হিশেবে রচনাটি পাঠ করা দুঃসাধ্য। এই একই ধরনের রচনা 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো', 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও তা-ই। শেষেরটিতে একটিও মিল নেই, প্রথমটিতে আছে একটিমাত্র ('হরষে-বরষে-বাতাসে-আকাশে-সুবাসে'), ছন্দ

উভয়েরই শিথিল ; হয়তো এরা মুক্তছন্দ বা ফ্রী ভার্সের উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হতে পারে, এবং এই স্বাধীনতা কবির উত্তরপর্যায়ের অনেক গানেরই চরিত্রলক্ষণ। এগুলোকে কবিতার মতো আবৃত্তি করে সুখ হয় না, যেমন হয় 'গীতাঞ্জলি'র গান আবৃত্তি করে ; এরা গীত ও শ্রুত হবার জন্যই রচিত, নিতান্ত পাঠক এদের স্বাভাবিক ভোক্তা নয় ; মনে-মনে পড়লেও মনে-মনে সুরটাকে টেনে নিয়ে চলতে হয়, আর সুর যদি শোনা না থাকে তাহলে পাঠক অবলম্বনহীন।

ছন্দ ভেঙে দিয়ে, মিল বর্জন করে গান রচনার এই যে নতুন রীতি, এই যে রবীন্দ্রনাথের শেষ গীতিগুচ্ছ বাণীবাহিত থেকেও সম্পূর্ণ সুরনির্ভর হয়ে উঠলো, তাঁর তিনটি নৃত্যনাট্যে এই রীতিরই বিবর্তন ঘটেছে। নাটকত্রয়ের প্রথম প্রকাশের কাল বঙ্গাব্দ ১৩৪২ থেকে ১৩৪৬ পর্যন্ত ; প্রায় একই সময়ে লেখা হচ্ছিলো তাঁর প্রধান গদ্যকবিতার গ্রন্থগুলি ; 'পুনশ্চ'র ঈষৎ পরবর্তী এরা, এবং 'বীথিকা', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র সমকালীন। বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তির প্রসঙ্গে এই তিনটি নৃত্যনাট্য ঐতিহাসিকের আলোচ্য হবে, কেননা এদের সংলাপের অংশও সুরে বাঁধা, অথচ তাতে পদ্যের বাঁধুনি নেই। অন্তত 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'য় সংলাপ রচিত হয়েছে শুধু ধ্বনিস্পন্দন ও মিলের সাহায্যে ; পদ্য নয়, গদ্যও তাকে বলা যাবে না (কেননা 'সাধু' ক্রিয়াপদ ও পদ্যোচিত ব্যুৎক্রমের অবিরল ব্যবহার হচ্ছে), মনে-মনে কিছু-একটা সুর বানিয়ে না-নিলে ছাপার অক্ষর মূক হয়ে থাকে। আসলে যা শ্রোতব্য ও দ্রষ্টব্য তাকে নিস্তাপ অক্ষরের পথে 'পাঠকের অভিসারে' পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। 'চিত্রাঙ্গদা'র বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে বলতে হলো :

> এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।

'নৃত্যনাট্য শ্যামা'র প্রথম লেখন 'পরিশোধে'র মুখবন্ধে আবার লিখছেন :

> কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পদ্যকাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীনবৈধব্য অপরিহার্য।

'অপরিহার্য' ?—আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—তিনি কি পারতেন না ছন্দ অটুট রেখে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরে বসাতে ? অনেক আগে কি 'মায়ার খেলা'তে তা করেননি ? আর-এক প্রশ্ন : সত্যি কি কথাগুলিতে শুধু এক 'শ্রীহীনবৈধব্য' অনুভব করছি আমরা ? কই, না তো, মনে হচ্ছে এরাও কবিত্বরসে সিঞ্চিত, ছাপার অক্ষরে পড়েও কিছুটা বিচলিত হচ্ছি না তা নয়।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।
পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্যপরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল বেষ্টিল চারি ধারে।

হ্যাঁ, বিচলিত হচ্ছি, যাকে বলে মনে একটা 'ভাব' জাগছে, কিন্তু তার কারণ কি এই শব্দবিন্যাস, না কি আমাদের বহুশ্রুত সংলগ্ন সুরের স্মৃতি, সে-বিষয়ে মনস্থির করা সহজ হচ্ছে না। এই অংশটিকে নিতান্ত কবিতা হিশেবে গ্রহণ করলে সপ্তম ও অষ্টম পঙক্তি স্বরবৃত্ত বলে স্বীকার্য হতে পারে, নবম ও দশম পঙক্তির দীর্ঘস্বর দীর্ঘায়িত করে পড়লে সেখানেও ছন্দ পাওয়া সম্ভব, অন্ত্যানুপ্রাস প্রচুর তা তো স্পষ্ট দেখছি, তৎসম শব্দের ভিড়ের মধ্যে 'শিকার' ও 'বেড়াজাল'-এর মতো দৈশিক শব্দের অভিঘাতও লক্ষণীয়—অথচ মোটের উপর স্বীকার না-করে উপায় নেই যে এই স্তবক পঠিত হবার জন্য লেখা হয়নি, সুরের সংযোগে গান হয়ে ওঠাতেই এর সার্থকতা। অর্থাৎ, রচনাটি গদ্য-পদ্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় দোলায়িত হয়ে আছে, সাহিত্যবিচারে এর সংজ্ঞার্থ অস্পষ্ট।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'ও এই একই পদ্ধতিতে রচিত, কিন্তু তার কোনো-কোনো অংশে গদ্য পেয়েছে স্পষ্ট রূপ, আর সেই কারণে আমি একে সহচর নাটক দুটি থেকে একটু আলাদা করে নিতে চাই। এর প্রথম লেখন একটি গদ্য নাটিকা, অন্য দুটি কাব্য থেকে রূপান্তরিত, এই পার্থক্য আমাদের মনে রাখতে হবে। উপরন্তু, 'চণ্ডালিকা'র

বিষয়বস্তুটিও এক বিশেষ অর্থে মানবিক, এবং তার রচনাশৈলী বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। অন্য দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় এতে আভরণ বিরল, পদে-পদে মিলের ঝংকার নেই, স্থানে-স্থানে পদ্যছন্দের আভাস পর্যন্ত ত্যাগ করে গদ্যের সরলতাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছে। কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'কে নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' ভুলতে পারেনি, 'পরিশোধ' কবিতার স্মৃতি 'শ্যামা'কে জড়িয়ে আছে, কিন্তু 'চণ্ডালিকা'র কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ কোনোকালে পদ্যরূপ দেননি, নৃত্যনাট্যটি তার অগ্রজ এক গদ্য নাটিকার অনুলেখন ; আর সেইজন্যই গদ্য এখানে কোথাও-কোথাও সাবলীল ও স্বাবলম্বী। পদ্য ভেঙে অপদ্য রচনা করা দুরূহ, কিন্তু টানা গদ্য ও গদ্যকবিতায়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের রচনাগুলিতে ব্যবধান এতটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো যে একটি পত্রকে নতুন করে সাজিয়ে তিনি 'পুনশ্চ'র "বাসা" কবিতা লিখতে পেরেছিলেন। অনুরূপ উপায়ে 'চণ্ডালিকা'ও লাভবান হয়েছে।

•

> প্রকৃতি। সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীত বসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে। ('চণ্ডালিকা' গদ্যনাটিকা)

এই অংশটিকে অসমপঙক্তিকরূপে সাজিয়ে দেখা যাক :

সেদিন রাজবাড়িতে
বাজল বেলা-দুপুরের ঘণ্টা,
        ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর।
মা-মরা বাছুরটাকে
        নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে।
কখন সামনে দাঁড়ালেন
        বৌদ্ধ ভিক্ষু,
        পীত বসন তাঁর।
বললেন, জল দাও।
প্রাণটা উঠল চমকে,
শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে।

গদ্যকবিতা হলো কি ? নিশ্চয়ই— কিন্তু সুরে বসাবার উপযোগী হয়তো হলো না, অন্তত কোনো করুণ রসের সুরের পক্ষে 'নাওয়াচ্ছিলুম' কথাটির বেড়া টপকানো শক্ত হবে। সুরের গরজে যেটুকু প্রয়োজন, সেটুকু মাত্র পরিবর্তন করে রবীন্দ্রনাথ 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় লিখলেন :

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।

মিল নেই, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন 'পদ্যের বোল' তাও শোনা যাচ্ছে না ; এর মনোমুগ্ধকর সুরের সঙ্গে যদিও আমরা প্রত্যেকেই পরিচিত, তবু সেই সুরের স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে—'করাতেছিলেম' ক্রিয়াপদে মৌখিকতার অভাব সত্ত্বেও—এই অংশটিকে গদ্যকবিতা হিশেবেই পাঠ করা সম্ভব। তাহলে বলা যেতে পারে যে এই হচ্ছে সত্যিকার গদ্য-গান। বাইরের চেহারা একেবারেই গানের মতো নয়, বিষয়বস্তু আটপৌরে, ভাষাও নিরলংকার, মনে হয় যেন মুখের কথাই গান হয়ে উঠলো *। সুরমন্দিরে যে-সব প্রসঙ্গের প্রবেশের অধিকার ছিলো না, একটি অস্পৃশ্যার সঙ্গে

---

* এখানে একটি আপত্তি ওঠা সম্ভব। এই ভাষা বিদগ্ধজনের 'মুখের কথা' হলেও হতে পারে, কিন্তু অশিক্ষিত চণ্ডালকন্যার মুখে তা অবাস্তব। এই আপত্তি একেবারে অবান্তর, আমি তা বলবো না, কিন্তু 'রাজা' বা 'মুক্তধারা'য় জনগণের সংলাপ এই অর্থে কৃত্রিম যে তা অবিশ্বাস্য, আর 'চণ্ডালিকা' কৃত্রিম শুধু এই অর্থে যে তা শিল্পিত, অর্থাৎ এখানে অনাস্থার অস্থায়ী অপনোদন ঘটে। চণ্ডালকন্যার মনের কথা কবি যে এখানে নিজের ভাষায় প্রকাশ করছেন তাতে কোনো অসংগতি নেই, কেননা সুরের সংযোগে জীবনের সঙ্গে একটি 'দূরত্ব' রচিত হয়েছে, যে-দূরত্ব সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত। এই দূরত্বের অভাবেই 'রাজা'য় প্রাকৃতজনের গদ্য সংলাপ এত পীড়াদায়ক।

সেই অস্পৃশ্যদেরও মুক্তি দিলেন আমাদের কবি। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বিষয়গুলি বাংলা গানে ইতিপূর্বে স্বীকৃত হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলির অবলম্বন ছিলো কৌতুক, আর পিছনে ছিলো বিলেতি মিউজ়িক-হল্‌-এর উদাহরণ। প্রধানত দ্বিজেন্দ্রলাল, আর 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দস্যুদের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ, সেই সাংগীতিক হাস্যরসের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করেছেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' উন্নত ও গম্ভীর ভাবের রচনা, কৌতুকের সম্ভাবনামাত্র নেই এখানে (যা 'শ্যামা'র প্রহরীর দৃশ্যে আছে) ; উদ্ধৃত অংশের বেদনা ছাপার অক্ষরেও ধরা পড়ে ; 'স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে' এই অত্যন্ত শাদাশিধে কথাটিও যখন কারুণ্যে গলে সুরের মধ্যে মিশে যায়, তার অভিভাবে সংক্রমিত না-হয়ে উপায় থাকে না।

অবশ্য 'চণ্ডালিকা'য় 'সাধু' ক্রিয়াপদের ব্যবহার অবিরল ; 'মোর', 'হেন', 'উথলি', 'উদ্ধারিতে' প্রভৃতি 'কাব্যিক' শব্দেরও অভাব নেই ; এবং পূর্বোক্ত অংশটি সমগ্র রচনার মধ্যে ব্যতিক্রম বলেই উল্লেখযোগ্য। অন্য কোথাও এই ধরনটা নেই তা নয়, কিন্তু পুরোপুরি গদ্যের ভাষা বেশিক্ষণ বজায় থাকেনি। যেমন—

কেউ যে কথা বলতে পারে নি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও।
ওই একটু বাণী—
তার দীপ্তি কত ;
আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম।
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা।

'উথলি উঠল' গদ্যে অসম্ভব, পদ্যেও অশোভন, ব্যাপারটা গান না-হলে রবীন্দ্রনাথ এটা লিখতেই পারতেন না। কোনোক্রমে 'উথলে উঠল' লেখা সম্ভব হলে এই অংশটিকেও গদ্য বলে আমরা মানতে পারতুম। সর্বসাকুল্যে বলা যাবে না যে 'চণ্ডালিকা' গদ্যরীতি অবলম্বন করেছে, তবে তিনটি নৃত্যনাট্যের মধ্যে এটি যে সবচেয়ে বেশি গদ্য-ঘেঁষা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'গীতবিতানে'র সর্বশেষ সংস্করণের ৯৭১ পৃষ্ঠায় যা বলা হয়েছে 'চণ্ডালিকার বহু গা ন স ম্পূ র্ণ ই গ দ্য ছ ন্দে লে খা' (ফাঁক অক্ষর মূলের), এটাকে আমি সদভিপ্রায়প্রসূত অতিবাদ হিশেবে গ্রহণ করছি, কেননা

রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দে লেখা কবিতার সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র গরমিলগুলো এত স্পষ্ট যে এই উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নেয়া স ম্পূ র্ণ ই অ স ম্ভ ব।

এখানে স্মর্তব্য যে 'পুনশ্চ'র "শাপমোচন" কবিতার একটি অংশে কবি সুরযোজনা করেছিলেন, স্বতন্ত্রভাবে সেটি একটি গদ্য-গান হিশেবে স্বীকার্য। নবতম সংস্করণ 'গীতবিতানে'র 'প্রেম' বিভাগের অনেক গানে* আমি সঠিক গদ্যছন্দ খুঁজে পাইনি, পুরোপুরি গদ্য না হোক, গদ্য বা মুক্তছন্দের দিকে এদের উন্মুখতা স্পষ্ট, যদিও 'সাধু'ভাষা ও মাঝে-মাঝে মিলের ব্যবহারের ফলে অমনস্ক বা অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এদের ছন্দোবদ্ধ বলে কল্পনা করা আশ্চর্য নয়।

বলা দরকার যে গদ্যকবিতা বা ছন্দোমুক্ত কবিতাও সমিল হতে পারে, মাঝে-মাঝে মিল বা মিলের আভাস থাকলেই প্রমাণ হয় না যে রচনাটি পদ্যজাতীয়। যেমন, 'শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ন সন্ধ্যায়' গানটিতে আমরা একটি মিল অথবা অর্ধ-মিল পাচ্ছি (সন্ধ্যায়-চায়-সাধনায়-বেদনায়), 'এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি'তে মিল আরো স্পষ্ট, কিন্তু এই গান দুটিতে কোনো বাঁধা-ধরা ছন্দ স্বীকৃত হয়নি, 'কাব্য আবৃত্তির আদর্শে' এদেরও বিচার চলবে না। আর যে-সব গান অংশত ছন্দোবদ্ধ বা যাতে একাধিক প্রকার ছন্দের ব্যবহার আছে, বা পাশাপাশি আছে ছন্দ ও ভাঙা ছন্দ, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সে-প্রসঙ্গ ধরানো অসম্ভব। শুধু কয়েকটি বিখ্যাত গান উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করি। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলে'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তিতে** কোনো নির্দিষ্ট ছন্দ নেই, 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর-দিনে'র আট পঙক্তির মধ্যে মাত্র চারটিতে তা খুঁজে পাওয়া যায় ; 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' আগাগোড়া স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের মধ্যে দোদুল্যমান ; 'আজি বরিষন-মুখরিত শ্রাবণরাতি' বা 'সঘন গহন রাত্রি'র প্রতি পঙক্তিতে নিয়মিত পর্ববিভাগের চেষ্টা করলে যে-কোনো ছান্দসিক পরাস্ত হবেন। আবার রবীন্দ্রনাথেরই এমন গান একটি অন্তত আছে, যা রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ, অথচ যাতে একটিও মিল নেই ; যাকে সম্পূর্ণরূপে অমিত্রাক্ষর বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের এমন একটি গানের যদি নাম করতে হয় তা—

* উদাহরণ : ২২৬, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪ ও ২৩৫ নম্বর গান, প্রথম পঙক্তি যথাক্রমে, 'বাণী মোর নাহি', 'আজি দক্ষিণপবনে', 'আমার আপন গান', 'অধরা মাধুরী', 'আমি যে গান গাই', 'ওগো পড়োশিনি', 'ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী', 'ওরে জাগায়ো না' ও 'দিনান্তবেলায় শেষের ফসল'। কোনো-কোনোটি প্রায় মিলবর্জিত। হয়তো অনুরূপ উদাহরণ আরো আছে, যা আমি লক্ষ করিনি, বা এ-মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

** পঙক্তির অনুক্রম 'গীতবিতান' অনুসারে উল্লেখ করছি, যদিও—যা আসলে, অর্থাৎ ধ্বনির দিক থেকে, দুই বা তিন পঙক্তি, তা ঐ গ্রন্থে প্রায়শই একপঙক্তিরূপে মুদ্রিত হয়েছে।

'বিশ্ববীণারবে' নয়, 'নীলাঞ্জনছায়া' নয়, 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'ও নয়, তা হলো 'চণ্ডালিকা'র 'ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন'—এই গানটি। প্রথমোক্ত রচনা দুটিতে মিল একেবারেই নেই তা নয়, দ্বিতীয়টিতে তার আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, আর 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' বিধিবদ্ধ ছন্দে রচিত নয় বলে অমিত্রাক্ষরের প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। মিল আছে কি নেই, এই কথাটা শুধু সেখানেই ওঠে যেখানে কাব্যছন্দ অব্যাহত ; গদ্যে বা মুক্তছন্দে মিল থাকতেও পারে, কিন্তু মিলের জন্য পাঠকের কোনো প্রত্যাশা থাকে না। ছন্দোবদ্ধ রচনা, যাতে আমরা মিল আশা করি, অথচ শিল্পিতার গুণে মিলের অভাব অনুভব করি না, 'অমিত্রাক্ষর' কথাটা শুধু সেখানেই প্রয়োজ্য। আর তারই সার্থক উদাহরণ—রবীন্দ্রনাথের সুরাশ্রিত কবিতার মধ্যে—হয়তো বা একমাত্র এই 'ঘুমের ঘন গহন হতে' গানটি। এবং এটি আন্তরিক মূল্যেও গরীয়ান।

কাব্যরচনার দিক থেকে দেখলে, রবীন্দ্র-সংগীতে বৈচিত্র্য যে কত বিপুল তা আমরা গীতমুগ্ধ হয়ে সব সময় মনে রাখতে পারি না ; তবু শেষ পর্যন্ত ভুলে থাকা অসম্ভব যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় তাঁর গান যেমন একটি বড়ো অংশের অধিকারী, তেমনি—শুধু সুর নয়—ছন্দ ও ছন্দোমুক্তির কারুশিল্পেও তার কৃতি এখানে অপর্যাপ্ত। আমার বিশ্বাস, শেষ জীবনে নিরন্তর রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে না-হলে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-গানের আরো স্পষ্ট ও সপ্রতিভ কোনো আকৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন, ব্যাপারটা এ-রকম পদ্য-গদ্যের মধ্যবর্তী অনিশ্চয়তায় সমাপ্ত হতো না। কিন্তু এই রাস্তাটি তিনি খুলেছিলেন মাত্র, মৃত্যু তাঁকে অগ্রসর হতে দেয়নি, এবং এই বিশেষ পথে এখন পর্যন্ত নতুন কোনো যাত্রী নেই।

১৯৬১

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী

'রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এই অতিরঞ্জন ঠিক সেই ধরনের, যা বিদ্যুতের মতো সত্যকে উদ্ভাসিত করে আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে যাঁদের বলা যায় আদিসমাজ-ভুক্ত, তাঁরা এই কথাটাকে পছন্দ করবেন না, এবং যে-তরুণের দল আজকের দিনে 'ঘরে ফিরতে' সচেষ্ট, যাঁরা এমনকি বাংলা মঙ্গলকাব্যেই বাংলা উপন্যাসের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও কথাটা অগ্রাহ্য হবে। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করানো সম্ভব ; কেননা প্রতীচীতে তাঁর পরিচয় ছিলো প্রাচ্যদেশের ঋষিরূপে ; পাশ্চাত্ত্য গতিধর্মের উত্তরে শান্তির বাণী তাঁর অবদান, সত্য শিব ও সুন্দর তাঁর জপমন্ত্র। আমাদের মানতেই হবে যে তাঁর বিষয়ে পশ্চিমের এই ধারণাতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি, বরং সর্বতোভাবে তার পুষ্টিসাধন করেছিলেন। তবু—য়োরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যে একটি সত্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলে 'প্রভাব' শব্দটি যান্ত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে : ইবসেনের 'প্রেত' নাটক পড়ে বর্নার্ড শ লিখলেন 'বিপত্নীকের গৃহ', এলিয়ট ভগবদ্গীতার ভাবানুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে হিন্দু মানসের কাছে ঋণ স্বীকার করলেন। এই রকম প্রত্যক্ষ প্রভাব বা ঋণগ্রহণ সাহিত্যের ইতিহাসে অনবরত দেখা যায়, এবং যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে গবেষণা করে থাকেন তাঁদের পক্ষে এই সম্বন্ধগুলোই খনিস্বরূপ। কিন্তু অন্য এক রকমের প্রভাব আছে যা গোপন বা লুক্কায়িত, যার বিষয়ে কবি নিজেও স্পষ্টত সচেতন নন ; যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অর্ধালোক থেকে বাইরে ভেসে ওঠে না কখনো, বা উঠলেও, ডক্টরেট-ডিগ্রিপ্রার্থীদের পরিশ্রমী মুষ্টিকে ফাঁকি দেয়। এবং এই সব গোপন প্রভাবই সবচেয়ে স্থায়ী ও গভীর। রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক, তাঁর কবিসত্তার যা ভিত্তিভূমি—আমি বলতে চাই তার বড়ো একটি অংশ য়োরোপের অন্তর্ভূত।

জানি, তথ্যের দ্বারা এই কথাটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য ; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের তথ্যনির্ভর সমালোচনা এখনো সম্ভব নয়। যদিও তিনি আধুনিক যুগের কবি, বলতে গেলে আমাদেরই সমকালীন, তবু তাঁর জীবনী-সংক্রান্ত সাহিত্যিক উপাদান এতদিনেও কিছুই প্রায় জমে

ওঠেনি। আমরা এটুকু পর্যন্ত জানি না তিনি দীর্ঘ জীবন ভরে কোন-কোন বিষয়ে এবং কী পরিমাণ পুস্তক পাঠ করেছিলেন ; কোন-কোন বইয়ের শুধু পাতা উল্টিয়ে গেছেন, কোনগুলি তাঁর প্রীতিসাধন করেছে, আর কোনগুলিকে শোষণ করে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। তাঁর আত্মজৈবনিক ও অন্যান্য গদ্যরচনার পরিমাণ বিপুল, কিন্তু তার মধ্যে অন্যের প্রণীত পুস্তকের উল্লেখ আমরা অল্পই পাই, এবং সাধারণত সেগুলো সংস্কৃত বা পূর্ব-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সীমিত। ওঅর্ডস্বার্থ, শেলি, কীটস, টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ রোমান্টিক কবিরা মাঝে-মাঝে দেখা দেন তাঁর রচনায়—প্রাচীন সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্যের বাইরে প্রধানত শুধু এঁরাই ; য়োরোপীয় কবিতার যে-একটি পঙক্তি তিনি ক্লান্তিহীনভাবে উদ্ধৃত করেন তা, আশ্চর্যের বিষয়—কীটসের—'Beauty is truth, truth beauty' ; আর তাও কাব্যের খাতিরে নয়, নন্দনতত্ত্বের একটি ফলদ সূত্র হিশেবে। 'শেষের কবিতা'য় ও 'চার অধ্যায়ে' জন ডান ও ইবসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটা খুব সম্ভব তৎকালীন তরুণ গোষ্ঠীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আনুকূল্যের নিদর্শনমাত্র। প্রায় একই সময়ে 'আধুনিক কাব্য' নামে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন তা পড়েই বোঝা যায় যে, টেনিসন ও ব্রাউনিঙের প্রতি অনুকম্পায়ী হলেও, পশ্চিমী নব্যসাধকদের দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি—বা মনোযোগের যোগ্য বলেই ভাবেননি তাঁদের। রবীন্দ্রনাথের যে-সব কবিতায় প্রত্যক্ষ আহরণ লক্ষণীয় বলে মনে হয়, সেখানে উনিশ-শতকী ইংরেজ কবিরাই স্মর্তব্য, "বর্ষশেষে"র সঙ্গে 'Ode to the West Wind', বা "মানসসুন্দরী"র সঙ্গে 'Epipsychidion'-এর তুলনাকে অর্থহীন বলা যায় না ; 'মানসী'র "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি", "ব্যক্ত প্রেম" ও "গুপ্ত প্রেম" পড়ে ব্রাউনিঙের 'Dramatic Lyrics' মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রত্যক্ষ আহরণ ও গভীরতর প্রভাব এক কথা নয় ; রবীন্দ্রনাথের সত্যকার উত্তমর্ণ পাশ্চাত্ত্য কবিদের মধ্যে কারা, এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি এখনো আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ।

কিন্তু এমন হতেই পারে না যে রবীন্দ্রনাথের পাঠাভ্যাস উপরোক্ত গ্রন্থ ও লেখক ক-টিতেই সীমিত ছিলো ; নিশ্চয়ই তিনি নানা ধরনের অসংখ্য পুস্তক পড়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী কবিরা সাধারণত যা করে থাকেন, সেই আত্মোদ্ঘাটন তাঁর স্বভাবের বহির্ভূত ছিলো বলে, তাঁর আহরণের সত্য ইতিহাস প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে। পত্ররচনায় অমিতব্যয়ী হয়েও তাঁর কোনো বিশেষ কাব্যের বিশেষ প্রেরণার উৎস বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকম নীরব। আমরা জানি জ্যোতির্বিজ্ঞান, কীটবিজ্ঞান, ঔপনিবেশিক রাজনীতি —এই ধরনের পরস্পরবিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিলো ; 'এমিয়েলস জর্নাল' নামক অধুনা প্রায় অপঠিত পুস্তকের তিনি অনুরাগী ছিলেন ; গোতিয়ে-র 'মাদমোয়াজেল

দ্য মোপ্যাঁ' তিনি সহ্য করতে পারেননি, 'আনা কারেনিনা' পড়তে গিয়ে প্রতিহত হয়েছিলেন, যদিও জর্জ এলিয়টের উপন্যাসের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিলো। উত্তর-জীবনে এজ়্রা পাউন্ড ও এমি লোয়েলের উদ্দেশে বক্রোক্তি করে, আমাদের মনোযোগের জন্য তুলে ধরেছিলেন স্টার্জ মূরকে। যদি রবীন্দ্রনাথের স্বীয় উক্তিগুলিকেই প্রমাণস্বরূপ ধরতে হয়, তাহলে এমনকি তাঁর সাহিত্যিক রুচি বিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায় নেই আমাদের। তাঁর সমকালীন ও তাঁর সন্নিকট অগ্রজ ও অনুজদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জগতে সত্যকার কবি ও সত্যকার নতুন কবি যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জগতের কাছে তৎকালীন প্রতীচীর বাণীমূর্তি, আমরা ব্যথিত বিস্ময়ে দেখতে পাই যে তাঁদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কখনো উল্লেখ করেন না। বোদলেয়ার বা সুইনবার্ন, ভের্লেন বা মালার্মে, রিলকে বা ভালেরি কেউ তাঁর কৃপালাভে কৃতকার্য হলেন না ; উনিশ-শতকী রুশ উপন্যাস, ফরাশি চিত্রকলা, জর্মান সংগীত—পশ্চিমী সভ্যতার এই প্রোজ্জ্বল স্তম্ভগুলিকে তিনি অম্লানভাবে উপেক্ষা করে গেলেন। ইয়েটস বিষয়ে একবার যে-ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লেখেন, তাতে ইয়েটস-এর কবিতার বিষয়ে যথার্থ গুণগ্রাহিতার কোনো পরিচয় নেই। ঐ নিবন্ধটি যেমন বন্ধুকৃত্য, তেমনি 'Journey of the Magi'-এর অনুবাদটিও কর্তব্যবোধে বা ঘটনাচক্রে সাধিত। আর এই রবীন্দ্রনাথেরই প্রতীচীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিলো নিরন্তর, বিদেশ-ভ্রমণে ক্লান্তিহীন তিনি, য়োরোপের শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো সমকালীন লেখক তাঁর সঙ্গে অনুবাদ, সম্পাদনা ও বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ।

আশ্চর্য স্বতোবিরোধ, প্রায় অবিশ্বাস্য। সংবেদনশীলতায় অতুলনীয় এই কবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি কেমন করে তাঁর সমকালীন সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির প্রতি এমন অবিচলভাবে উদাসীন থাকতে পেরেছিলেন? যদি বলা যায় যে তিনি আসলে ছিলেন য়োরোপীয় বা ইংরেজি হিশেবে রোমান্টিক-ভিক্টরীয় কবি, ওঅর্ডস্বার্থ-টেনিসনের সগোত্র, অতএব রুশ উপন্যাস বা ফরাশি প্রতীকীদের প্রতি অনুকম্পা তাঁর কাছে আশা করাই আমাদের অন্যায়, তাহলে প্রশ্নটিকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সুবিচার হয় না। এ-কথা তো সত্য যে তিনি ১৯৪১ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন—এবং সার্থকভাবে বেঁচে ছিলেন ; উপরন্তু তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকিরণের অধ্যায়টিকে ১৮৮০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে—অর্থাৎ যে-অর্ধশতক ভরে তাঁর উদ্যম পূর্ণতেজে নিঃসৃত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রতীচীর সাহিত্য নূতন প্রেরণায় উন্মুখর। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেখানে-যেখানে পুনরুক্তির বদলে সৃষ্টিশীলতা দেখা দিয়েছে, গতানুগতির বদলে মৌলিক প্রতিভা—আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই-সেই অংশ আমাদের কবিগুরুকে কখনোই যেন স্পর্শ করেনি। প্রথম যৌবনে যে-সব কবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো, প্রবীণ বয়সেও উত্তম কবির নিদর্শনরূপে তাঁদেরই তিনি স্মরণ

করেছেন। এই নিশ্চলতা কেমন করে সম্ভব হলো, তা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ কি তাঁর চরিত্রের অনাক্রমণীয় অবৈকল্যের প্রমাণ, না কি তাঁর এই লক্ষণ আমাদের এ-কথা বলার অধিকার দিচ্ছে যে তাঁর প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের দিকে, পরিণতির সম্ভাবনা তাতে ছিলো না ?

উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হতে হয় আমাদের ; রবীন্দ্রনাথ আয়তনে এমনই সার্বভৌম যে তাঁর সম্পর্কে যে-কোনো বিষয়েই মনস্থির করা দুরূহ। এই যাকে বলছি সমকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনীহা, আমরা কি নিঃসংশয়ে ধরে নিতে পারি যে সেটা তাঁর ছদ্মবেশ নয় ? অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পশ্চিমের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিলো উভমুখী ; একদিকে প্রবল আকর্ষণ, অন্য দিকে অবমানিত পরাধীন স্বজাতির জন্য তীব্র বেদনাবোধ। যেমন পরিণত বয়সে বিলেতি বেশবাস ধারণ করতে তাঁর স্বমর্যাদাবোধ এতদূর পর্যন্ত আহত হয়েছে যে তার বদলে তিনি রচনা করে নিয়েছিলেন এক বিচিত্র পরিচ্ছদ, যা আধুনিক কালে পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রচলিত নেই, এবং যা এক ও অনন্য রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই অব্যবহার্য—তেমনি তাঁর রচনার মধ্যেও পশ্চিমপ্রীতি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি, যেহেতু ভারতের বর্তমান শোষক ও উৎপীড়কগণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী।* তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপির পাতায়-পাতায় এই সচেতন বিমুখতার আমরা প্রমাণ পাই। ফরাশি বিপ্লবের পরবর্তী যে-প্রতীচীতে দেখা দিয়েছিলো ধর্মীয় সহনশীলতা, গণতন্ত্র ও সর্বমানবের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি, তার প্রতি কখনো-কখনো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না-করা যদিও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, তবু ঐ দিনলিপিগুলিতে তিনি অবিরলভাবে ব্যক্ত করেছেন পাশ্চাত্ত্য দ্রুতি ও ব্যস্ততার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নিরন্তর ইচ্ছা করেছেন তাঁর বাংলার অখ্যাত নিস্তরঙ্গ গৃহকোণে ফিরে যেতে। 'কী ভালো হতো—যদি বিদেশীরা ভারতবর্ষের সন্ধানই না পেতো কখনো!'—এই রকম একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাও একবার তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যদি তা-ই হতো, যদি বিদেশীরা না-আসতো, তাহলে আমাদের আকাশে রবীন্দ্রনাথ নামক জ্যোতিষ্কেরও

---

* একবার, শুধু একবার এর ব্যতিক্রম ঘটেছিলো ; সেই ব্যতিক্রম আশ্চর্য, অর্থময় ও অবিস্মরণীয়। অসহযোগ আন্দোলনে নিখিলভারত যখন প্লাবিত, যখন প্রতীচ্য সভ্যতার 'শয়তানধর্মিতা'র সূত্র নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন, তখন, মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে, স্বদেশের উত্তাল লোকমতের বিরুদ্ধে, অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের যুক্তি ও ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র অগ্রাহ্য করে, নির্ভীক, নিষ্কুণ্ঠ, অবিচল ও অবিরলভাবে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছিলেন প্রতীচীর সঙ্গে মিলনের মন্ত্র। একে তখন 'দেশদ্রোহ' বলে নিন্দা করা অসম্ভব ছিলো না, কিন্তু অবশেষে মহাত্মা গান্ধী যে-প্রবন্ধটিতে এই 'স্বপ্নবিলাসী' উড্ডীন কবিকে নমস্কার জানালেন, সেই 'The Sentinel on the Watchtower'ও অবিস্মরণীয়।

উদয় হতো না। আর তিনি তা নিজে জানতেন না তাও নয়।

প্রচ্ছদ সরিয়ে তাকালে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এক জীবনব্যাপী সংগ্রাম চলছে ; একদিকে তিনি কবি, অন্য দিকে নব্যভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র ; একদিকে শিল্পী ও মরমী, অন্যদিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক ; একদিকে সৌন্দর্যপ্রেমিক, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের সক্রিয় ও প্রতিশ্রুত শত্রু। ভারতীয় ইতিহাসের যে-লগ্নে তিনি জন্মেছিলেন, তাতে একাধারে এই দুই দায়িত্ব স্বীকার না-করে তাঁর উপায় ছিলো না—এই কথাটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারি, কেন তাঁর জীবন ও সাহিত্য এমন অদ্ভুত স্ববিরোধে আক্রান্ত। যাকে আজকাল আমরা আর্ট বলি, তার ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকে স্পষ্ট হয়নি ; আমাদের সে-কালের মনীষীরা, ইংরেজ-ফরাশি যুক্তিবাদ ও উপযোগবাদের প্রভাবে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে বুঝেছিলেন লোকশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন ; এবং রবীন্দ্রনাথ—যাঁর অর্ধেক আয়ুষ্কাল উনিশ শতকের অন্তর্ভূত, তাঁর পক্ষে সেই ঐতিহ্য-রক্ষা অনিবারণীয় ছিলো। তবে বঙ্কিমের মতো লেখকের চরিত্রে আমরা অন্ততপক্ষে অখণ্ডতা দেখতে পাই, অর্থাৎ, মনোরঞ্জনজনিত লোকশিক্ষার সূত্রকে তিনি সর্বান্তঃকরণে মানতে পেরেছিলেন : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই অন্য এক আদর্শের সন্ধান পেয়ে, সারা জীবনে তার আহ্বান ভুলতে পারেননি। ফলত, তাঁর রচনাস্রোত দুই ভিন্ন ধারায় নিঃসৃত হয়েছিলো : তার একটিকে আমরা বলতে পারি পোশাকি, সরকারি, গণসম্মত, অন্যটি তাঁর আপন ও গোপন, তাঁর অন্তঃসার। 'রবীন্দ্রনাথ' বলতে যে-ধারণাটি ধীরে-ধীরে লোকচিত্তে গড়ে উঠেছিলো, তার সঙ্গে বাইরের দিক থেকে নিজেকে তিনি আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন : সেখানে তিনি সুস্মিত ও করুণাশীল ঋষি, ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে লালিত, শিব ও শান্তির প্রবক্তা। কিন্তু ভিতরের দিকে তিনি অস্থির ও সংরক্ত, সেখানে অন্ধকারে ঢেউ তুলছে বেদনা, দিগন্তেও নিশ্চয়তা নেই —অর্থাৎ অন্য দিকে তাঁকে 'য়োরোপীয়' বললে ভুল হয় না, ভুল হয় না উনিশ-শতকী রোমান্টিকতার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ বলে ভাবলে। যেমন পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিবিড়, তেমনি এও সত্য যে তাঁর কোনো-কোনো কাব্যের অপূর্বতা বাংলার অথবা ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করে গেছে। বেশি আর কথা কী, শুধু 'মানসী'র কথা চিন্তা করলেই আমরা তাঁর অভারতীয় নূতনত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এই কাব্যগ্রন্থ—যাকে বলতে পারি তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি অণুবিশ্ব— প্রাক্-রবীন্দ্র সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার সঙ্গে তুলনীয় আমরা কিছুই পাবো না ; ঐ গ্রন্থে, এবং প্রথম ঐ গ্রন্থে, উচ্চারিত হলো বিশ্ববিষাদ, অকারণ বেদনা, বেদনাময় পুলক, ব্যক্তিগত ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার রহস্য এবং এই সবই, আমরা জানি, আধুনিককালে য়োরোপে উদ্ভূত হয়ে আজকের দিনে আমাদের

চৈতন্যের অন্তর্ভূত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরতম সত্তা যে-সব কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিও এমন আপাতপ্রসন্ন, এমন প্রতারকরূপে সরল, যে আমরা অনেক সময় তাদের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারি না।

একবার, কোনো-এক আনুষ্ঠানিক উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পশ্চিমী সাহিত্যপাঠের একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। দান্তে ও গ্যেটে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভাষান্তরিত কাব্য বিষয়ে অরুচি, ভাষাশিক্ষায় চেষ্টাহীনতার ফলে, অগ্রসর হতে পারলেন না। এক জর্মান মহিলার সহযোগে কিছু হাইনে পড়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই ধৈর্য অবসিত হলো। শেক্সপিয়র পড়ে থাকলেও, সন্তুষ্ট হননি। 'জীবনস্মৃতি'র সেই অংশ স্মর্তব্য, যেখানে ওথেলোর 'ঈর্ষানল' ও লিয়রের 'অক্ষম পরিতাপে'র উল্লেখ করে তিনি বলছেন যে তাঁর যৌবনকালীন বাঙালিরা ইংরেজি সাহিত্যে যা পেয়েছিলো তা 'খাদ্য' নয়, 'মাদক' ; উপরন্তু, শেক্সপিরীয় ধরনে মানবস্বভাবের তলাকার 'পাঁক' উন্মথিত করা 'সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষ্যে'র অনুগামী কিনা, সে-বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। য়োরোপীয় সাহিত্যের যে-সব অংশে 'সংযমের সাধনা' পরিস্ফুট হয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয়সাধনের পরামর্শে উক্ত অংশের সমাপ্তি।

অর্থাৎ, তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই রোমান্টিকতার বিরোধী, যা তাঁর সমকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের বিশিষ্টতম চরিত্রলক্ষণ। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের ঘোষণা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, কিন্তু দেখা যাক তাঁর সাহিত্যকৃতি কী-রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর প্রথম যৌবনের অন্যতম প্রবন্ধের নাম "গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ", এবং হাইনের সঙ্গে 'ক্ষণিকা'র সম্পর্ক হয়তো একেবারে কাল্পনিক নয়, যদিও সেই চপলমতি প্যারিসপ্রেমিক জর্মান য়িহুদিকে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়। শেক্সপিয়রের পক্ষপাতী নন রবীন্দ্রনাথ ; অথচ 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা'য় শেক্সপিরীয় কমেডির বহু কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন, এবং 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র অমিত্রাক্ষরকেও বলা যায় 'শেক্সপিরীয়', অন্ততপক্ষে মিল্টন-মধুসূদনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। যে-কারণে ইংরেজি সাহিত্য তাঁর প্রকাশ্য অনুমোদন পেলে না, সেই 'হৃদয়াবেগের প্রবলতা'র দ্বারা তাঁরই বহু বিখ্যাত কবিতা অধিকৃত। শেষ জীবনে দান্তের যে-প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন, তাতে একটি কৃশ, ম্লান ইটালিয়ান মুখে আমরা যাঁকে দেখতে পাই তিনি 'নরকে'র কবি, 'দ্যুলোকে'র নন। এবং নিজের যে-সব প্রতিকৃতি তিনি চিত্রিত করে গেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত না-হয়ে উপায় থাকে না আমাদের ; যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের ও জগতের পরিচিত, তাঁর কোনো লক্ষণ সেখানে নেই, কোনো চিহ্ন নেই শান্তি বা সৌম্যতার ; সেখানে এক দুঃখী মানুষের মুখ কোনো-এক শঙ্কাময় অজানার আভাস দিচ্ছে। আমরা কি বলতে পারি না যে এই ছবিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 'ধরা পড়ে'

যান ?—আমাদের মনে পড়ে যায় দেবতাপ্রতিম গ্যেটের অন্তিম ও ভীষণ স্বীকারোক্তি : 'জীবনে একদিনের জন্য আমি সুখী হতে পারিনি।'

বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে যে বৃদ্ধবয়সে ছবি আঁকতে হলো, তা এইজন্যেই ; তাঁর সত্তার যে-অংশটিকে তাঁর অতিপ্রজ লেখনী সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি, তার জন্য একটি নির্গমনপথ সায়াহ্নকালে তিনি রচনা করে নিলেন। বুদ্ধিনির্ভর ভাষার দ্বারা যা বলা গেলো না, তা প্রকাশ করলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রেখাবর্ণের বিন্যাস ঘটিয়ে ; যেন এক দুঃসহ তাপ নিবারণের জন্য শরণ নিলেন সেই শিল্পের, যা তর্ক করে না, শুধু তাকিয়ে থাকে। তাই মনে হয় আমাদের, যখন লক্ষ করি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদিও 'সুন্দর', অর্থাৎ সুষম ও মসৃণ, অমিত রায়ের ভাষায় 'গোল বা তরঙ্গরেখা'র ধরনে, তাঁর ছবিতে ভিড় করে আসে 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা', 'খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা', 'কাঁটার মতো' ; অদ্ভুত ও বিকৃত মুখের মেলা বসে গেছে সেখানে, ভেসে উঠেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, স্বপ্ন থেকে ছেঁকে-তোলা অতিপ্রাকৃত ভূদৃশ্য, বর্ণলেপনে যেন শোণিতের রক্তিমা উপচে পড়ছে। অঙ্কনবিদ্যায় অপটুতার জন্যই ছবিগুলিতে এই বিকৃতি ঘটেছে, এমন একটি মত উপস্থিত করা অসম্ভব নয় ; কিন্তু পটুতা বা অপটুতা তাঁর যতটাই থাক, তিনি কেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'ওরিয়েন্টাল স্কুল'-এর অনুগামী হলেন না, এই প্রশ্নটি বাকি থেকে যায়। এ-কথা আমরা মানতে বাধ্য যে স্বীয় পরিবার- বা গোষ্ঠীভুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর ধরনে ছবি আঁকার কোনো চেষ্টা অথবা ইচ্ছে আমরা রবীন্দ্রনাথে খুঁজে পাই না ; একমাত্র য়োরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে।*

এমনও নয় যে ছবিতে তাঁর যে-অংশটি ব্যক্ত হয়েছে, কবিতায় তা একেবারেই প্রচ্ছন্ন। বরং বলা যায় যে ছবিতে যা প্রত্যক্ষ, কবিতায় তা অন্তর্লীনভাবে আবহমান। তাঁর যে-সব কবিতা অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে জনপ্রিয়, তাদের বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য ; কিন্তু তাঁর কবিতা যেখানে শুধুই কবিতা (এবং 'গীতাঞ্জলি'কেও তার অন্তর্ভূত করতে চাই), সেখানে ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের মায়াজালের অন্তরালে আমরা অনুভব করি এক বিরামহীন দ্বন্দ্ব ও বেদনা, এক নামহীন তিমিরক্ষরণের সংস্পর্শ ;—সে-সব

---

* এই প্রবন্ধ লেখার প্রায় এক বছর পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আমার চোখে পড়লো : 'আমি যে শতকরা একশো হারে বাঙালী নই—আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটিরই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।'—শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, নম্বর ১৭৪, তারিখ ১৮ অগস্ট, ১৯৩০, 'দেশ', ২৪ জুন, ১৯৬১। 'কবিতা'র রবীন্দ্র-সংখ্যায় যামিনী রায়ও বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের ছবি য়োরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা।

কবিতা স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথকে সেই সব পশ্চিমী কবিদেরই পাশে বসাতে ইচ্ছে করে, যাঁদের তিনি সরকারিভাবে 'অপছন্দ' করেছিলেন, অথবা কখনো যাঁদের নাম উচ্চারণ করেননি। আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছি না যে পশ্চিমী কবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো, এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই আমার ; কিন্তু কথাটা এই যে ছাত্র বা অধ্যাপকের ধরনে 'ঘনিষ্ঠ' পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনই তাঁর ছিলো না। তাঁর যৌবনের বাতাসে ছিলো রোমান্টিকতা ; তিনি, প্রতিভাবান, তাঁর কবিসত্তার শিকড় পর্যন্ত সেটা শোষণ করে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এক কবির উপর অন্য কবির যে-প্রভাব ঘটে, সেটা অধ্যয়নের ব্যাপার নয়, অতি লঘু ও ক্ষণিক পরিচয়ের ফলেও সেটা সম্ভব হতে পারে। শেক্সপিয়র, শুধু জনরব শুনে, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য পুরাকালকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। আমরা কি জানি যে আধুনিক প্রতীচী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ অভিঘাত ঘটেনি ? তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তাঁর দ্বারা নিন্দিত বা অনুল্লিখিত কবিরা কোনো অংশ নেননি, এমন কথা ধরে নেবার অধিকার আমরা কিছুতেই দিতে পারি না নিজেদের। আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে তাঁর যৌবনকালে ফরাশি দেশের যে-সব কবিরা কাব্যকলাকে নতুন করে তুলছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সম্পর্করহিত। সেই তরুণ ও নতুন কবিদের কোনো লেখাই কি পড়েননি তিনি ? হয়তো অনুবাদে, হয়তো আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে, হয়তো কোনো সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির সূত্রে—কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায় ? আমরা তো জানি যে প্রতিভার প্রজ্জ্বলনের পক্ষে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট ; অন্ততপক্ষে, তাঁর "নিরুদ্দেশ যাত্রা" দুটি ফরাশি কবিতার সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, যদি তিনি বোদলেয়ারের "ভ্রমণ" বা র‍্যাঁবোর "মাতাল তরণী" নাও পড়ে থাকেন, তবু মানতেই হবে যে "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় এমন-কিছু আছে যা তাঁর দ্বারা প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত কোনো ভারতীয় কাব্যে আমরা খুঁজে পাবো না। উপরন্তু স্মর্তব্য যে ঐ কবিতায় তরণীটি পশ্চিমগামী ও রহস্যময়ী নায়িকাটি বিদেশিনী। স্বদেশীয় ঐতিহ্যের কাছে ঋণগ্রহণে ও ঋণস্বীকারে রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর মুখর ছিলেন, কিন্তু যদি বলি যে "নিরুদ্দেশ যাত্রা"য় প্রতীচীর কাছে তাঁর ও বাংলা কবিতার ঋণের একটি অবগুণ্ঠিত স্বীকৃতি তিনি রেখে গেছেন তাহলে কি বড্ড বেশি বলা হবে ?*

১৯৬০

---

* 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

দুই রবীন্দ্রনাথ : আসলে এক

মুহূর্তে সব কাজ থেমে গেলো : কলকাতা উপচে পড়লো রাস্তায়। স্কুল-কলেজ শূন্য, স্তব্ধতা নামলো বড়োবাজারে, রাজকার্য অর্থহীন হয়ে গেলো। উকিলের শামলা, পাদ্রির আলখাল্লা, হলুদ আর গেরুয়া রঙের উত্তরীয় ; রাশি-রাশি কালো বাঙালি চুলের ফাঁকে-ফাঁকে গোল টুপি, বাঁকা টুপি, পাগড়ি : কেউ চলছে, কেউ ছুটছে, কেউ-বা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। কেষ্টবিষ্টুরা চুনোপুঁটি হয়ে গেলেন, চুনোপুঁটিরা সংখ্যায় বেড়ে চললো। অচল হলো নাগরিক চক্রযান ; মাইলের পর মাইল হাঁটছে লোকেরা, গঙ্গায় নৌকো ভাড়া নিচ্ছে অনেকে ; বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে না। আকাশ নীল, রৌদ্রময় অপরাহ্ণ ; যেন এক অবিশ্বাস্য উৎসবে কলকাতা উত্তাল। কিন্তু ব্যাপারটা কী ? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছে ; আর তা-ই ওরা এমন দিশেহারা—ঐ যারা মস্ত লোক আর যারা কিছুই-না—সকলেই বিমূঢ়, হতবুদ্ধি—কোথায় যাবে, কী করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

এমন নয় যে অকালমৃত্যু। এমন নয় যে অপ্রত্যাশিত। এমন নয় যে উত্তরাধিকার চিরন্তনে পৌঁছবে না। তবু, সেই মুহূর্তে, কঠিন মাটি ফেটে গিয়ে গহ্বর খুলে গেলো। 'কী ? রবীন্দ্রনাথ নেই ? এ কি সম্ভব ? তাহলে আমাদের দুঃখের দিনে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো আমরা ? কে আমাদের ভালোবাসবেন, শাসন করবেন ? কাকে আমরা উত্ত্যক্ত করবো সেই সব তুচ্ছ দাবি নিয়ে, যা শুধু তাঁরই হাতে রত্ন হয়ে উঠতো ? স্বদেশের সংকটের সময় কে আমাদের উপদেশ দেবেন ? তর্কযুদ্ধ মিটিয়ে দেবেন কে ? জগৎটাকে এনে দেবেন আমাদের দরজায় ? আমাদের নবজাত সন্ততির নামকরণ করবেন ? আমাদের জীবনে ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্পণ করবেন শ্রী ও মর্যাদা ?' সেদিন, ১৯৪১-এর সাতুই অগস্ট তারিখে এ-সবই ছিলো তাদের মনের কথা, যারা অসংখ্য ও অসাহিত্যিক, কবিতায় আসক্ত যাদের বলা যায় না, যাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সম্পর্ক এই যে তারা তাঁর স্বদেশবাসী।

সব পেশার, সব ধরনের মানুষ একজন কবির মৃত্যুকে ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে অনুভব করলে, এটা সম্ভব হলো কেমন করে ? এর কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসে অন্যতম বিস্ময়। আকারে ও বিস্তারে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় কবি আর একজন মাত্র

আছেন : তিনি গ্যেটে, আধুনিক জর্মান সংস্কৃতির স্রষ্টা। সামগ্রিকভাবে স্বজাতির জন্য এই দু-জন যা-কিছু করেছেন তা স্মরণে রেখে এঁদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা সম্ভব, কিন্তু একই ধরনে প্রতিপত্তিশালী কোনো তৃতীয় কবিকে মনে আনা সহজ নয়। পাউন্ড বলেছিলেন : 'Tagore sang Bengal into a nation' ; এ যদি অত্যুক্তি হয়, তবু এ-কথা সত্য যে এক প্রাচীন সভ্যতা যখন ভগ্নস্তূপ থেকে নতুন উদ্যমে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রচনা করেছিলেন সেই নবজন্মের এক অবিকল চিত্রকল্পরূপে, যা ভারতের পক্ষে মান্য আর বাংলার পক্ষে দৈনিক ব্যবহারের সামগ্রী। যেন গান গেয়ে-গেয়ে নিজেকেই তিনি সঞ্চারিত করলেন মানুষের হৃদয়ে, বাদানুবাদে খুঁড়ে-খুঁড়ে মনের তলায় পথ করে নিলেন। এই স্বপ্নালস কবি, মেঘের ও অজানার প্রেমিক, তিনিই আবার গদ্যে এক মহাবল পুরুষ ; মিল ও ধ্বনিমাধুরীর এই জাদুকর সাময়িক বিষয়ে মন্তব্যপ্রকাশেও ক্লান্তিহীন। যাকে আজকাল আমরা সাংবাদিকতা বলি তা যে কত উঁচুতে উঠতে পারে, তারও অন্যতম চরম উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। জীবৎকালে এমন কোনো প্রসঙ্গ নেই—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, বিমূর্ত বা সাংসারিক—যা নিয়ে তিনি আলোচনা করেননি ;আর যে-কোনো বিষয়ে দৃষ্টি তাঁর স্বচ্ছ, ব্যাখ্যা সতেজ ও প্রাঞ্জল, ভাষা ঋদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে যেন তাঁকে ভাঙিয়েই বেঁচে ছিলো লোকেরা, তিনি তাদের মানসজীবিকা জুগিয়ে যাচ্ছেন। অসম্ভব ছিলো তাঁর দ্বারা কোনো-না-কোনোভাবে সংক্রমিত না-হওয়া—বিশেষত তাদের পক্ষে, যারা তাঁর ভাষায় কথা বলে, অথবা তা পড়তে পারে। প্রবীণ রাজনৈতিকের তাঁকে ততটাই প্রয়োজন, যতটা কোনো তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীর। যাঁরা 'কবিতা-টবিতার ধার ধারেন না' তাঁদের পক্ষে তাঁর গদ্য অনতিক্রম্য।

এই যে অন্য রবীন্দ্রনাথ, আলোচনাধর্মী রচনায় যাঁকে পাওয়া যায়, 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান'-এর* উদ্দেশ্য তাঁরই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য পাঠকের পরিচয়সাধন। বইখানার নামকরণ সুষ্ঠু হয়েছে, কেননা 'বিশ্বমানব' বলতে রেনেসাঁসের ইটালিতে যা বোঝাতো, রবীন্দ্রনাথ সত্যই তা-ই ছিলেন, সেই ভাস্বর বংশের তিনিই হয়তো শেষ পুরুষ। মানুষের মূল্য তার নিজেরই মধ্যে, মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশেই তার ধর্মসাধন—এটাকে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বাস' বললে ভুল বলা হবে, এটা তাঁর সহজ উপলব্ধি, তাঁর চেষ্টাহীন স্বজ্ঞার স্বীকৃতি। যা-কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা সবই তাঁর আগ্রহের বিষয়, আর তাই তাঁর জগৎ থেকে ভগবান বাদ পড়েননি। ধর্ম ও 'মানবিক বিদ্যা'র মধ্যে যে-বিভেদ আজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁর কাছে তার অস্তিত্বই ছিলো না ; তাঁর সব চিন্তাকে স্পর্শ করে আছে বৈষ্ণব কবিদের

---

* *Towards Universal Man* : Rabindranath Tagore. Edited by Bhabani Bhattacharya.

এই উত্তরাধিকার— এক অবিরল অনুভূতি যে ভগবান যেমন মানুষের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি ভগবানের পক্ষেও মানুষ, একের অভাবে অন্যের পূর্ণতা নেই। যাকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের 'দর্শন', বা তত্ত্বের দিক, তার মর্মকথা হলো এই। অথচ যা না-থাকলে অনাবিল বুদ্ধি এ-যুগে সম্ভব নয়, সেই সংশয়েও তাঁর যথাস্থানে স্বীকৃতি ছিলো ; এই ঈশ্বরপ্রেমিক তাঁর স্বদেশবাসীকে ভলতেয়ারীয় বিদ্রূপ শোনাতে দ্বিধা করেননি। তাঁর মৌলিক অস্তিবাদের সঙ্গে বুদ্ধিজাত সংশয়কে তিনি কী-ভাবে সংশ্লিষ্ট করেছিলেন, এই পুস্তকের আঠারোটি প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে। সংশ্লেষ : রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মূলসূত্রই তা-ই ; জগৎ ও ঈশ্বরের, মানুষের শ্রম ও সৌন্দর্যের, প্রাচী ও প্রতীচীর সংশ্লেষ। 'গীতাঞ্জলি'তে যা উহ্য থেকেও অব্যক্ত নেই, এখানে তা স্পষ্ট হয়ে উপরের স্তরে উঠে এসেছে ; রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে দশকের পর দশক পেরিয়ে চলেছেন, অনেক কালের পুরোনো ভূত ভাগিয়ে দিয়ে, আরো পুরোনো উপনিষদের ছাই-চাপা আগুনে ফুঁ দিয়ে, অন্য দূর উপকূলের নতুন সুর আপন করে নিচ্ছেন। কেমন করে ধাপে-ধাপে এগিয়ে, অনেক উক্তি, পুনরুক্তি, পরিশোধন ও অন্তর্দর্শনের ফলে, তিনি ভারতবর্ষকে আধুনিক জগতের অংশ করে তুললেন, আর নিজেকে, উভয়েরই এক শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি— এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বিবরণ পুস্তকটির কিঞ্চিদধিক তিনশো পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে।

প্রবন্ধগুলির বিষয় ? ইতিহাস, রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ, ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বপীড়া। অধিকাংশেরই আদি রচনার উপলক্ষ ছিলো কোনো সভাস্থলে বক্তৃতা বা দেশের মধ্যে কোনো আদর্শগত সংঘাত। তবু, এখানে যা পাওয়া যাচ্ছে তা কতগুলো মতামতের সমষ্টিমাত্র নয়, এমনকি নির্বস্তুক অর্থে ধারণাও এদের বলা যায় না। যিনি লিখতে-লিখতে ভাবেন, আর যাঁর চিন্তার উৎস তাঁর অনুভূতি—বা আদি অর্থে বেদনা, শুধু তাঁর পক্ষেই এ-ধরনের প্রবন্ধ লেখা সম্ভব। অনুভূত, বেদনাবিদ্ধ চিন্তা, ভাবনার দ্বারা শমিত ও ঘনীভূত সংরাগ, আর, অবশেষে, পাঠকের মনে এমন এক নির্মলতার সঞ্চার, যার নিজের বেশি আর-কিছু দেবার নেই : আলোচনার বিষয় যা-ই হোক না, এই লক্ষণগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের চারিত্র। সেইজন্যেই তাঁর প্রবন্ধ উপলক্ষকে অতিক্রম করে যায় ; কোনো বিশেষ দেশ ও কালের বিশেষভাবে বাস্তব কোনো সমস্যা থেকে উত্থিত হয়েও, দেশান্তরে ও কালান্তরে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা এরা ধারণ করে।

আমি 'অন্য রবীন্দ্রনাথে'র উল্লেখ করেছি, যেন তাঁর কবিসত্তা থেকে প্রবন্ধকারকে আলাদা করে নেয়া যায়। আসল ব্যাপারটা তা নয় কিন্তু। রবীন্দ্রনাথ এত বেশি পরিমাণে কবি ছিলেন যে কোনো সময়েই অন্য কিছু হওয়া সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে ; কবিতাই তাঁর সত্তাসার বা তন্মাত্র, আর গদ্য সেই কবিতার গুণেই প্রাণবন্ত। আমরা যারা বাংলায়

তাঁকে পড়ি, আমাদের কাছে এটা পুরোনো কথা যে তাঁর কবিতা যেমন মায়াবী তাঁর গদ্যও প্রায় তা-ই, আর এই গুণটিকে ইংরেজি অনুবাদে উত্তীর্ণ করা দুঃসাধ্য হলেও, 'এ টেগোর রীডার'-এ* তাঁর গদ্য-পদ্যের প্রতিবেশিতায় আন্তর্যোগের আভাস পাওয়া যায়। আমি প্রথমেই অমিয় চক্রবর্তীকে সাধুবাদ জানাই এইজন্যে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত প্রায় সবগুলি সাহিত্যরূপের নমুনা দিয়েছেন ; কেননা বাংলার বাইরে তাঁর চিঠিপত্র ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত। পুস্তকটির প্রায় অর্ধাংশ প্রতীচীতে পূর্বপ্রকাশিত, অবশিষ্ট বিদেশীর পক্ষে নতুন, আর তা থেকে পত্র, ভ্রমণপঞ্জি ও আলাপ-আলোচনা বাদ পড়েনি।

যেহেতু রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে উপস্থিত করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য, তাই কোনো-কোনো রচনার অভাব আমি অনুভব না-করে পারছি না। "শকুন্তলা"—সেই মহৎ প্রবন্ধ তাঁর, যাতে শকুন্তলা ও মিরান্ডা চরিত্রের তুলনা আছে, এটি বিশেষভাবে প্রতীচীর ভোগ্য হতো এইজন্যে যে সেখানে যাকে রোমান্টিক ও ক্লাসিক মানস বলা হয়, তারই এক অপূর্ব বিশ্লেষণ এতে সাধিত হয়েছে। আলাপের অংশে কি দেয়া যেতো না সেই সব অন্তরঙ্গ ঘরোয়া কথার উদাহরণ, যা গম্ভীর নয়, জ্ঞানগর্ভ নয়, কিন্তু হাসিঠাট্টার মনস্বিতায় উজ্জ্বল ? আর-এক কথা : ভ্রমণপঞ্জির অংশগুলিকে বড়ো বেশি খণ্ডিত মনে হয়, যেন যথোচিত পরিসর না-পেয়ে তারা ম্লান হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে বড়ো মাপের গদ্যশিল্পী, অর্থাৎ তাঁর রচনা যে স্বভাবতই সবিস্তার ও উচ্ছল, এটা কিছু নতুন কথা নয় ; সেই প্রসার ও গতিবেগের কিছু নিদর্শন অনুবাদেও অপরিহার্য বলা যায়। 'Poems Old and New' বিভাগটি, আমার মনে হয়, পুস্তকের সবচেয়ে ক্ষীণবল অংশ ; কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজে, বা অন্যেরা, তাঁর কবিতার অনুবাদকালে মূল রূপকল্পের অনুকরণ করেননি, হয়তো তা সম্ভবও ছিলো না তাঁদের পক্ষে : আর ছন্দোবদ্ধ গীতিকবিতার গদ্য অনুবাদ—বিশেষ অবস্থায় ও সময়ে একবার 'গীতাঞ্জলি'তে কৃতী হয়ে থাকলেও, নিয়ম হিশেবে স্বীকার্য হতে পারে না। প্রতীচীতে, আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের অবক্ষয়ের প্রধান কারণই এই যে তাঁর বাংলা কবিতা, ছন্দ, মিল ও স্তবকসজ্জার কারুকর্ম থেকে স্খলিত হয়ে, যে-ধরনের একটানা ও একঘেয়ে ইংরেজি গদ্যে পরম্পর প্রকাশিত হয়েছিলো, তাতে তার শিল্পরূপের আভাসমাত্র ধরা পড়েনি। আমরা ব্যথিত হই, কিন্তু অবাক হতে পারি না, যখন দেখি যে 'গীতাঞ্জলি'র উত্তেজনা প্রশমিত হবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ইংরেজ বন্ধুরাও তাঁর বিষয়ে নিস্পৃহ হয়ে পড়ছেন, আর সাধারণভাবে প্রতীচীতে এই ধারণা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ

---

* *A Tagore Reader*, edited by Amiya Chakravarty.

ঠাকুর একজন ব্যক্তি হিশেবে মহৎ হলেও কবিতায় তাঁর আর-কিছু দেবার নেই। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য শিল্পিতা বিষয়ে যে কিছুই জানে না, সে রবীন্দ্রনাথের অল্পই জানে। বিশ্বমিলনের মন্ত্র নয়, মানবধর্ম ও ভেদভঞ্জনের বাণীও নয়—রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদি জগতের পক্ষে সত্যই আজ প্রয়োজনীয় হয়, তাহলে তাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে না-নিলে চলবে না ; অর্থাৎ, অনুবাদের ভাষা যাঁদের মাতৃভাষা, এবং যাঁরা আপন ভাষায় কবিতা রচনায় দক্ষ, এমন লোকেরা তাঁর কাব্যের নতুন অনুবাদ প্রণয়ন করলে তবেই জানা যাবে তিনি কতখানি ও কোন ধরনের কবি।

অবশ্য আমি এ-বিষয়ে সচেতন যে ইংরেজিভাষী পাঠকের জন্য সংকলিত কোনো রবীন্দ্র-প্রবেশিকা এ-মুহূর্তে এর চেয়ে ভালো হতে পারতো না ; 'এ টেগোর রীডার'-এর প্রকাশ যে সম্ভব হলো সেটাই আনন্দের কথা, এবং আমেরিকায় ও ইংলন্ডে এর কাগজ-মলাট সংস্করণ বেরোলে তার অভিঘাত উপেক্ষণীয় হবে না। আমি যেগুলোকে বইয়ের 'অভাব' বলে উল্লেখ করেছি, কে জানে হয়তো প্রকাশকের কার্পণ্যই সে-জন্য দায়ী ; পৃষ্ঠাসংখ্যা আরো বেশি হলে সম্পাদকেরও স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যেতো। আজকের দিনের পাশ্চাত্ত্য পাঠক—যিনি হয়তো রবীন্দ্রনাথের নামও শোনেননি বা নামমাত্র শুনেছেন—তিনি 'এ টেগোর রীডার' ও 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান' মিলিয়ে পড়লে রবীন্দ্রনাথকে যেটুকু পাবেন তাতে তাঁর উৎসাহ জেগে উঠবে বলে আশা হয় ; উভয় গ্রন্থেই উপকারী টীকা আছে ; শেষোক্ত বইটিতে শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবিরের ভূমিকাটি প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কাটাতে সাহায্য করবে। কিন্তু একটি বিষয়ে আক্ষেপ আমার গভীর ; সেটি এই যে অমিয় চক্রবর্তী, তাঁর সম্পাদিত পুস্তকে, শুধু তথ্যগত টীকা পরিবেশন করেছেন ; রবীন্দ্রনাথ, ও সাধারণভাবে সাহিত্য বিষয়ে, তাঁর জীবনসঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যদি একটি পূর্ণাঙ্গ ও সাহিত্যিক ভূমিকা যোগ করে দিতেন, তাহলে বইখানার মূল্য বিপুলভাবে বেড়ে যেতো। এর প্রয়োজন আরো বেশি ছিলো এইজন্যে যে অনুবাদ যেখানে যথাযথ হলেও যথাযোগ্য নাও হতে পারে, সেখানে অন্য ভাষার পাঠকের কাছে কোনো কবিকে উপস্থিত করার একটা ভালো উপায় হলো তাঁর বিষয়ে সংবেদনশীল ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা।

আমি বুঝতে পারলাম না, 'টর্ডস য়ুনিভার্সেল ম্যান'-এ প্রতি প্রবন্ধের অনুবাদকের নাম কেন স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত নেই, আর কেনই বা নামপত্রে এই জরুরি তথ্যটি বিজ্ঞাপিত হয়নি যে রচনাগুলি সবই মূল বাংলা থেকে অনূদিত। সমস্ত অনুবাদগ্রন্থেই এই নিয়ম স্বীকৃত হয়ে থাকে ; ম্যাকমিলান-প্রকাশিত 'দি কালেক্টেড পোয়েমস অ্যাণ্ড প্লেজ় অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' এ-বিষয়ে এক অসাধারণ ব্যতিক্রম, এবং সেই উদাহরণ নিশ্চয়ই অনুকরণযোগ্য নয়। ঐ বহুল-প্রচারিত গ্রন্থে অনুবাদের কোনো স্বীকৃতি নেই বলেই

এক হাস্যকর ও আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে : প্রতীচীতে এমন অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির দেখা পাওয়া যায় যাঁরা রবীন্দ্রনাথ কিছু পড়ে থাকলেও, তিনি কোন ভাষায় লিখেছিলেন তা জানেন না, বা তা জানলেও ধরে নেন যে তাঁর কিছু কবিতা ইংরেজিতেই রচিত হয়েছিলো। যখন দেখা যায় যে স্টিভেন স্পেন্ডারের মতো বিদগ্ধজনও রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজিতে লেখা কবিতা'র উল্লেখ করেন, আর ইঙ্গ-ভারতীয় কবিদের মুখে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হন তাঁদের গোষ্ঠীর আদিপিতা বলে, তখন এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে আজকের দিনে সর্বভারতে ও সর্বজগতে এই কথাটা সবচেয়ে স্পষ্ট করে ও জোরালোভাবে জানানো দরকার যে রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার লেখক ;— যেমন জর্মান ভাষায় গ্যেটে বা রাশিয়ানে পুশকিন, তেমনি বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ। গ্যেটে বা পুশকিন নিজের রচনা পরভাষায় অনুবাদ করেননি—প্রতীচীর কোনো কবির পক্ষে তা কল্পনাতীত ; রবীন্দ্রনাথকে অবস্থাগুণে বা অবস্থাদোষে তা করতে হয়েছিলো, কিন্তু মূল রচনাগুলি বাংলাই, এই কথাটি কখনো ভুললে চলবে না।

আজ, তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে, আমরা তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হতে দেখছি। বৃহৎ জগতে তাঁর পুনরুজ্জীবনের কাজটি আরম্ভ করার পক্ষে এর চেয়ে সুসময় আর কী হতে পারে? এই দুটি ইংরেজি গ্রন্থ তারই সূচনারূপে শ্রদ্ধেয়। না-বললেও চলে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল, বহুমুখী, শতরূপী প্রতিভার পরিচয়ের পক্ষে এ-দুটি গ্রন্থ যথেষ্ট নয় ; তাঁর জীবৎকালে ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত অন্যান্য ইংরেজি অনুবাদেও তা পাওয়া যায় না। এই কাজ বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রম ও নিষ্ঠাসাপেক্ষ, আর আসলে তাঁর স্বদেশবাসীরও কর্তব্য নয় এটি। জগৎকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন না বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা রবীন্দ্রনাথের ভাষা শিখে, নিজ-নিজ ভাষায় এমনভাবে নতুন অনুবাদ সৃষ্টি করেন, যাতে বোঝা যাবে মূল রচনার রূপ ও রীতির বৈশিষ্ট্য, প্রকাশ পাবে ছন্দ, মিল, কারুকর্মের চাতুরী, এবং যাতে অনুবাদের ভাষায় সমকালীন জীবন্ত বাগ্‌ধারা অনুসরণ করা হবে। সেই দিনকে সম্ভব করে তোলা বা এগিয়ে আনা—আমরা যারা বাঙালি বা ভারতীয়, আমাদের প্রয়াসের দ্বারা চরম যা সাধিত হতে পারে তা এটুকুই ; কিন্তু যদি আমাদের আশানুরূপ ফললাভ না হয়, তবু আমাদের এই সান্ত্বনা রইলো যে তাতে জগতেরই ক্ষতি, আমাদের নয়।

১৯৬১

বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : 'মানসী'

কবিতার দুই মৌলিক উপাদান ভাব ও ভাষা, এ-কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। মানতেই হবে, কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে সত্য ; অর্থাৎ কবিতা লিখতে হলে কিছু বক্তব্য চাই এবং চাই এমন ভাষা যা সেই বক্তব্যের সার্থক বাহন হতে পারে। কিন্তু ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ কী, তা নিয়ে ভাবতে আরম্ভ করলে দেড় মিনিট পরেই আর কূল পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে ওঠে এই কারণে যে 'ভাব' কথাটা অত্যন্ত অস্পষ্ট, এবং ভাষা বলতেও এখানে যা বোঝাচ্ছে তা শুধু ব্যাকরণসম্মত বাক্যপর্যায় নয়, ছন্দ, মিল, ধ্বনিস্পন্দন এবং অন্যান্য কৌশলের দ্বারা রচিত এক রহস্যময় মায়াজাল। মূল প্রশ্নটা এই : জরুরি কোনো বক্তব্য থাকলেই কি ভাষা জোগায়, না কি ভাষা পরাক্রান্ত হলেই বক্তব্য জরুরি হয়ে ওঠে—বা অন্তত পাঠকের তা-ই মনে হয় ? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই অবশ্য : বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের মতো, কবিতার জন্মরহস্যও মানুষের পক্ষে (এবং কবিদের পক্ষেও) অজ্ঞেয়। কবিতা যখন আলোচ্য, তখন আমাদের সকলেরই 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে' ; অর্থাৎ, ঘটনাটা ঘটে যাবার পর আমরা বিবিধ উপায়ে বিস্ময়কর গোয়েন্দাগিরি করতে পারি, পরতে-পরতে বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বা নিজের বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি ভালো ও মন্দ কবিতা, এবং কবিতা ও অ-কবিতায় পার্থক্য কোনখানে। এবং এই অপেক্ষাকৃত গৌণ কাজগুলোই সমালোচনা নামে কথিত ও সম্মানিত।

কবিতাকে আক্রমণ করার অন্য একটা উপায় আছে : তা হলো ইতিহাস। ইতিহাস খামখেয়ালি হলেও তা থেকে অন্তত কয়েকটি নিয়ম বের করে নেয়া যায় না তা নয়। এক : মানুষের মতো কবিতারও আছে বৃদ্ধি ও অবক্ষয় ; দুই : কবিতার পূর্ণ যৌবনশ্রী তখনই দেখা দেয় ভাষা যখন সদ্য পরিণত হয়েছে কিন্তু সুপক্ক হয়নি ; তিন : অবক্ষয় থাকলেও কবিতার মৃত্যু নেই, কেননা যুগে-যুগে সে নবজন্ম লাভ করে থাকে, এবং চার : কবিতার নবজন্ম তখনই সম্ভব হয় যখন কবিরা ভাষাকে দেন নতুন প্রাণ ও ধ্বনিস্পন্দন। ইতিহাসের নজিরগুলোকে সামনে রেখে নির্ভয়ে বলা যায় যে কবিতার বড়ো-বড়ো অধ্যায়গুলোর সঙ্গে ভাষার উন্নতি অথবা পুনরুজ্জীবনের সমাপতন ঘটে

থাকে, এবং এই দুই ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করলে দার্শনিক অর্থে ভ্রম যদি-বা হয়, সেই ভ্রম প্রমাণ করা কোনো দার্শনিকের অসাধ্য।

সাধারণত, সহজীবী কোনো কবিগোষ্ঠীর হাতে ভাষার এই পরিণতি বা পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়ে তাকে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের বাংলা কবিতায় একবার এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু আমরা তো হাড়ে-হাড়ে জানি যে আজকের দিনে বাংলা কবিতার ভাষা বলতে যা-কিছু বোঝায় তার মূল স্রষ্টা কোনো প্লেইয়াদ, এলিজ়াবিথান, রোমান্টিক বা সিম্বলিস্ট কবিগোষ্ঠী নন, একজন মাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পরে নতুন যা হয়েছে সেই নতুন সম্ভব হয়েছে তাঁরই জন্যে ; এবং বাংলা ভাষায় যতদিন পর্যন্ত কবিতা লেখা হবে, তিনিই ভাষার আদি উৎস বলে স্বীকৃত হবেন। পাঠক আমাকে ভুল বুঝবেন না ;—আমি বলতে চাচ্ছি না যে ভবিষ্যতেও রবীন্দ্রনাথের ধ র নে কবিতা লেখা হবে—সেটা অসম্ভব, অথবা শুধু অকবির পক্ষে সম্ভব ; কিংবা আমার এ-কথা বলাও উদ্দেশ্য নয় যে আজকের বা ভবিষ্যতের তরুণ কবিদের রবীন্দ্রনাথে তেমনি করে নিমজ্জিত হতে হবে, যেমন আমরা হয়েছিলুম আমাদের ছেলেবেলায়। আমার বক্তব্য শুধু একটুকু যে রবীন্দ্রনাথ, আমাদের জন্য, এবং সদ্যোজাত ও অজাত উত্তরপুরুষের জন্য, বাংলা কবিতার ভাষাকে সৃষ্টি করে গেছেন ; অর্থাৎ—আমাদের কবিতার ভাষায় যা-কিছু বির্বতন বা পরিবর্তন ঘটবে (বা সম্প্রতি ঘটেছে) তারও পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ হবেন স্মরণীয়। কবিতার ভাষা, যার মানে—আগেই বলেছি—এক রহস্যময় মায়াজাল ; ছন্দ, মিল, ধ্বনিস্পন্দন ; পঙক্তিরচনা, স্তবকরচনা ; এমনকি, খাতার অথবা বইয়ের পৃষ্ঠায় পঙক্তিগুলিকে পরম্পর সাজাবার কৌশল : অর্থাৎ, রূপকল্প—যা জনতার কাছে অর্থহীন এবং কবিদের আরাধ্য, কেননা তারই জন্য কবিতায় আসে গতি, সংহতি, অনুরণন—এই সবই রবীন্দ্রনাথের দান। তাঁর দান : অর্থাৎ ভূমি তাঁর, ভিত্তি তাঁর, বহু বিচিত্র অঙ্গও তাঁর রচনা। আবার বলি : তিনি যে-ভাবে মিল দিয়েছেন বা স্তবক সাজিয়েছেন তা ভবিষ্যতে স্বীকৃত নাও হতে পারে—আজকের দিনেই তা স্বীকৃত হচ্ছে না বলা যায় ; কিন্তু কাকে বলে মিল বা স্তবক, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি কী, অনুপ্রাসের সার্থকতা কতখানি—এ-সব বিষয়ে আমাদের ধারণা আজ পর্যন্ত ভ্রূণাবস্থায় থেকে যেতে পারতো, যদি না রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলি প্রণয়ন করতেন। অর্থাৎ, ভাবীকালের এমন কোনো বাঙালি কবিকে কল্পনা করা অসম্ভব নয়, যিনি রবীন্দ্রনাথ ভালো করে পড়বেন না, বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা যাঁর খারাপ লাগবে, এবং যিনি একেবারেই ভিন্ন ধরনে কবিতা লিখবেন। অথচ এই কবিরও অস্তিত্ব যে সম্ভব হবে, তারও আদি কারণ হবেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের কবিতার ইতিহাসে এই অর্থে তিনি অনতিক্রম্য।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সন্ধ্যাসংগীত' পড়ে তরুণ রবিকে মাল্যদান করেছিলেন। শুধু রসবোধের নয়, বঙ্কিমের উদারতারও প্রমাণ আছে এতে। সত্যই কি 'সন্ধ্যাসংগীত'কে সে-যুগের আদর্শেও অত্যন্ত বেশি ভালো বলা যায়? 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'শৈশব সংগীত'* পর্যন্ত গ্রন্থগুলিতে প্রতিভার অঙ্কুর দেখতে হলে অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির কি প্রয়োজন হতো না? "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নামক 'প্রভাতসংগীতে'র উচ্ছ্বাসটিকে রবীন্দ্রনাথ পরে সংক্ষেপিত ও পরিশীলিত আকারে উপস্থিত না-করলে আজ কি তার প্রথম লেখনের কোনো ভক্ত জুটতো? অথচ এ-সব পুস্তক রবীন্দ্রনাথের একুশ থেকে তেইশ বছরের রচনা : এর চেয়ে কম বয়সে ব্লেক তাঁর 'পোয়েটিকেল স্কেচেস' লিখে উঠেছেন, আর র‍্যাঁবো তাঁর কবিজন্ম শেষ করে অদৃশ্য হয়েছেন দেশান্তরে। এর অর্থ কি এই যে ব্লেক ও র‍্যাঁবোর ব্যক্তিত্ব, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, স্বভাবতই বেশি পরিণত ছিলো? না, তা নয়, সে-যুগের আদর্শে রবীন্দ্রনাথকেও বলা যায় 'অকালপক্ক', কিন্তু আজকের দিনে আমাদের যা মনে হয় তাঁর মন্থর পরিণতি, প্রথম যৌবনের পক্ষে অস্বভাবী এক ভীরুতা, তার কারণ আর-কিছু নয়—বাংলা ভাষার অপরিণত অবস্থা। ব্লেকের সময়ে ইংরেজি, বা র‍্যাঁবোর সময়ে ফরাশির তুলনায়, বাংলা কবিতা প্রায় মধ্যযুগে পড়ে আছে তখনও, মধুসূদনের বীরোচিত কীর্তি তার আকৃতিগত পার্থক্য ঘটালেও, তাতে আধুনিক ভাবনা-বেদনা সঞ্চারিত হয়নি। 'সন্ধ্যাসংগীতে' নতুন এক বেদনা প্রবেশ করলে, কিন্তু তার উপযোগী ভাষা তখনও সুদূরপরাহত। রবীন্দ্রনাথকেই, একান্তভাবে নিজের চেষ্টায়, ভাষা সৃষ্টি করে নিতে হলো, এটা একদিক থেকে তাঁর দুর্ভাগ্য বলবো, কেননা যেমন এরই জন্যে আমাদের কবিতার ইতিহাসে তাঁর ধ্রুব আসন, তেমনি এরই জন্যে তাঁর কবিকৃতিতে উত্থান-পতন এমন চমকপ্রদ, কাব্যগ্রন্থগুলি এমন অসমান, এবং একই গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন কবিতায় তারতম্য এমন দুস্তর।

'কবি-কাহিনী' থেকে 'ছবি ও গান', সতেরো থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত বয়সে রবীন্দ্রনাথ অনবরত লিখেও যে একটি কবিতাকেও আদ্যন্ত পাঠযোগ্য করে তুলতে পারেননি, শুধু মাঝে-মাঝে ভালো পঙক্তি ছিটিয়ে গেছেন, এতেই বোঝা যায় আমরা যাকে ভাব বলি সেই বস্তুটি কতদূর পর্যন্ত বাগ্‌নির্ভর। রূপে ও সৌরভে যাকে বলা যায় রাবীন্দ্রিক, এমন কয়েকটি কবিতা প্রথম দেখা দিলো 'কড়ি ও কোমলে'। সংহতির প্রথম চেষ্টা এখানে, এখানেই প্রথম কারুশিল্পে মনোযোগ। কিন্তু মোটের উপর এই

---

* 'সন্ধ্যাসংগীতে'র প্রকাশকাল ১৮৮২, 'শৈশব সংগীতে'র ১৮৮৪। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় আরো পাঁচটি কাব্যরচনা—'কাল-মৃগয়া', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

পুস্তককেও রিহার্সেলের অধ্যায়ে ফেললে ভুল হয় না, নাটক আরম্ভ হলো 'মানসী'তে। মাত্রাবৃত্তের আধুনিক রূপ 'কড়ি ও কোমলে'ই প্রথম খুঁজে পাওয়া যায়, এ-কথা, অন্তত ঐতিহাসিক অর্থে, আমাদের মানতেই হবে।* যুক্তবর্ণকে একের বদলে দুই মাত্রার মূল্য দিলে, তবেই যে এই ছন্দ সপ্রাণ ও চঞ্চল হয়ে ওঠে, এই আবিষ্কার বাংলা কবিতার পক্ষে যুগান্তরকারী, এবং এটি বহুযুগ ধরে রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছর বয়সের জন্য অপেক্ষা করে ছিলো। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' ব্যবহারগত সাহস নেই : মাত্রাবৃত্তের মর্মস্থল খুঁজে পেয়েও রবীন্দ্রনাথ যেন নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না, যথাসম্ভব যুক্তবর্ণ এড়িয়েই এই ছন্দে কবিতা লিখছেন। এই ভয় প্রথম ভাঙলো 'মানসী'তে। যখন লিখলেন :

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;

বা

অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্মমাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে
জীবন করিছে গ্রাস।

বা

আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চলমাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ নিবিড় চুলে।

* আমার "বাংলা ছন্দ" প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছি কোন বা কোন-কোন মাত্রাবৃত্ত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম যুক্তবর্ণকে দুই মাত্রার মূল্য দেন। পাঠকের কৌতূহল হলে 'সাহিত্যচর্চা', দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখতে পারেন।

দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।

তখনই এই ছন্দে যুক্তবর্ণের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ দেখালেন তিনি, তাঁর নিজের, ও সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার, এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন। এতদিনে আমাদের কান এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে এর নূতনত্ব আমাদের কাছে তৎক্ষণাৎ প্রতিভাত হয় না, কিন্তু এ যে রবীন্দ্রনাথের কত বড়ো মহনীয় কীর্তি, তা হেমচন্দ্রের একদা-জনপ্রিয় 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে' রচনাটি একবার স্মরণ করলেই বোঝা যেতে পারে। তাঁর পূর্ববর্তী উনিশ-শতকী কবিদের—একমাত্র মধুসূদন ছাড়া—রবীন্দ্রনাথ যে লুপ্ত করে দিলেন, আজকের দিনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালের বাইরে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল বা বিহারীলালের প্রায় অস্তিত্ব নেই, তার কারণ কি যাকে বলা হয় তাঁর ভাবগৌরব, তাঁর 'বাণী'র মহিমা ? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি দ্বিধান্বিত হচ্ছি, কেননা আমার শৈশবের পাঠস্মৃতি আমাকে বলে দিচ্ছে যে উক্ত কবিরা উন্নত ভাবে দরিদ্র নন। আর তাছাড়া, কাকে বলে কবিতার 'ভাব', কল্পনাশক্তি ব্যাপারটা কী, কবিতায় 'বাণী' বা বার্তার মূল্য কতটুকু—এ-সব নিয়ে আগামী প্রলয় পর্যন্ত তর্ক চলতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এক জায়গায় আমরা তর্কাতীতভাবে নিশ্চিত : তা তাঁর বাণীমাধুরী। তিনিই আমাদের প্রথম কবি, যিনি আমাদের মাতৃভাষার আদ্যন্ত ধ্বনিপুলকে মগ্ন হতে পারলেন : তাঁর তুলনায় তরল মনে হয় জয়দেবকে, যাঁকে বাংলাভাষার কবি বলে ভাবলে শুধু আক্ষরিক অর্থেই ভুল হয় ; ভারতচন্দ্রকে মনে হয় কিপলিঙের মতো একজন 'মহৎ পদ্যলেখক' মাত্র, আর মধুসূদন বিষয়ে মনে হয় তিনি বাংলা ব্যাকরণ মেনে সংস্কৃতে কবিতা লিখেছিলেন। বাঙালি কবিরা, বৈষ্ণব যুগ থেকে বিহারীলাল পর্যন্ত, মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করেছেন ; কিন্তু, যদি কবিতা সুর করে গীত না হয়, তাহলে এই ছন্দ যে যুক্তবর্ণের অভাবে নির্জীব ও যুক্তবর্ণের সংশ্লেষে বিপন্ন হয়ে পড়ে, তা প্রথম রবীন্দ্রনাথের কানেই ধরা পড়লো। অবশ্য মানবস্বভাব এতদূর পর্যন্ত জাড্যের বশবর্তী, যে রবীন্দ্রনাথও প্রথমে ভেবেছিলেন যে যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেই সমস্যার সমাধান হবে ; 'মানসী'তে "ভুলে", "ভুল-ভাঙা" —ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় যুক্তবর্ণ নেই অথবা বিরল। এই ছন্দের গতি, ভঙ্গিমা ও লাস্য যে যুক্তবর্ণের নিপুণ ব্যবহারেরই অপেক্ষা রাখে তা উপলব্ধি ও কার্যত স্বীকার করতে রবীন্দ্রনাথেরও কম সময় লাগেনি।

কলাকৌশলে, এবং ভাববস্তুতেও, 'মানসী'কে রবীন্দ্র-কাব্যের অণুবিশ্ব বলা যায়। এক তীব্র, সমগ্রদেশকালব্যাপী প্রেম, যার লক্ষ্য কখনো মানবী, কখনো এক অনির্ণীত ও

অনির্ণেয় বিশ্বসত্তা, আর কখনো বা মানবীর মধ্যেই অনন্তের অনুভূতি ("নিষ্ফল কামনা", "ধ্যান", "পূর্বকালে", "অনন্ত প্রেম") ; ঋতুরোমাঞ্চ ("একাল ও সেকাল", "বর্ষার দিনে") ; ব্যাপ্ত, বৃহৎ, তৃপ্তিহীন সেই 'বিশ্ববিষাদ' যা রোমান্টিকতার কুললক্ষণ ("নিষ্ফল কামনা", "আকাঙ্ক্ষা", "প্রকাশবেদনা") ; সেই ব্যর্থতাবোধের বেদনামাধুরী, যার তীব্রতর প্রকাশ 'কল্পনা'র "স্বপ্ন" ও 'খেয়া'র "অনাবশ্যক" ("নিষ্ফল কামনা", "নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "মরণস্বপ্ন") ; নিজের অব্যবহিত পরিবেশের, অর্থাৎ স্বদেশের, নীতি ও আদর্শগত ক্ষুদ্রতায় যন্ত্রণাবোধ, এবং সেই সঙ্গে এক নিগূঢ় ও মেধাবী বিশ্বচেতনা ("দুরন্ত আশা", "দেশের উন্নতি") ;—এই সব মূলসূত্র, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অফুরন্তভাবে ফিরে-ফিরে এসেছে—এদের প্রথম সার্থক উচ্চারণ 'মানসী'তেই। এবং যে-সব ছন্দ তাঁর হাতে কখনো বীণা, কখনো শঙ্খ, কখনো বা বাঁশি হয়ে মধুর, করুণ, উদাস, চপল, গম্ভীর অথবা উৎসাহী সুরে ধীর বা দ্রুত লয়ে ধ্বনিত হয়েছে সেগুলিরও 'মানসী'তেই আরম্ভ, কোনোটির আরম্ভমাত্র, কোনোটি বা ইতিমধ্যেই বিকশিত। যে-সব বিচিত্র অসমমাত্রিক ছন্দ, যুক্তবর্ণবর্জিত বা -সংবলিত রূপে পরে তিনি বহু স্মরণীয় কবিতায় ও গানে ব্যবহার করেন, 'মানসী'র প্রথম আশি পৃষ্ঠার মধ্যে তার আশ্চর্য পরিণতি ঘটলো।*

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহতপোবনে আনমনে উদাসী
("বিরহানন্দ")

'এই ছন্দে যে যে স্থানে ফাঁক, সেইখানে দীর্ঘ যতিপতন আবশ্যক'—এই নির্দেশ, এবং পঙক্তিগুলির চাক্ষুষ আন্তশ্ছেদ, এ-দুটি লক্ষণে বোঝা যায় যে কবি তখনও তাঁরই উদ্ভাবিত এই নতুন ছন্দের প্রকৃতি বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেননি, অন্তত তাঁর আশঙ্কা ছিলো যে এর চতুরালি পাঠকের কান এড়িয়ে যাবে। অথচ "বিরহানন্দে"র একমাস পরেই তিনি দ্রুত লয়ে মধ্যমিলভূষিত অসমমাত্রিক ছন্দ রচনা করলেন :

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে ?

---

* এর আগে এই ছন্দ তিনি ব্যবহার করেন 'প্রভাতসংগীতে'র "প্রভাত-উৎসব" ও "সাধ" কবিতায়।

হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে ("শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা")

তারপর :

'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্ !'—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল ! ("বধূ")

তারপর :

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে ! ("গুপ্ত প্রেম")

আর এর পরে এলো যুক্তবর্ণের প্রয়োগ ; 'ছিলাম নিশিদিন'-এর টানা, লম্বা, তন্দ্রালু সুরের বদলে আমরা পাচ্ছি ঝর্নার চঞ্চলতা :

কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু ! ("অপেক্ষা")

এ-রকম আঁটো স্তবক "অপেক্ষা"য় একটিমাত্র আছে, অধিকাংশেই যুক্তবর্ণ একটিও বা দু-একটির বেশি খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু চারদিন পরে লেখা হলো "দুরন্ত আশা" ('মর্মে যবে মত্ত আশা সর্পসম ফোঁসে'), যা পড়ে মনে হয় কবিতাটি যেন যুক্তবর্ণের ঘাত-প্রতিঘাতে সমুদ্রের মতো দুলছে।

পয়ারও প্রথম দানা বাঁধলো 'মানসী'তেই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'রাজা ও রানী'র পর কী সবল ও সাবলীল "নিষ্ফল কামনা"র অমিত্রাক্ষর, অথচ কেমন অনতিধ্বনিত ; পঙক্তির অসাম্যে, উক্তির নাটকীয় নিস্বনে, কেমন গতিশীল ও গম্ভীর। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' পর্যন্ত যে-উচ্ছ্বাস আত্মঘাতী ছিলো (যা থেকে, নির্মম ও সকরুণ হাতে, রবীন্দ্রনাথ "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"কে উদ্ধার করেছিলেন, এবং যা পরবর্তীকালে বা

বার্ধক্যেও তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়নি), তাকে তিনি প্রথম দমিত করতে পেরেছিলেন 'কড়ি ও কোমলে'র কোনো-কোনো পয়ারছন্দে রচিত চতুর্দশপদীতে ("যৌবন-স্বপ্ন", "ক্ষণিক মিলন")। কিন্তু স্বভাবের উপর মানুষের চরিত্র কী-ভাবে জয়ী হ'তে পারে তার প্রথম দলিল রবীন্দ্রনাথের হাতে "নিষ্ফল কামনা", এবং সামগ্রিকভাবে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি বুঝেছিলেন যে বাংলা কবিতা যেহেতু আর সুর করে পড়া হবে না, তাই কৃত্তিবাসী, যতিপ্রান্তিক পয়ার এখন নির্বীজ হয়ে গেছে, অথচ মাইকেলি অমিত্রাক্ষরেও সাড়া দেয়নি তাঁর কান অথবা মন ; ফলত তিনি অবলম্বন করলেন এমন একটি মধ্যপথ যাকে হয়তো সুবর্ণমধ্যম বললে ভুল হয় না, কেননা তাঁর নিজের প্রতিভার তা অনুগামী, আর বাংলা ভাষার স্বভাবের পক্ষে অনুকূল। মাত্রাবৃত্তের মতোই, কিন্তু ভিন্ন ধরনে, পয়ারের চারুত্ব যে যুক্তবর্ণের সুমিত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে, এই সূত্র 'মানসী'তে প্রতিষ্ঠিত হলো, যদিও সব কবিতায় তার স্পষ্ট নিদর্শন নেই। যেমন, "বিচ্ছেদের শান্তি"—

সেই ভালো, তবে তুমি যাও।
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও !
এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।

—এই তরল রচনা 'কড়ি ও কোমলে'রও হ'তে পারতো, কিন্তু—

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন,
মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী। ("একাল ও সেকাল")

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে গেছে চলে,
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা ব'লে !

কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাই নি তারে,
বসাই নি এ নির্জন আত্মার আঁধারে।

("আকাঙ্ক্ষা")

—এই সব স্তবক বা কবিতায় যে-পরিবর্তনটি ঘটেছে তা যেমন সূক্ষ্ম তেমনি সুদূরস্পর্শী। লক্ষণীয়, এই স্তবক দুটির চেহারা সেকেলে ; পুরোনো ভাষায় যাকে দীর্ঘ ত্রিপদী বলা হতো, প্রথমটিকে তারই প্রকারান্তর বলা যায়, দ্বিতীয়টির গঠন কৃত্তিবাসী। অথচ এদের নূতনত্ব পড়ামাত্র অনুভব করা যায়, আর তা শুধু রসবস্তুতে নয়, ধ্বনিবিন্যাসেও। 'বর্ষা', 'গাঢ়', 'মধ্যাহ্ন', এই তিনটি যুক্তবর্ণ, এবং 'শ্যাম' শব্দে য-ফলাজনিত গাঢ়তা ; 'ক্ষুদ্র' ও 'তুচ্ছ'-এর স্বরসংগতি ; 'সত্যরাজ্য' ও 'নির্জন', 'আত্মার' ও 'আঁধারে' শব্দের দুর্নিরীক্ষ্য অনুপ্রাস—এর ফলে স্তবক দুটি যে-দৃঢ়তা পেয়েছে তাতে আধুনিক পয়ারের যাত্রারম্ভ সূচিত হলো। একদিকে এই নতুন উচ্চারণ-নির্ভর ভারসাম্য, অন্য দিকে এক-দাঁড়ি-দুই-দাঁড়ির বন্ধন থেকে মুক্তির ফলে পয়ারে এলো স্রোত ("মেঘদূত", "অহল্যার প্রতি") : মাইকেলি অমিত্রাক্ষরের যেটি আসল কীর্তি, সেই প্রবহমানতা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে রাখলেন অন্ত্যানুপ্রাস—সৃষ্টি করলেন এমন একটি রূপ, যা তাঁর আখ্যান- বা নাট্যধর্মী বহু কবিতায় ব্যবহৃত হতে-হতে ("মানসসুন্দরী", "বিদায়-অভিশাপ", "দেবতার গ্রাস", "গান্ধারীর আবেদন") অবশেষে 'বলাকা'র অসমপঙক্তিক বেগধর্মিতায় পরিণত হলো। অত্যুক্তি হবে কি, যদি বলি যে সমিল পয়ারেরও পুনর্জন্ম ঘটলো 'মানসী'তে— তা যতিপ্রান্তিক বা প্রবহমান যা-ই হোক না— যে ছন্দশিল্পের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁর পরবর্তী ভাবীকালের কবিতাকে এই গ্রন্থটি ধারণ করে আছে ?*

২

মাতৃভাষায় অব্যবহিত অগ্রজদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের অনুকরণ তরুণ কবির আদিকৃত্য ;

---

* এখানে বলা দরকার যে 'মানসী'তে এবং 'মানসী' থেকে 'কাহিনী' পর্যন্ত পুস্তকে স্বরবৃত্ত নেই, 'কথা ও কাহিনী'র তিনটি ও 'কল্পনা'র একটিমাত্র কবিতা স্বরবৃত্তে রচিত, কিন্তু 'ক্ষণিকা' থেকে 'শিশু ভোলানাথ' পর্যন্ত প্রভূতভাবে এবং 'মানসী'র আগে ও 'শিশু ভোলানাথে'র পরে মাঝে-মাঝে, রবীন্দ্রনাথ স্বরবৃত্ত ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও প্রিয় ছিলো। কিন্তু ১৯৩০ নাগাদ বাংলা কবিতায় যে-নতুন রীতি দেখা দিলো তাতে স্বরবৃত্তের স্থানসংকোচন একটি লক্ষণীয় ব্যাপার ; আজকের দিনের তরুণ কবিরাও খাঁটি স্বরবৃত্ত বেশি লেখেন না।

কিন্তু কেন এমন হলো যে রবীন্দ্রনাথ, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সঙ্গে একই বছরে জন্মগ্রহণ করেও, কখনো মধুসূদনের অনুকরণ করলেন না? গদ্যে বঙ্কিম তাঁর অর্ধজীবনের গুরু, কিন্তু পদ্যে—পদ্যে কেন তাঁর কৈশোরক রচনাতেও—মধুসূদনের কোনো প্রভাব নেই? খুব সহজ এই প্রশ্নের উত্তর ; তা বিধৃত আছে একুশ-বছর-বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের "মেঘনাদবধ কাব্য" নামক আলোচনায়, আর গত একশো বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে। তরুণ রবীন্দ্রনাথের বেদনাবিদ্ধ হৃদয় 'মেঘনাদে'র উচ্চ নাদে সাড়া দিতে পারেনি, এবং তাঁর স্বজ্ঞার প্ররোচনায় তিনি জেনেছিলেন যে বাংলায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার্য হলেও আমাদের ভাষার ও ছন্দের নাড়ির টান সে-দিকে নয়। তাঁর সমগ্র পদ্যরচনার তুলনায় কী অল্প তাঁর অমিত্রাক্ষরের পরিমাণ, তাঁর সমকালীন ও পরবর্তী সমগ্র বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষরের স্থান কী সংকীর্ণ! আমাদের মনে রাখতে হবে যে আধুনিক ইন্ডো-য়োরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে অমিত্রাক্ষর যাতে সবচেয়ে বলীয়ান, দৈবক্রমে সেই ভাষাই আমাদের জীবনের মধ্যে স্থান পেয়েছে ; কিন্তু ইংরেজির সঙ্গে বাংলার ব্যবধান দুস্তর। হলন্ত শব্দের প্রাদুর্ভাব, এবং স্বরাঘাতশাসিত উচ্চারণ পদ্ধতি—এই দুটি কারণে ইংরেজি ভাষায় মিলের সম্ভাবনা সীমিত, অতএব অমিত্রাক্ষরের প্রতি তার প্রবণতা স্বাভাবিক ; তার আত্মীয় অন্যান্য ভাষায়, প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্য, অন্ত্যানুপ্রাসেরই প্রাধান্য দেখা যায়। আর বাংলা, তার শুদ্ধ স্বরবর্ণ ও অসংখ্য স্বরান্ত শব্দ নিয়ে স্বভাবতই মিলে এত সমৃদ্ধ যে ছন্দ আর মিল যেন পরস্পরকে দাবি না-করে পারে না। কেমন করে এই রকম ভাষায় অমিত্রাক্ষর বিকশিত হতে পারে?

কিন্তু এই যে বলছি বাংলা ভাষা স্বভাবতই মিলে সমৃদ্ধ, এই কথা কি কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা পড়ে অনুমান করা যায়? না কি 'বনফুল' থেকে 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পুস্তকগুলিতেই তা ধরা পড়ে? না ; বাংলা ভাষায় মিলের সম্ভাবনা যে কী বিপুল ও বিচিত্র এই আবিষ্কারটি যেমন রবীন্দ্রনাথের, তেমনি এরও প্রথম প্রকাশ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে। অন্য কবিদের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, রবীন্দ্রনাথেরই 'মানসী'-পূর্ব রচনায় এমন মিল খুব অল্পই আছে যা দুর্বল অথবা গতানুগতিক নয়, কিংবা যা পুরোনো কবিরা খুঁজে পাননি, কিংবা যাকে মিল বলে স্বীকার না-করতে রবীন্দ্রনাথই শেখাননি আমাদের। 'বুঝিতে/শিখিতে', 'চাহিয়া/হইয়া', 'ঘুমাইল/মিলাইল', 'ভাই /সদাই', 'পাশেতে /পশ্চাতে'—এই ধরনের না-মিল-না-অমিলের ভিড়ের মধ্যে ক্বচিৎ হয়তো একবার দেখা দেয় 'পড়িছে না/চেনা'র মতো আধুনিক মিল, কিন্তু পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে সদ্য প্রয়াস চাপা পড়ে যেতে দেরি হয় না। 'কড়ি ও কোমল' অনেক বিষয়ে, এবং মিলেও, কিছুটা অগ্রসর, কিন্তু এখানেও 'হয়েছে/রয়েছে' বা 'তেয়াগিয়া/হইয়া'র প্রতি আসক্তি কেটে যায়নি, এবং প্রথম কবিতাটির

একটি মিল, মিল বলে গণ্য হয় শুধু উচ্চারণের উপর বলপ্রয়োগ করলে।* —কিন্তু এই সব দ্বিধা, দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, এক দমকে দূর হয়ে গেলো 'মানসী'তে।

সত্য, 'মানসী'তেও তিনি মিলের জন্য 'হাসি' অর্থে 'হাস' লিখেছেন ("বর্ষার দিনে", "আকাঙ্ক্ষা"), মিলের বা ছন্দের খাতিরে অকারণ একটি 'তে' প্রয়োগ করেছেন সপ্তমীতে ("বঙ্গবীর"), এবং এখানেও আছে 'কুলায়/কোথায়' ("আকাঙ্ক্ষা") বা 'নিশীথ/চঞ্চলিত'-এর মতো ("মরণস্বপ্ন") গতানুগতিকের উদ্বৃত্ত। কিন্তু এই সব বিচ্যুতি 'মানসী'র গৌরবকে ম্লান করতে পারে না, কেননা মিলের মন্ত্রশক্তি প্রথম ধরা পড়লো এখানেই, আবহমান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই প্রথম। শুধু শেষ বর্ণের ঐক্য নয়, উপান্ত্য বর্ণেও যে-স্বরগত সাদৃশ্য থাকা চাই, এমনকি তারও পূর্ববর্ণের স্বরধ্বনি দুটিকে যে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব, এই সব ধারণা 'মানসী' থেকেই নিঃসৃত হলো বাংলা কবিতায় ; আজকের দিনে মিলের আদর্শ বলতে আমরা যা-কিছু বুঝি, এবং যা বহু ব্যবহারের ফলে জীর্ণ বলেও আমাদের মনে হয়, এই পুস্তক তর্কাতীতরূপে তার প্রতিষ্ঠাভূমি। এর আগে কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে বাংলা ভাষা, তার তৎসম, তদ্ভব, দৈশিক ও বিদেশী শব্দের সম্ভার নিয়ে, মিলের বিষয়ে কত বড়ো প্রতিভাশালী, কী গভীর সেই মিলের রহস্য, কী উদার সম্ভাবনায় ভরপুর—

প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড় ... ("মেঘদূত")

অপবিত্র ও করপরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।
("নারীর উক্তি")

---

* ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
...
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
এখানে মিল পেতে হলে 'তরঙ্গিত' শব্দের হলন্ত বা 'সংগীত'-এর স্বরান্ত উচ্চারণ করতে হবে।

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে! ("গুপ্ত প্রেম")

আবার মোরে পাগল করে
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
("শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা")

কোথা এ মোর জীবন-ডোর
বাঁধা রে?
প্রেমের ফুল ফুটে আকুল
কোথায় কোন্ আঁধারে?
("শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা")

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন। ("দুরন্ত আশা")

বধূরা দেখো আইল ঘাটে,
এল না ছায়া তবু।
কলস-ঘায়ে ঊর্মি টুটে,
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে,
শ্রান্ত বায়ু প্রান্তনীর
চুম্বি যায় কভু। ("অপেক্ষা")

—কী ঘটছে এখানে? কী সেই নতুন, যা বাংলা পদ্যশিল্পে প্রবেশ করে যেন মুহূর্তে জয় করে নিলো ভবিষ্যৎকে? বিস্ময় সেই নতুনের নাম : মিলের গঠনে ও বিন্যাসে, ছন্দের গঠনে ও বিন্যাসে, পঙ্‌ক্তিসজ্জায়, স্তবকসজ্জায়—বিস্ময়। যে-সব শব্দযুগ

ব্যাকরণিকরূপে সবর্ণ (ঘেরা-ফেরা, দিলে-নিলে, টুটে-উঠে), মিল তাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হলে প্রত্যাশার বেশি কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু শব্দ দুটি যদি বিভিন্নভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকে ('ঘেরা /বিহঙ্গেরা', 'দিলে /নহিলে'), বা তাদের উৎস অথবা জাতি হয় স্বতন্ত্র ('বেদুয়িন /বিলীন'), বা দুটির মধ্যে দুটি বা একটি মিল যদি দুই শব্দের সহযোগে রচিত হয় ('বিধি হে /কী দিয়ে', 'দিবে কে/ বিবেকে', 'বাঁধা রে /আঁধারে'), এবং যদি সেই সঙ্গে ঘটে অর্থের সুসংগত ব্যঞ্জনা, তাহলে একটি মিলের আঘাতেই অজানার দিকে জানলা খুলে যায়, কবিতার বার্তাকে বহু দূরে ছাড়িয়ে যায় তার সংকেত। 'বিহঙ্গ' সংস্কৃত, কিন্তু তার বহুবচন হয়েছে বাংলা মতে এবং নির্ভার নিত্যপরিচিত 'ঘেরা' শব্দের পরে গম্ভীর অথচ সজীব 'বিহঙ্গেরা' এসে সৃষ্টি করছে সাদৃশ্যের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি বৈসাদৃশ্য ; আমাদের সুখের পক্ষে সেটা মস্ত উপরি-পাওনা। বিদেশী 'বেদুয়িনে'র পরে খাঁটি সংস্কৃত 'বিলীন', আধা-সংস্কৃত 'বিধি হে'-র পরে খাঁটি বাংলা 'কী দিয়ে' (২+১ মাত্রার পরে ১ + ২ লক্ষণীয়—দুটো একরকম হলে এতটা অভিঘাত হতো না), আর—সবচেয়ে আশ্চর্য—'দিবে কে'-র পরে 'বিবেকে' ; শুধুমাত্র ভালো মিল নয়, অনির্বচনীয়ের উদ্ভাস এগুলো।* "অপেক্ষা"র স্তবকটিতে 'টুটে-উঠে'র আগে 'ঊর্মি', 'চূর্ণি' ও 'রশ্মি'র প্রয়োগ, শেষ পঙক্তিতে আবার 'চুম্বি'র ব্যবহার, এবং উপান্ত্য পঙক্তিতে 'শ্রান্ত' ও 'প্রান্ত'র মধ্যমিল—এই সবের মিলিত প্রভাবে পুরো স্তবকটি যে-ভাবে মন্দ্রিত হয়েছে তা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কতদূর অপূর্ব ছিলো তা এতেই বোঝা যায় যে ঐ ১৩২ পঙক্তির কবিতায় ঠিক এ-রকম স্তবক একটির বেশি দুটি নেই। মিল যেন লুকিয়ে-থাকা জন্তুর মতো অতর্কিতে আক্রমণ করে, আমাদের শ্রবণে ও মননে তার দাঁত বসিয়ে দেয়—বাংলা কবিতার ইতিহাসে এ-রকম ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি।

বিস্ময় এলো মিলের বিন্যাসেও, আর এলো অন্য এক নতুন ও আধুনিক বস্তু, যার স্পষ্ট চেহারা, পূর্বযুগের কবিতায় তো দূরের কথা, রবীন্দ্র-কাব্যেও এর আগে পাওয়া যাবে না। এই বস্তুটির নাম স্তবক, এবং বাংলা কবিতার জন্মান্তরক্রিয়ায় এর অবদান অপরিমেয়। রবীন্দ্র-পূর্ব কোনো-কোনো উনিশ-শতকী কবিতে হয়তো আক্ষরিক অর্থে স্তবক আমরা খুঁজে পাবো, কিন্তু পাবো না তার বৈচিত্র্য বা জটিলতা, পাবো না রূপকল্প বিষয়ে নতুন কোনো চেতনা, পাবো না দ্বিপদী-ত্রিপদীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কোনো লক্ষণ। এই মুক্তি সাধিত হলো 'মানসী'তে, বাংলা কবিতার দূরপ্রয়াণ এতদিনে ও অবশেষে সম্ভব হলো।

যাঁদের মন কবিতার ধ্বনিতে সাড়া দিতে পারে না, যাঁরা কবিতা থেকে শুধু একটি

---

* আগে বলেছি, ইংরেজি ভাষা মিল বিষয়ে দরিদ্র, তাই এখানে উল্লেখ করতে চাই যে

কাহিনী বা উপদেশ আহরণ করেন, যাঁরা “দুই বিঘা জমি” ও ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের ভক্ত, তাঁদের এ-কথা বোঝানো অসম্ভব যে মিলনির্ভর স্তবক যখন বিচিত্র ও জটিল হয়ে ওঠে, যখন সম- বা অসমমাত্রিক কতিপয় পঙক্তি পরস্পরে সংশ্লিষ্ট হয়ে বারে-বারে একই মূল রূপকল্পের অনুসরণ করে, যখন নির্ভুলভাবে ফিরে-ফিরে আসে যথাস্থানে মিলের বিন্যাস ও পঙক্তির মাত্রাসংখ্যা, কবিতাটি দীর্ঘ হলেও একবারও নিয়মচ্যুত হয় না, তখন তার ক্ষমতা কত বেড়ে যায়, সহৃদয় ও শ্রবণসক্ষম পাঠকের আত্মার কত গভীর স্তরে তা প্রবেশ করতে পারে। অনুলাপের আনন্দ, এবং অনুলাপের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিস্ময়, একই ছন্দের নানা রকম চলন—ওঠা, পড়া, গড়ানো, ঢেউ-তোলা, মৃদু, কঠোর, তীক্ষ্ণ, শ্বসিত—একই আকার ও আকৃতির মধ্যে আবদ্ধ থেকেও এই সব সূক্ষ্ম পরিবর্তন-প্রসূত সম্মোহন : অর্থাৎ কালিদাস যেমন একই মন্দাক্রান্তাকে নানাভাবে খেলিয়েছিলেন, আধুনিক কবি যে স্তবকের দ্বারা ঠিক সেই কাজটি সম্পন্ন করে থাকেন, এ-কথা যে নিজে অনুভব করেনি তাকে কেউ বোঝাতে পারে না। বোঝানো যায় না, কিন্তু নেহাৎ ঐতিহাসিক তথ্য হিশেবে এটুকু বলা যেতে পারে যে প্রভাঁসের ত্রুবাদূর কবিরা, আর তাঁদের পরে দান্তে, যখন মিল ও স্তবকবিন্যাসের অসংখ্য উদাহরণ স্থাপন করলেন, তখনই ঘটলো য়োরোপীয় প্রাকৃত ভাষায় কাব্যের নবজন্ম, আর বাংলা কবিতারও নবজন্ম ঘটলো তখন, যখন ‘মানসী’তে—আর তার পরে ‘সোনার তরী’তে—একা রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ উদ্ভাবনের দ্বারা কাব্যকলার এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন।

‘মানসী’র কবিতাগুলিকে, ছন্দের দিক থেকে, তিন অংশে ভাগ করা যায়। এক : যেখানে ছন্দ গতানুগতিক এবং তার ব্যবহারও তা-ই (“উপহার”, “কুহুধ্বনি”, “পত্রের প্রত্যাশা”, “জীবনমধ্যাহ্ন” ইত্যাদি) ; দুই : যেখানে ছন্দ গতানুগতিক হলেও ব্যবহারে বা স্তবকসজ্জায় নূতনত্ব আছে (“একাল ও সেকাল”, “আকাঙ্ক্ষা”, “সিন্ধুতরঙ্গ”, “ব্যক্ত প্রেম”, “আমার সুখ” ইত্যাদি) ; এবং তিন : যেখানে ছন্দের অথবা মিলও স্তবকসজ্জার নূতনত্বের ফলে, বা অন্য কোনো কারণে, নতুন রকমের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে (“ভুলে”, “বিরহানন্দ”, “নিষ্ফল কামনা”, “শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা”, “গুপ্ত প্রেম”, “দুরন্ত আশা” ইত্যাদি)। এই শেষোক্ত কবিতাগুচ্ছই, কবিতা হিশেবে, সবচেয়ে সক্ষম

ইংরেজিতেও অন্তত একজন কবিতে এই ধরনের মন্ত্রসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে : একমাত্রিক দৈশিক শব্দের সঙ্গে লম্বা লাতিন শব্দ মিলিয়ে ইয়েটস যে-ধ্বনি তুলেছিলেন, তা যেন হাতুড়ির মতো আঘাত করে। যেমন—

In pity for man's darkening thought
He walked that room and issued thence
In Galilean turbulence;

ও প্রাণবন্ত, এরাই উপচে পড়েছে পরবর্তী কালে, যে-ক'টি সূত্র এখানে সদ্য-আবিষ্কৃত তাদেরই পরিণতি—শুধু রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত নয়, উত্তরসাধকদের রচনাতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। "ভুলে", "বিরহানন্দ", "শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা" : আমি যাকে স্তবক বলছি এ-সব কবিতা তার প্রথম উদাহরণ, এবং যাঁরা কবিতা পড়ে সময় নষ্ট করে থাকেন তাঁদের অজানা নেই যে 'সোনার তরী', 'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি' ইত্যাদি কয়েকটি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা যেমন জাগ্রত, তেমনি স্তবকশিল্পে সৃষ্টিশীলতা ক্লান্তিহীন।* আমরা সাধারণত যাকে 'বলাকা'র ছন্দ বলে থাকি, তারও উৎসস্থল 'মানসী', কেননা "মেঘদূতে"র সমিল প্রবহমানতা ও "নিষ্ফল কামনা"র অসমপঙক্তিক গঠন—এ-দুটিকে মিলিয়ে তা রচিত হয়েছে ; এবং এই ছন্দের প্রকরণভেদ যে-সব আধুনিক কাব্যগ্রন্থের নির্ভর, তাদের মধ্যে আছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ও 'অর্কেস্ট্রা'। আর-এক কথা : স্তবকের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পঙক্তিকে মিলহীন রেখে দেয়াও যে ধ্বনিশিল্পের অন্যতম অঙ্গ, এই কথাটিরও প্রথম অঙ্গীকার 'মানসী'তে। আমার এ-কথার লক্ষ্য "অপেক্ষা"র মতো কবিতা নয়, কেননা সেখানে মিলহীন পঙক্তিগুলোকে মিলহীন বলে আমরা অনুভব করি। আমি ভাবছি এমন উদাহরণ, যা সচেতন শিল্পিতার দ্বারা সাধিত ; যেমন "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" ও "গুপ্ত প্রেম" ; এই তিনটি কবিতার প্রতি স্তবকের প্রথম পঙক্তি যে মিলহীন তা আমরা কতটুকু লক্ষ করি, বা লক্ষ করলেও কতক্ষণ মনে থাকে ? আর এর পরে "দুরন্ত আশা"য় এমন একটি কাজ তিনি করলেন যাকে প্রতিভার বিদ্যুৎস্পর্শ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

মর্মে যবে মত্ত আশা
        সর্পসম ফোঁসে,
অদৃষ্টের বন্ধনেতে
        দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালোমানুষ সেজে
বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে

---

* স্তবকের বৈচিত্র্য কোথায় বেশি—একা রবীন্দ্রনাথে, না স্কট থেকে কীটস পর্যন্ত সমগ্র ইংরেজি রোমান্টিক আন্দোলনে, এ নিয়ে কেউ গবেষণা করলে ঔৎসুক্যজনক ফললাভ হওয়া সম্ভব।

খেলিতে হবে কষে!
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী
স্তন্যপায়ী জীব
জন-দশেকে জটলা করি
তক্তপোশে ব'সে।

এই স্তবকে প্রথম, তৃতীয়, নবম ও একাদশ পঙক্তি যে মিলহীন, তা আমাদের পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়— "ভুলে", "ভুল-ভাঙা" ও "অপেক্ষা"তেও তুলনীয় 'মুক্ত' পঙক্তি অনেক পেয়েছি, এবং পেয়ে তেমন অবাক হইনি,*—কিন্তু একেবারে আশ্চর্য ও আশাতীত হলো দশম পঙক্তিটি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব প্রথা ও সাধারণ অভ্যাস অনুসারে এই পঙক্তিতে প্রথম মিলটি ফিরে আসা উচিত ছিলো, কিংবা আমরা আশা করতে পারতাম এর সঙ্গে স্তবকের শেষ পঙক্তির একটি নতুন মিল ;—কিন্তু কোনোটাই হলো না। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম পঙক্তির মিলটি, তিন-তিনটে পঙক্তি টপকে পেরিয়ে ফিরে এলো শেষ পঙক্তিতে ; মাঝখানে দশমটিকে শূন্যে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এ তো ঝুলিয়ে দেয়া নয়, এ হলো দুলিয়ে দেয়া ; এই আঁটো দ্রুত স্তবকের মধ্যে হঠাৎ এই 'মুক্ত' পঙক্তিটি—যেখানে প্রত্যাশিত অন্ত্যানুপ্রাস ঘটলো না—তা অন্য পঙক্তিগুলিকে পরস্পরে প্রতিধ্বনিত হবার অবকাশ দিয়ে, শেষ পঙক্তি দুটিকে অমোঘ করে তুলছে। এই মিলের অভাব পূরণ করছে শেষ চার পঙক্তির মধ্যমিল অথবা অনুপ্রাস ;—শুধু তা-ই নয়, এই স্তবকের তীব্রতার রহস্যই এই মিলহারা দশম পঙক্তিটা। পাঠক পরীক্ষার জন্য দশম ও দ্বাদশ পঙক্তিকে মিলিয়ে দিয়ে পড়ে দেখতে পারেন ; তৎক্ষণাৎ স্তবকটির প্রাণ উবে যাবে, বার্তা এক থাকলেও কবিতাটিকে আর তেমন 'ভালো' বলে মনে হবে না।**

"দুরন্ত আশা" অন্য এক কারণে উল্লেখযোগ্য, পরম্পর তিন মিলের প্রয়োগে এখানেই প্রথম কৃতী হলেন রবীন্দ্রনাথ। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে" যা ছিলো আকস্মিক এবং "অপেক্ষা"র অষ্টম ও ত্রয়োদশ স্তবকে অনভিপ্রেত ও আংশিক, এখানে তা হয়ে

---

* একান্তর মিল রবীন্দ্রনাথে অনেক পাওয়া যায় ; দ্বিতীয়-চতুর্থ, ষষ্ঠ-অষ্টম, এই পর্যায়ে জোড় পঙক্তিতে মিল চলে সেখানে ; বিজোড় অর্থাৎ প্রথম-তৃতীয়, পঞ্চম-সপ্তম, এই পর্যায়ে মিল থাকে না ("জীবনমধ্যাহ্ন", "নিন্দুকের প্রতি নিবেদন")।

** এমন তর্ক উঠতে পারে যে এই স্তবকে দৃশ্যত বারো পঙক্তি থাকলেও বস্তুত সাতের বেশি পঙক্তি নেই, কেননা প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয়-চতুর্থ, সপ্তম-অষ্টম, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ পঙক্তি উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এই বিচারেও 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব' মিলহারা থেকেই যাচ্ছে, এবং আমার আলোচনার প্রধান লক্ষ্য এই পঙক্তিটি।

উঠলো সচেতন, সম্পূর্ণ ও উদ্দেশ্যময় :

ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন।

এর পর 'সোনার তরী'র প্রথম সর্বপরিচিত কবিতায়

রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।

তিন-মিলের শিল্পে 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থটি স্বর্ণিল হয়ে আছে, পরবর্তী গ্রন্থের মধ্যে 'ক্ষণিকা'তে উদাহরণ প্রচুর, কিন্তু এগুলোর একটি সামান্য লক্ষণ এই যে তৃতীয় মিলটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, পরবর্তী হ্রস্বতর পঙক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবে স্থিতি পায়। অর্থাৎ, তৃতীয় মিলটি আমাদের চোখে যতটা থাকে, ঠিক ততটা ধ্বনিত হবার তার উপায় নেই, কিছুটা যেন মধ্যমিলের মতো কাজ করে। এও কম আশ্চর্য নয়, আমরা এ নিয়েই অফুরন্তভাবে বিস্মিত হতে পারতাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যতরকে সৃষ্টি করে দেখালেন কেমন করে তৃতীয় মিলটিও স্বাবলম্বী হতে পারে। 'ক্ষণিকা'তেই দেখা দিলো সেই অবিস্মরণীয়—

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

কেমন করে সম্ভব হলো এই জাদুকর্ম? খুব সহজ—অন্তত এখন তা-ই মনে হয় আমাদের : সম্ভব হলো তৃতীয় পঙক্তিতে মিল বর্জন করে। কিন্তু বর্জনটাও বিস্ময়কর—মিল হতে-হতেও হলো না, একেবারে কাছে এসে সরে গেলো। 'পাঁচজনে'র

বদলে 'পাঁচজনা' লিখলেই মিলে যেতো, আর তাহলে সর্বনাশ হতো এই স্তবকের, এই কবিতার। ভাঙলো মিল, রইলো অনুপ্রাস ; তৃতীয় পঙক্তির মিলহীনতার সুযোগে স্তবকটি একটু পিছনে সরে গেলো যেন, আর সেইজন্যই চতুর্থ পঙক্তিতে তৃতীয় মিলটি ফিরে এসে পূর্ণবেগে আঘাত করতে পারলো। বর্জনকলার অন্য ধরনের উদাহরণ "কৃষ্ণকলি":

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।

তারপর ? আমরা, রবীন্দ্রনাথের অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত বলে, এমন একটি তৃতীয় পঙক্তি আশা করছি, যা 'মোটে-লোটে'র সঙ্গে মিলবে অথবা মিলবে না, কিন্তু, হঠাৎ এখানেই বর্ণনা থামিয়ে, যেন আসল কথাটা এক্ষুনি বলা চাই, এমনি জরুরিভাবে তিনি বলে উঠলেন—

কালো ? তা সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

গভীর কোনো বেদনা নেই বলে "এক গাঁয়ে" বা "কৃষ্ণকলি"কে আমরা 'মহৎ' কবিতা বলতে দ্বিধা করবো, কিন্তু এই মাধুর্যের সঙ্গেই গাঢ় সংরাগ মিলিত হলো রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শিখর 'খেয়া' কাব্যে

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল-আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।'
("অনাবশ্যক")

"কৃষ্ণকলি" ও "অনাবশ্যক" একই স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত, স্তবকের গঠনেরও অনেকখানি সাদৃশ্য আছে ; তবু যে "কৃষ্ণকলি"কে মনে হয় সুখী ও মধুর, আর "অনাবশ্যক"কে আহত ও তীব্র, এতেই বোঝা যায় যে কবিতার পক্ষে ভাষা ও ছন্দ অপরিহার্য হলেও তার আত্মা অন্য কোনো কৌটোতে লুকোনো আছে, এবং সেই কৌটোর রক্ষিকা এমন কোনো দানবী বা দেবী, কবিরাও যাঁর নাম জানেন না।

১৯৬১

রবীন্দ্রনাথের উপমা

উপমাতেই কবিত্ব। কথাটা বলেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে হবে। মনে আছে, এক মাসিকপত্রের পাতায় এটি চোখে পড়ামাত্র আমি চমকে উঠেছিলাম। এর আগে পর্যন্ত আমরা জেনেছিলাম—অন্তত আমাদের শেখানো হয়েছিলো—যে কবিতারচনার বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটি হলো উপমা, বলা যেতে পারে কৌশল, বা সংস্কৃত মতে অলংকার। আর 'অলংকার' শব্দের আক্ষরিক অর্থ যেহেতু কেউ আমাদের বলে দেননি, তাই আমরা ভাবতুম যে উপমা একটা আভরণমাত্র ; থাকলেও চলে, না-থাকলেও ক্ষতি নেই ; আর কার্যত এমন অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার সঙ্গে ততদিনে আমাদের চেনা হয়ে গেছে, যার মধ্যে—যাকে ব্যাকরণের ভাষায় উপমা বলে, তার নামগন্ধ নেই। তাই চমকে উঠেছিলুম এ-কথা শুনে যে উপমাতেই কবিত্ব।

উপমাতেই কবিত্ব ? ভাব কিছু নয় ? কিছু নয় ছন্দের দোলা, মিলের বিন্যাস ? কিছু নয় যাকে বলে জীবনদর্শন, যা কবির সব রচনাকে ধারণ করে আছে ? এ-সব প্রশ্ন উঠতে পারে বইকি, কিন্তু—আমি মানতে বাধ্য যে গত তিরিশ বছর ধরে আমি দিনে-দিনে বুঝেছি যে জীবনানন্দ খুব একটা খাঁটি কথা বলেছিলেন। কোনো নতুন কবির কবিতা যখন পড়েছি, বা কোনো পুরোনো কবিকে হৃদয়ংগম করেছি নতুন করে—তখনই দেখতে পেয়েছি যে কবিতায় যা প্রাণসঞ্চার করে—যে-বিশেষ গুণটির জন্য কয়েকটি শব্দের পারম্পর্য গদ্যের সমতল ছেড়ে কবিতার আকাশে পাখা মেলতে পারে, তা গতানুগতিক অর্থে ছন্দ বা মিল নয়, বা কোনো মহান চিন্তাও নয়—গভীরতম অর্থে তা উপমা।

কিন্তু প্রথমেই 'উপমা' শব্দের পাঠ্যকেতাবি সংকীর্ণ অর্থ আমাদের ভুলতে হবে। 'চাঁদের মতো মুখ', 'মেঘের মতো চুল', 'আকাশের মতো মন' ; সদৃশ বা বিদৃশ বস্তুকে 'মতো' শব্দের দ্বারা যুক্ত করলে তাকে উপমা বলে—কিন্তু শুধু তাকেই বলে না। 'হাওয়াগাড়ি, 'উড়নচণ্ডী', 'দিলদরিয়া'—বাংলা ভাষায় এই ধরনের শব্দগুলোর মধ্যেও

এক-একটি উপমা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সত্যি বলতে, মুখের ভাষাতেও উপমা ভিন্ন মনের কোনো ভাবই আমরা প্রকাশ করতে পারি না। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প, এমনকি প্রতীক—এই সবগুলোকেই উপমার অভিজ্ঞানের মধ্যে ধরে নিতে হবে ; শুধু 'মতো' থাকলেই উপমা হলো তা নয় ; ভাব যেখানে ছবি হয়ে উঠেছে, চিন্তা যেখানে স্পর্শসহ রূপ নিলো, সেখানেই—কোনো-না-কোনো সূক্ষ্ম, চতুর, লুক্কায়িত উপায়ে উপমার ব্যবহার অনিবার্য। ইমেজিস্টদের একটি পণ ছিলো 'মতো' বর্জন করে চলবেন, কিন্তু বোদলেয়ার বা জীবনানন্দ দাশের মতো যে-সব কবি 'মতো' নিয়ে মাতামাতি করেন তাদের চাইতে ইমেজিস্ট কবিতায় উপমার ব্যবহার কিছুমাত্র কম নয় ; এবং যে-কবির কাব্যে 'মতো' শব্দের প্রাদুর্ভাব নেই, সেই রবীন্দ্রনাথেকও উপমাশিল্পী বললে ভুল হয় না।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ উক্তিপ্রধান কবি—উপমাপ্রধান নন—চিত্রকল্পের সাহায্য না-নিয়ে, শুধু সরল প্রার্থনা বা বিবৃতিকে ছন্দোবদ্ধ করে যাঁরা স্মরণীয় কবিতা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চতম শ্রেণীতে তাঁর আসন। অথচ উপমা ও কবিত্ব যে কী-রকম সহবাসী তারও উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর, এবং এ-বিষয়েও তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। আমরা প্রথমেই লক্ষ করি যে যদিও তিনি কালিদাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছিলেন, তবু তাঁর বিপুল রচনাবলির মধ্যে কালিদাসীয় উপমা একটিও নেই ; মধুসূদনের পাঁচ-সাত লাইনের হাঁফ-ধরানো জমকালো উপমাও তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। ভার্জিল বা কালিদাস, মিল্টন বা মধুসূদন—এঁদের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের উপমানৈপুণ্য বিচার করতে গেলে তাঁর ভাগ্যে পাশমার্কাও জুটবে কিনা সন্দেহ। বরং কোনো-এক দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের উপমা ব্যবহার কিছুটা শেক্সপিয়রের মতো : কাব্যের দেহ থেকে তাঁর উপমাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তা প্রবিষ্ট হয়ে থাকে পরতে-পরতে, কাজ করে যায় গোপনে, ফলিয়ে তোলে তার অনুভূতিগুলোকে, তাঁর সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বোধ ও অতীন্দ্রিয় আনন্দবেদনাকে। এইজন্য তাঁর কোনো উপমা স্বতন্ত্রভাবে 'বিখ্যাত' হয়নি : যা বিখ্যাত ও স্মরণীয় হয়েছে তা সম্পূর্ণ এক-একটি কবিতা, বা কবিতার স্তবক বা পঙক্তি বা অংশ। শুধু কি স্মরণীয়? অবিস্মরণীয়, রোমাঞ্চকর, অনিঃশেষ।

উদাহরণ? অভাব নেই উদাহরণের ; তাঁর বহু ভালো কবিতা, ভালো গান, আমার কথার সাক্ষ্য দেবে। তাঁর কবিতায় গান আগুন হয়ে জ্বলে, সুর ছড়িয়ে পড়ে গন্ধ হয়ে, হৃদয়ের বেদনা বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে, 'না-বলা বাণী' মূর্ত হয়ে ওঠে রাত্রির মধ্যে। উপমা নয় এগুলো? এদের ফাঁকে-ফাঁকে 'যেন' বা 'মতো' শব্দটি লুকিয়ে আছে দেখতে পাচ্ছেন না? সেই যোগসূত্রটি নেই বলে আরো দীপ্ত ও বেগবান হয়ে উঠেছে উপমা—একেবারে সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদটিকে পৌঁছিয়ে দেয়া যাচ্ছে। শুধু এক গানকেই কত

ভাবে তুলনা করেছেন তিনি : গানের আগুন, আলো, গন্ধ ; গানের তরী, গানের আসন, গানের আলো ; গানের দৃষ্টি, স্পর্শ, ঝর্না ; গানের বৃষ্টি ; গান তাঁর পথ, গান তাঁর যান, আবার গানই তাঁর পারানির কড়ি। এর চেয়ে আরো একটু জটিল, যেখানে উপমার চিহ্নটুকু পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে—'বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো', 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে', 'দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে', 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি', 'রোদন-ভরা এ বসন্ত'—যদি আমরা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে চিন্তা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই আপাতসরল শব্দবন্ধগুলির মধ্যে দুই সুদূরকে —এমনকি বিপরীতকে—একসূত্রে বাঁধা হয়েছে ; বেদনা ও বিজয়, বিলয় ও উন্মেষ, বিচ্ছেদ ও মিলন—এরা এক দৈব মুহূর্তে পরস্পরে অন্বিত হলো যেন, আমরা যুগপৎ উভয়কেই উপলব্ধি করতে পারলাম। কিংবা ধরা যাক সেই আশ্চর্য পঙক্তিটি—

মেঘের অন্তর-পথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে
চলে গেল দিন।

বা সেই লোকোত্তর স্তবক—

আমি যাব, যেথা তবে তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

স্পষ্ট উপমা নয়—কিন্তু স্পষ্ট নয় বলেই এরা জাগিয়ে তুলছে স্বপ্ন, স্মৃতি, অনুষঙ্গ, যেখানে কথার শেষ এ যেন সেই সীমান্ত—এর পরে বই সরিয়ে শুধু চুপ করে বসে

থাকতে হয়। অন্ধকার থেকে অন্ধকারে দিনের চলে যাওয়ার একটা দৃশ্যরূপ তবু ধরা পড়ে, কিন্তু আমরা ভাবতে পারি না, গতিশীল বায়ু কেমন করে নিশ্চল অন্ধকারের অনুসরণ করতে পারে—কিংবা, মৃত্যুকে এক অন্ধকার নদী বলে কল্পনা করার পর, একেবারে শেষ পঙক্তিতে এসে কবি হঠাৎ কেমন তাকে 'রাঙা' বললেন, বা দেখতে পেলেন তা বৃষ্টির মতো আকাশ থেকে নামছে, তাও আমাদের যুক্তিতর্কের পরপারে। কিন্তু সেইজন্যই, তা ভাবতে পারি না বলেই, এর রহস্য অফুরান, আর এই হলো সত্যিকার খাঁটি কবিতা। মালার্মে বলেছিলেন যে ভাষার সর্বত্র কবিতা আছে ; এ-কথা যে-ভাবে সত্য তার চেয়ে সার্থকভাবে বলা যায় যে কবিতার সর্বত্র আছে উপমা।

১৯৬০

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ দুই শতকের মানুষ : তাঁর এক অর্ধ উনিশ শতকের অন্তর্ভূত, অর্ধান্তরে তিনি বিশ শতকের অধিবাসী। প্রায় গাণিতিক অর্থে বিভক্ত তাঁর আয়ুষ্কাল, এবং তাঁর চিন্তায় ও রচনাতেও এই বিভেদ সুস্পষ্ট। একদিকে তিনি উনিশ-শতকী বাংলাদেশের যোগ্য প্রতিনিধি—দেশপ্রেমিক, সমাজসচেতন, সংস্কারপন্থী ; অন্যদিকে তিনি ভাষার সাধক, ছন্দের পূজারি, ধ্যানী, মরমী, স্বপ্নাকুল—অর্থাৎ, অন্য দিকে তিনি কবি ছাড়া আর-কিছু নন। এই দুই নিয়েই রবীন্দ্রনাথ, এই দু-ই তাঁর মধ্যে সত্য, এবং এ-দুয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর সমগ্র রচনাবলিতে আমরা দেখতে পাই।

উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালি এমন কেউ ছিলেন না যিনি দেশের কথা না ভাবতেন ; সনাতন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-আহ্নিকের মতো সেটাও তাঁদের নিত্যকর্ম ছিলো। দেশ পরাধীন, জাতি বহুবিধ আধুনিক বিষয়ে অনুন্নত, সমাজব্যবস্থা আত্মঘাতী ; এ-সব বিষয়ে চেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তীব্র হয়ে উঠলো সংস্কারের চেষ্টা, জাগলো নতুন ধর্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, সমাজ বিষয়ে অভিনব পরিকল্পনা ;—রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বিবেকানন্দে এই জাগরণের উজ্জ্বল ইতিহাস আমরা দেখেছি। সেইরকম সময়ে সাহিত্যিকেরও দূরে থাকার উপায় ছিলো না ; তিনিও চেয়েছেন তাঁর রচনার দ্বারা সমাজের মঙ্গলসাধন করতে, পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে, উপদেষ্টার আসন নিতে দ্বিধা করেননি। বঙ্কিম যে-লোকশিক্ষার কথা বলেছিলেন, সেটাকেই সাধারণভাবে উনিশ-শতকী লেখকদের মূলসূত্র বলে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ, তাঁদের রচনার পিছনে একটি হিতকারী উদ্দেশ্য প্রায় সব সময়ই ধরা পড়ে ; আমরা আজকাল যাকে আর্ট বলি, তার বিশেষ মূল্য বা অর্থ তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়নি—অন্তত তার স্পষ্ট কোনো আদর্শের তাঁরা অনুগামী ছিলেন না। এই লক্ষণ রবীন্দ্রনাথেও বহুলভাবে বিদ্যমান। তাঁর গদ্যপ্রবন্ধগুলির দ্বারা তিনি বিচিত্রভাবে তাঁর স্বজাতির চিত্তকে প্রবুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেছেন ; ব্যাখ্যা, প্রচার, আন্দোলন, বাদানুবাদ—কিছুকেই তাঁর মনোযোগের অযোগ্য

বলে ভাবেননি ; তাঁর উচ্ছ্বাস ও পুনরুক্তিগুলোতেও তাঁর ব্যগ্রতারই পরিচয় পাই আমরা। এ-সব রচনায় তিনি যেন সাহিত্যিক প্রতিভাকে জাতির উন্নয়নসেবায় নিয়োজিত করছেন : এই প্রচারকর্মের সার্থকতা বিষয়ে তাঁর মনে অণুমাত্র সংশয় নেই।

কিন্তু কবিতায় তাঁর আর-এক সত্তা, হয়তো তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতে, ধীরে-ধীরে নিজেকে বিকশিত করে তুলছিলো। সমাজচিন্তা সেখানেও প্রবেশ করেনি তা নয়—বারে-বারেই করেছে, একেবারে সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত তাঁকে মুক্তি দেয়নি ; তবু কবিতায় সেটিকে মনে হয় যেন বিবাদী সুর, মাঝে-মাঝে বিসংগতি ঘটিয়ে তাঁর কাব্যের বিরাট অর্কেস্ট্রাকে পূর্ণ করে তুলছে। কী আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগেকার 'মানসী' ও 'সোনার তরী'—বাংলা ভাষায় কী অপূর্ব ও অকল্পনীয়, কী দেবদুর্লভ বীণাঝংকার সেখানে বেজে উঠলো ! 'মানসী'র একটি কবিতা—"নিষ্ফল কামনা"—যখন লেখা হলো, সেই মুহূর্তটিকেই নতুন ও আধুনিক বাংলা কবিতার জন্মক্ষণ বলবো আমি। দেশ-কালের পরপারে শাশ্বত মানুষের হাহাকার বৈষ্ণব কবিতাতেও আমরা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি-মানুষের বেদনাধ্বনি 'মানসী'তেই প্রথম। কিন্তু 'চিত্রা'তেই দেখা দিলো যা বিশেষভাবে স্থানীয় ও সাময়িক ; আরম্ভ হলো রবীন্দ্রনাথের দুই সত্তার বিসংবাদ।

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে ? ("এবার ফিরাও মোরে")

নিজের প্রতি এই ভর্ৎসনা ও উপদেশের পর, দুই বৎসরের ব্যবধানে, একেবারে ঠিক উল্টো কথা বললেন রবীন্দ্রনাথ, চাইলেন 'কর্মভীরু স্বেচ্ছাবন্দী অলস দাস' হয়ে কোনো-এক রানীর আনন্দসাধনে আত্মনিবেদন করতে।

আছে দেবী, আরো আছে—
নানা কর্ম নানা পদ নিল তোর কাছে
নানা জনে ; এক কর্ম কেহ চাহে নাই,

ভৃত্য-'পরে দয়া করে দেহো মোরে তাই—
আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর।

মালাকর ?

ক্ষুদ্র মালাকর। অবসর
লব সব কাজে। ("আবেদন")

'আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর!' এই ঘোষণা ক্ষণিক নয়, আকস্মিক নয়, তাঁর সমগ্র রচনার মধ্যে ধ্রুবপদের মতো ধ্বনিত। 'সোনার তরী'র "নিরুদ্দেশ যাত্রা" এবং 'চিত্রা'র অন্য দুটি কবিতা—"অন্তর্যামী" ও "জীবনদেবতা"—আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ যে-দেবী বা দেবতার চরণে উৎসর্গিত, তাঁরই রহস্যের প্রসাদে 'স্বর্গের ছবি' পৃথিবীতে নিয়ে আসা সম্ভব।

'ক্ষণিকা', 'কল্পনা', 'খেয়া'—এ-সব গ্রন্থে তাঁর কবিসত্তার প্রকাশ আরো অখণ্ড হলো ; কিছুটা ত্যাগী ও আত্মস্থ হলেন তিনি ; ঘনীভূত করে তুললেন তাঁর অন্তরতম ব্যাকুলতাকে। 'হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, / ... মন নাহি মোর কিছুতেই, নাই/ কিছুতে', 'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,/এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।', 'আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা,/দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।' —এ-সব কথা যেন কবির এক সাংকেতিক স্বীকারোক্তি, আমাদের সাংসারিক সংগ্রাম থেকে 'দূরে বহুদূরে' এক 'স্বপ্নলোক' থেকে উৎসারিত। তারপর 'গীতাঞ্জলি' পর্যায় ; তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনে যা-কিছু তিনি দেখেছিলেন, পড়েছিলেন, লিখেছিলেন, ভেবেছিলেন, তাঁর সব ভ্রমণ ও কর্ম, আনন্দ ও শোক, অনুভূতি ও উপলব্ধি—সেই সম্মিলিত সমস্ত-কিছুর নির্যাস যেন বিন্দু-বিন্দু করে ক্ষরিত করলেন সেই ক্ষুদ্রকায়, সরল ও সমৃদ্ধ গীতিগুচ্ছে। কিন্তু এর পরেই 'বলাকা'য়, এবং আরো বেশি 'পলাতকা'য়, সমকালীন জগৎ ও বাংলাদেশকে তিনি কাব্যের অন্তরঙ্গ করে নিলেন—এমনকি তাঁর তৎকালীন ছোটোগল্পের মতো, কবিতাতেও সামাজিক 'সমস্যা' অবতীর্ণ হলো : 'পলাতকা'র অধিকাংশ রচনাকে ছন্দোবদ্ধ ছোটোগল্প বললে ভুল হয় না। এবং সাধারণত যাকে তাঁর শেষ পর্যায় বলা হয়, জীবনের শেষ দশ বছরের মধ্যে রচিত 'পরিশেষ' থেকে 'নবজাতক' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থ—এগুলিতে আমরা লক্ষ করি যেন দেশের ও জগতের অবস্থা বিষয়ে তাঁর অস্বস্তি ক্রমবর্ধমান, তা এক-এক সময় প্রায় দুশ্চিন্তার আকার ধারণ করছে। তার যথেষ্ট কারণ ছিলো নিশ্চয়ই ; ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অধ্যায়, পৃথিবীতে

কম্যুনিজ়ম ও ফাশিজ়ম-এর উত্থান, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা—যা তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়নি—স্বজাতির শতাব্দীসঞ্চিত দুঃখভার—এই সব-কিছুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন অপরাধীর উদ্দেশে অভিশাপ ও ত্রাণকর্তার প্রতি প্রার্থনার মধ্যে দোলায়িত হচ্ছিলো। তাঁর সমগ্র কবিতার মধ্যে মাত্র এই শেষ পর্যায়কেই বলা যেতে পারে সমাজচিন্তার দ্বারা বিশেষভাবে অধিকৃত, কিন্তু সেই কারণে যাঁরা এই কবিতাগুচ্ছকে উৎকৃষ্ট বলে ঘোষণা করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। পারি না, কারণ কবিতার মূল্য বিষয়ে নয়, তার নিজেরই মধ্যে ; এবং কবিতার সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যা অমোঘভাবে বলেছেন, পরবর্তী কবিতাগুচ্ছ তারই পরিবর্ধন, অলংকরণ ও সম্প্রসারণ ; মাঝে-মাঝে রূপকরণে অভিনব, মাঝে-মাঝে ভঙ্গিতে হৃদয়গ্রাহী ; কিন্তু মোটের উপর এক প্রতিভাশালী পুনরাবৃত্তির লীলাভূমি।

১৯৬০

রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বকবি ও বাঙালি

যেন এক দৈব আবির্ভাব—অপর্যাপ্ত, চেষ্টাহীন, ভাস্বর, পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম : আমার কাছে এবং আমার মতো আরো অনেকের কাছে, এ-ই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর তুল্য ক্ষমতা ও উদ্যম ভাষার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে বিরল : এবং ভাষাব্যবহারের দক্ষতায়, কবিতা ও গদ্যরচনার যুগপৎ অনুশীলনে, বহু ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় ও রূপকল্পের সার্থক প্রয়োজনায়— সব মিলিয়ে, অন্য দেশে বা কালে, তাঁর সমকক্ষ ক-জন আছে বা কেউ আছেন কিনা, তা আমি অন্তত গবেষণার বিষয় বলে মনে করি। আমি যেহেতু বাঙালি, উপরন্তু সাহিত্যে সচেষ্ট, আর যেহেতু আমার কৈশোরকালে রবীন্দ্রনাথে নিমজ্জন ঘটেছিলো, তাই আমার কাছে এ-সব কথা তর্কাতীত। অন্যান্য বাঙালি—যাঁরা বয়সে আমার বড়ো বা ছোটো, এবং যাঁরা লেখক হওয়া দূরে থাক রবীন্দ্রনাথের বা সাহিত্যের পাঠক পর্যন্ত নন, কিংবা যাঁরা পাঠক হয়েও আমাকে সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করেন—এই একটা বিষয়ে তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত বলে ধরে নেয়া যায়, তাঁদের মতামতের মূল্য যা-ই হোক না। কেননা, রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জীবনে এমনভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এত বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর দ্বারা আমরা অনবরত সংক্রান্ত, যে তাঁর শ্রেষ্ঠতা মেনে নিতে হলে তাঁর কবিতা, বা কোনো কবিতা, পড়ে দেখার আর প্রয়োজন হয় না। চিন্তাহীন মাল্যচন্দনে আজ আবৃত তিনি, এক বিগ্রহ, তাঁর মাতৃভূমির নব্যতম 'অবতার'।

আর বিদেশে ? অবাঙালির কাছে ? বলতেই হবে আমরা যেটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ভাবি, অন্যদের কাছে তা অতি অস্পষ্ট একটি অনুমান মাত্র। দান্তের কবিতা অনুবাদে পড়ে জগতের লোক আনন্দিত ; জর্মানিতে এমন দিন যায় না যেদিন কোনো-না-কোনো নগরে 'জর্মান কবি' শেক্সপিয়রের অভিনয় না হচ্ছে ; যাঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশি বিদগ্ধ হয়েও চীনে ভাষায় আমারই মতো নিরক্ষর, এমন অনেকে লি-পোকে মহাকবি বলে অনুভব করেছেন : কিন্তু জগতের পটভূমিকায় কবি রবীন্দ্রনাথের কোনো

চিহ্ন নেই। এই শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে জগৎ তাঁকে যে-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো, তা ভারতের অতীত গৌরবেরই মতো, আজ নিতান্ত স্মৃতিকথায় পর্যবসিত। কেন এমন দ্রুত হলো তাঁর অবক্ষয়, আর আপাতত এমন আশাহীন, কেন তাঁর মৃত্যু অথবা শতবার্ষিকীও তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করতে পারলে না? শতবার্ষিকীর ব্রতপালনে সভ্য জাতিরা পরাঙ্মুখ হননি ; আমাদের এই 'দূরদেশী রাখাল ছেলে'টিকে সিন্ধুপারের রাজকন্যারা স্মরণ করেছেন ; তা জানতে পেরে আমরাও প্রীত হয়েছি। কিন্তু বিষাদও আমরা এড়াতে পারি না, যখন ভেবে দেখি যে এই উপলক্ষে যা-কিছু কথাবার্তা আমরা শুনলাম, তার সঙ্গে ক বি রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ নামমাত্র। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতীক তিনি, আন্তর্জাতিকতার পুরোহিত, শান্তির দূত, দুর্বলের বন্ধু, শোষকের শত্রু, মানবপ্রেমিক, ঈশ্বরপ্রেমিক, পূর্ব-পশ্চিমে মিলনমন্ত্রের উদ্গাতা—এমনি নানা দিক থেকে কতবার তাঁকে অর্ঘ্য দেয়া হলো! এই সবই ছিলেন তিনি, কিন্তু এ-সব স্মর্তব্য হতো না যদি তিনি কবি না-হতেন, তাঁর কবিতার জন্যই তাঁর অন্য সব চেষ্টা অর্থ পেয়েছে, যেহেতু তিনি কবিতা লিখতেন তাই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। আর সেই তাঁর কবিতা কেমন একান্তভাবে বাঙালির সম্পত্তি হয়ে গেলো, বাংলা ভাষার পরিধির বাইরে, মহাবিশ্বে, তার স্থান নেই। এখনো আমরা দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছি সেই বিদেশী পাঠকের প্রত্যাশায়, যিনি এসে আমাদের বলবেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর ভালো লাগে—উন্নত ধারণার বাহন হিশেবে নয়—শুধু কবিতা বলেই।

আমি ভুলে যাচ্ছি না যে অর্ধশতাব্দী আগে তিন প্রতীচ্য পুরুষ—আয়র্লন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার সন্তান—ইংরেজিতে 'গীতাঞ্জলি' পড়ে সে-বিষয়ে প্রখর বোধসম্পন্ন আলোচনা লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধত্রয়ে আজকের দিনেও বিস্ময়ের উপাদান আছে। ইয়েটস, জ্বিদ ও পাউন্ডের সাংস্কৃতিক উৎস ছিলো বিভিন্ন, এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শগত সাদৃশ্য তাঁদের কারোরই ছিলো না ; অথচ তিনজনেই যেন সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রায় দৃষ্টান্ত হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। কেন সেই উৎসাহ তাঁদের অচিরেই নির্বাপিত হলো? কেন, প্রতীচীতে, তাঁর জয়যাত্রার মাত্রই কুড়ি বছর পরে, রবীন্দ্রনাথের নামের উপরে নেমে এলো সৌজন্যস্নিগ্ধ উদাসীনতার আচ্ছাদন, অথবা, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অগুপ্ত প্রত্যাখ্যান? এর একটা সুস্পষ্ট কারণ—হয়তো-বা প্রধান কারণ—যথাযোগ্য ও পর্যাপ্তপরিমাণ অনুবাদের অভাব ; এই প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য হলেও এখানে আমার বিষয়ীভূত নয়। অন্য একটি কারণ এই যে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম প্রতীচ্য পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথের ললাটে 'ধর্মীয়' কবির মারাত্মক তিলক এঁকে দিয়েছিলো। এর ফলে সেই সব মহলে আজও তাঁর নাম উল্লিখিত হয়ে থাকে, যেখানে আছেন পেশাদার সাধু, গুহ্য জ্ঞানী, শৌখিন অধ্যাত্মবাদী, এবং খলিল জিব্রান-এর মতো

ভাবালুতাময় পদ্যরচয়িতা। যখন, ১৯১৫ সালে, রবীন্দ্রনাথ *One Hundred Poems of Kabir* প্রকাশ করলেন, তখন যে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝলেন তারও এই একই কারণ। শোনা যায়, ঐ পুস্তক পড়ে লন্ডনে তাঁর বন্ধুরা বলাবলি করেছেন, 'এটা উনি ছাপালেন কেন? এখন ওঁর লেখা কে পড়বে?' কবির, মধ্যযুগের মরমী, তাঁকে এঁদের মনে হলো রবীন্দ্রনাথেরই ধরনের অন্য এক কবি, কিন্তু আরো বিশুদ্ধ। 'পৌরুষে উন্নত' এই কবির—কথাগুলো এডওঅর্ড টমসনের লেখা থেকে তর্জমা করে দিচ্ছি—'যে-সব উপমা রবীন্দ্রনাথে মামুলি তার ব্যবহার কবিরের কাব্যে অনেক বেশি আন্তরিক, ... রবীন্দ্রনাথের ঢোলকগুলো সাহিত্যিক, সত্যিকারের নয়।' হায়, ভ্রান্তি! —আর এই ভ্রান্তির জন্য দায়ী ইংরেজ মনীষীরাই, কবির অথবা রবীন্দ্রনাথ নন। 'হিন্দু' —এই জাদুশব্দ থেকে তাঁরা যেহেতু রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নিতে পারেননি, তাই একটি সহজ সত্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো—যে কবির আসলে খাঁটি মরমী, আর রবীন্দ্রনাথ খাঁটি কবি, এবং মরমীরা মাঝে-মাঝে কবিতা লিখলেও তাঁরা অভিপ্রায়বশত কবি হন না, আর কবিদের পক্ষে মরমী ভাব সম্ভব হলেও সেই ভাবটিকেও তাঁরা সচেতন শিল্পিতার দ্বারা প্রকাশ করেন—যে-শিল্পিতা অলোকদ্রষ্টার অনুপযোগী।

রবীন্দ্রনাথের অবক্ষয়ের একটি তৃতীয় কারণ আছে—টমসন তা উল্লেখ করতে ভোলেননি, এবং আমরাও অনেকে অনুভব করেছি। প্রথম মহাযুদ্ধের যখন শেষ, তখনই সাহিত্যে এক নবযুগের আরম্ভ।* সুর, শৈলী, রূপকল্প, কবিতার ও জগতের প্রতি কবিদের মনোভাব সব-কিছুরই পরিবর্তন হলো, আর তা শুধু প্রতীচীতে নয়, সারা জগতে, বলা বাহুল্য বাংলাদেশেও। এই বিপ্লবের চরম ক্ষণে রবীন্দ্রনাথ সত্তর ছুঁয়েছেন, আর যেহেতু তিনি তখন গদ্যকবিতা লিখেছিলেন, আর দৈনন্দিনকে স্থান দিয়েছিলেন কবিতায়, তাই যাঁরা রবীন্দ্রনাথে সেই বিপ্লবের লক্ষণ দেখতে পান, আমি বলতে বাধ্য তাঁরা কবিতার সংবেদী পাঠক নন। জীবন ও কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যৌবন থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একই ধারণা পোষণ করে গেছেন, আর তাঁর ক্ষেত্রে সেটাকেই হয়তো স্বাভাবিক বলে ভাবা যেতে পারে। টমসন বাংলা জানতেন, বোলপুর ও কলকাতার সঙ্গে সংযোগ হারাননি; অবশেষে এই খেদময় সিদ্ধান্তে তাঁকে পৌঁছতে হলো যে এলিয়ট যে-কালে অধিনায়ক, সে-কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবিচার অনিবার্য। এই কি

* আসলে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ফরাশি দেশে এই নবযুগের আরম্ভ, কিন্তু ইংলন্ডে তা বিশ-শতকী ঘটনা।

ঠিক কথা, বা সব কথা, না কি এতে শুধু আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হলো ?*

আমরা অবশ্য ওঅর্ডস্বার্থ ও উগোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে এক নৌকোয় বসিয়ে দিতে পারি, তাহলে আর তাঁর বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। বলতে পারি, এই কবিরা নিজ-নিজ গুণে মহৎ, কিন্তু বর্তমান 'যুগধর্ম' এঁদের বিরোধী, আর এ-ব্যাপারে কারোরই কিছু করবার নেই। ওঅর্ডস্বার্থ যাঁদের ক্লান্ত করে না, কিংবা যাঁরা আকস্মিক স্তবকের বাইরে অবিরলভাবে শেলিকে উপভোগ করেন, এমন পাঠক আজ যে-কোনো দেশেই বিরল। আর রবীন্দ্রনাথে কিছুটা ওঅর্ডস্বার্থ আছেন, কিছুটা শেলি ও কীটস, এমনকি—কথাটা আমাদের যতই খারাপ লাগুক না—টেনিসনের সঙ্গেও মাঝে-মাঝে তাঁর জ্ঞাতিত্ব ধরা পড়ে। আর হুইটম্যান খুললে রবীন্দ্রনাথকে যাঁর মনে না পড়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়েননি। কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথ কি এমন কবি, যাঁকে আমরা ওঅর্ডস্বার্থ বা টেনিসন, শেলি বা কীটসের সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসাতে পারি ? বা অন্য কোনো রোমান্টিক কবির সঙ্গে, যাঁর চরিত্রলক্ষণ অংশত রবীন্দ্রনাথেরও ? সামগ্রিকভাবে, এবং মুহূর্তের জন্যও, রবীন্দ্রনাথকে চিন্তা করলে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি, এই প্রশ্ন কত অবান্তর। ঐতিহাসিক অবস্থার হিশেবে তাঁর সঙ্গে ভিক্তর উগোর, আর তার চেয়েও বেশি পুশকিনের—সাদৃশ্য স্বীকার্য ; কবিতা ও গদ্যের কোনো-কোনো প্রকরণে তাঁর চেয়ে মহৎ শিল্পীও উনিশ-শতকী য়োরোপীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে অতুলনীয় বলার লোভ অদম্য হয়ে ওঠে যখন আমরা তাঁর ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য ও পরিমাণ স্মরণে আনি। সামগ্রিক কৃতির দিক থেকে তাঁর সঙ্গে সার্থক তুলনা চলে, এমন প্রতীচ্য কবি একজনমাত্র আছেন : তিনি গ্যেটে। আর এই 'যুগধর্ম' কি গ্যেটেরও

---

* রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য খ্যাতির পিছনে রাজনীতিও কম ছিলো না—এখানে খুব সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে, তিনি তাদের শত্রুর শত্রু এই ধারণাবশত, জর্মান জনসাধারণ তাঁর 'পদতলে লুণ্ঠিত' হয়েছিলো ; কৌতূহলী পাঠক *Rabindranath Tagore in Germany* নামক পুস্তিকায় (প্রকাশক : মোক্ষমূলর ভবন, নয়া দিল্লি) পাউল নাটর্প-এর প্রবন্ধ পড়ে দেখতে পারেন। পক্ষান্তরে, ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথে দেখেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যনীতির একটি সমর্থন ও ক্ষতিপূরণ : এই কবির কাছে তাঁর আশা করেছিলেন ধীর বন্ধুতা, তাঁকে স্তুতি করেছিলেন 'নাইট' উপাধি অর্পণ করে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ঐ 'ছার উপাধি' ত্যাগ করলেন তখন কলকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা মন্তব্য করলে : 'এই বাঙালি কবি, যাঁর নাম পঞ্জাবে কেউ শোনেনি, আর যিনি লেখক হিশেবে নিশ্চয়ই কর্নেল ফ্র্যাঙ্ক জনসন-এর মতো জনপ্রিয় নন, তিনি নাইটই হোন বা শাদাশিধে বাবুই থেকে যান, তাতে ব্রিটিশ রাজত্বের সম্মান ও দার্ঢ্যের পক্ষে এক কানাকড়িও যেন এসে যায়!'—এই কর্নেল ফ্র্যাঙ্ক জনসন নামক 'লেখক'টি কে, তা নিয়ে গবেষণা করার আমি অবশ্য উৎসাহ পাইনি।

বিরুদ্ধে কাজ করছে না ? এমন অনেকের কথা আমরা তো জানি, যাঁরা রুচিতে ও রসবোধে প্রকৃষ্ট, অথচ আনন্দের জন্য কবিতা পড়তে হলে গ্যেটেকে যাঁরা এড়িয়ে চলেন। গ্যেটের বিপুলতা, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির অতি সুস্পষ্ট সমারোহ—এগুলোই যেন তাঁর সম্মুখীন হবার বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনিও, রবীন্দ্রনাথের মতো, জীবনের শুভত্ব বিষয়ে নিঃসংশয় ; 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—এই কথা, যা আধুনিক মানুষের পক্ষে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করা দুঃসাধ্য, ঠিক এই কথাই দ্বিতীয় 'ফাউস্টে'র ঘোষণা।* অথচ যে-যুগে উগো ও লামার্তিন পাণ্ডুর, ওঅর্ডস্বার্থের প্রভাব বিলুপ্ত, সেই একালকেও কেমন গ্যেটের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে হচ্ছে, তাঁকে অপছন্দ করলেও অবহেলা করার উপায় নেই। টি. এস. এলিয়ট, যাঁর কাছে ফাউস্টীয় কাব্য ও জীবনদর্শন সমান অপ্রিয় বলে ধরে নেয়া যায়, তাঁকেও অবশেষে, ঢোক গিলে, 'জ্ঞানী গ্যেটে'কে বিনতি জানাতে হলো। আর পোল ক্লোদেলের মতে যিনি এক 'বিরাট গম্ভীর গর্দভ', সেই গ্যেটেকেই ভালেরি বললেন 'জগতের জুয়োখেলার টেবিলে এক মহাভাগ্যবান দান।' এমনি অন্য এক ভাগ্যের খেলা হলেন রবীন্দ্রনাথ, অদৃষ্টের আশ্চর্য এক উচ্ছ্বাস ; আর পাশ্চাত্ত্য জগৎ, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েও, তাঁকে অতি সহজে বিস্মৃত হলো। এরকম হবার কারণ কী ?

বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রসঙ্গে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথে তুলনা চলে না, কেননা গ্যেটে য়োরোপীয়—আর তা শুধু আক্ষরিক অর্থে নয়, আদর্শের দিক থেকে ; একটি নিখিল-য়োরোপীয় চেতনার তিনি জনক, আর সেই কারণে প্রতীচীর পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ধারণাটিরও প্রবক্তা তিনি, তিনিই তাঁর য়োরোপীয় চৈতন্য থেকে গড়ে তুলেছিলেন সেই আদর্শ জগৎ, যা সর্বমানবের মিলনস্থল। 'সর্বমানব' কথাটি লেখা বা বলা সহজ, কিন্তু তার উপলব্ধি দুরূহ। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের কাছে, অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী শ্বেতাঙ্গের কাছেও, আজকের দিন পর্যন্ত 'প্রতীচী' ও 'জগৎ' প্রায় সমার্থক শব্দ ; প্রতীচীর বাইরে ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক পৃথিবী আছে তা তাঁরা জানেন, কিন্তু তাঁদের সমকালীন সাহিত্যিক চৈতন্যের কাছে তার অস্তিত্ব অতি অস্পষ্ট। কিন্তু প্রায় দেড়শো বছর আগে গ্যেটে বুঝেছিলেন যে এক 'আন্তর্জাতিক কথোপকথনে'রই নামান্তর হলো সাহিত্য, আর 'এই জগৎ, তা যত বড়োই হোক, তা

---

* 'ধন্য তোমরা, আমার চক্ষুদ্বয়—যা-কিছু তোমরা দেখেছো, তা যেমনই হোক না তা-ই পরম সুন্দর !'—(প্রহরীর গান, 'ফাউস্ট', দ্বিতীয় খণ্ড।) এখানে উল্লেখ্য যে 'ফাউস্টে'র আস্বর্গনরক ঘটনাবলির পরে এই উক্তির একটি নাটকীয় সার্থকতা আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে বিশ্বাসের ঘোষণা অধিকাংশ স্থলেই নির্দ্বন্দ্ব।

সম্প্রসারিত মাতৃভূমি ছাড়া কিছু নয়।' আর তারপর : 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি/ সেই ঘর মরি খুঁজিয়া / দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি / সেই দেশ লব যুঝিয়া।' বাঙালি পাঠকের হয়তো অজানা নেই যে দ্বিতীয় অংশটির বক্তা এমন এক কবি, যিনি অত্যন্ত বাঙালি, অত্যন্ত ভারতীয়, এবং যিনি মানবশিশুকে 'জগৎ-পারাবারের তীরে' খেলা করতে দেখেছিলেন। যে-বিশ্ববোধ গ্যেটে আয়ত্ত করেছিলেন সচেতন ও সচেষ্টভাবে, তা ছিলো রবীন্দ্রনাথে স্বজ্ঞাপ্রসূত ; গ্যেটের পক্ষে যা বার্ধক্যের উপার্জন, তা রবীন্দ্রনাথে আযৌবন অবিচ্ছেদী। এ-দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে গ্যেটের স্বপ্ন যে-মানুষের মধ্যে প্রথম সার্থক হলো তিনিই রবীন্দ্রনাথ, যে প্রকৃতির এই আশাতীত দানের মধ্যে গ্যেটের আদর্শ বাস্তব হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের দেশের মাটিতে 'বিশ্বময়ী' তাঁর আঁচল পেতে রেখেছেন, আর সেইজন্যই সেই 'মাটি' প্রণম্য ; আর তাঁর ভগবান যেখানে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে ভগবানের সঙ্গে মিলন তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর কবিতায় যে-সব শব্দ পৌনঃপুনিক, তার অন্যতম হলো বিশ্ব ; হয়তো সেটা একটা কারণ, যে-জন্যে বাঙালিরা তাঁকে 'বিশ্বকবি' আখ্যা দিয়েছিলো। কিন্তু, আবার গ্যেটেকে স্মরণ করলে, মনে কি হয় না যে এই উপাধি সত্যই তাঁর প্রাপ্য? আজকের দিনে বঙ্গভাষী ছাড়া তাঁর কবিতার পাঠক বেশি নেই, কিন্তু জাগতিক প্রচার থাক বা না-ই থাক, অন্য এক অর্থেও তিনি বিশ্বকবি।

'বিশ্বকবি' কথাটায় দুই আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে। যাঁরা চিরায়ত কবি, অর্থাৎ সর্বদেশে ও সর্বকালে যাঁদের কোনো-না-কোনো রচনার কিছু-না-কিছু গুণগ্রাহী পাঠক থাকে, ঐ উপাধি নিশ্চয়ই তাঁদের প্রাপ্য, য়োরোপের ভাষায় এঁদেরই বলা হয় ক্লাসিক। আবার এমন কবিকেও বিশ্বকবি বলা সংগত, যাঁর চিন্তায় জগতের সাহিত্য এক ও অভিন্ন—রূপকরণে অফুরানভাবে বিচিত্র হলেও নির্যাসে এক, যাঁর মনের মধ্যে সাহিত্য এক বিশাল ও বিরতিহীন উৎসবের মতো উপস্থিত, যেখানে সব যুগ, সব জাতি একত্র হয়েছে, আর তিনিও ক্ষণকালের জন্য আহ্বান পেয়েছেন। সর্বোত্তম কবিদের পক্ষে সাধারণত এই অর্থ সম্পৃক্ত বা অন্যোন্যনির্ভর, কিন্তু আমার বিশ্বাস দ্বিতীয় গুণটি বিরলতর, এবং গ্যেটের ধারণার অধিক অনুগামী। আর এই বিশ্ববোধই বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রলক্ষণ। স্মর্তব্য, গ্যেটের জীবৎকালের তুলনায় 'বিশ্বে'র আয়তন এখন বৃহত্তর, তার সাংস্কৃতিক অবয়বরেখাও এক নেই। রুশ সাহিত্যের উত্থান, আমেরিকার আত্মোপলব্ধি, পূর্ব পৃথিবীর প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির নবজাগরণ—গ্যেটের মৃত্যুর পরে এই সব ঘটনা জগতের মানসচিত্র বদলে দিয়েছে। গ্যেটের চিন্তাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য জগৎ আজ প্রস্তুত ও সচেষ্ট, এই প্রয়াসের পরিধি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও বাদ পড়েনি। সব বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে একটি আন্তর সম্বন্ধ বিদ্যমান, এই বিশ্বাসের

উপর গড়ে উঠেছে সেই আধুনিক বিদ্যা, যাকে শিক্ষাব্রতীরা 'তুলনামূলক সাহিত্য' নাম দিয়েছেন। 'তুলনামূলক সাহিত্য'—'তোমার কিংবা আমার সাহিত্য' নয়, মানুষের বহুবিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে একানুভূতির অনুসরণ—১৯০৭ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে আমাদের কবিও একে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেছেন—কিন্তু গ্যেটের মনন থেকে উদ্ভূত এই আশ্চর্য ধারণাটি, এই অভিনব ও আবহমান বিশ্বসাহিত্য—আজ রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে তা অসম্পূর্ণ। শুধু ভারতীয়, এশীয় বা প্রাচ্য, কবি বলে ভাবলে তাঁর মর্মস্থলে পৌঁছনো যাবে না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের পৃথক্করণ সার্থক নয় তা নয় ; ভাষা বা জাতি অনুসারে সূক্ষ্মতর উপবিভাগের মূল্যও যথাস্থলে স্বীকার্য। কিন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক তিনি আজ প্রতীচীতে ম্লান হয়ে আছেন শুধু ভারতীয় বলে, বা তাঁর রচনা থেকে যথোচিত অনুবাদের অভাবে, এ-কথা ভাবলে আমরা বোধহয় ভুল করবো। আংশিক কারণ হিশেবে দুটোই বিবেচ্য হতে পারে, এবং দ্বিতীয়টি অবশ্যই মান্য, কিন্তু এটুকুই সব কথা নয়। গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথে তুলনা করলে একটি তথ্য বেরিয়ে আসে, আর সেখানেই জর্মান কবির অনাক্রমণীয় প্রতিষ্ঠা। ঋজু, প্রত্যক্ষ, দার্ঢ্যগুণে নিটোল—এই হলেন গ্যেটে : তিনি যে একজন মহাজ্ঞানী তা অসতর্ক পাঠকেরও লক্ষ না-করে উপায় নেই ; শ্রীযুক্ত এলিয়ট এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে গ্যেটের যাবতীয় কবিতা ও গদ্যরচনা তাঁর 'প্রজ্ঞার উদাহরণ মাত্র' ('merely illustrations of his wisdom')। পাঠককে অনুরোধ জানাই ঐ 'মাত্র' কথাটি স্মরণে রাখতে ; ভাবখানা এই রকম দাঁড়ালো যেন গ্যেটে আমাদের জ্ঞানদানের জন্যই গদ্যে-পদ্যে বিস্তর লিখেছিলেন—কিন্তু এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তবে এই অর্থে গ্যেটের কবিতার পক্ষে তাঁর জ্ঞান মূল্যবান যে আমাদের প্রাথমিক বিরুদ্ধতাকে তা ভেঙে দিতে পারে, পারে অনুবাদের প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে ; —যাকে তিনি আনন্দ দিতে পারেন না তাকেও তাঁর স্পষ্ট কিছু দেবার আছে। ঐ জ্ঞান অথবা প্রজ্ঞা—একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই বিদেশীর কাছে গ্যেটের অর্থ বুঝিয়ে দেয়া হয়, এই ভিত্তির উপরেই জগতের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যা ঘটেছে তাকে আমরা বলতে পারি নারী-প্রকৃতির গুঞ্জনময় প্রকাশ : তাঁর মাধুরী পরোক্ষতায়, অর্ধাবগুণ্ঠনে, গতিভঙ্গে, এক কমনীয় ও প্রতারক সরলতায়। তাঁর কাছে যেতে হলে বিদ্বান অথবা পরিশ্রমী হতে হয় না, কিন্তু সেইজন্য যাঁরা তাঁকে লঘুপথ্য ভাবেন তাঁরা শোচনীয়রূপে ভ্রান্ত। এক ভূমিখণ্ড, যেখানে গিরিগাত্র বিদীর্ণ করে সুরঙ্গ নির্মাণ করা হচ্ছে, আর বিরাট অট্টালিকা মাথা তুলছে আকাশের দিকে—রবীন্দ্রনাথকে ভাবলে এই ছবি আমার মনে জাগে না ; বরং মনে পড়ে এক স্রোতস্বিনী, সঞ্চারিণী, পরিবর্তনশীল, ক্রমান্বিত—যার জলে গা ডোবালে প্রথমে বড়ো মৃদু

ও শীতল বলে মনে হয়, কিন্তু যা গোপনে এত গভীর ও জোরালো যে অসতর্ক আগন্তুককে মুহূর্তে ভাসিয়ে নিতে পারে। 'আভাস', 'ইঙ্গিত', 'ভঙ্গি', 'কানাকানি'— এই সব এবং এই ধরনের শব্দ, যার বহুলতা বাংলাভাষার একটি লক্ষণ, তাঁর কবিতা ও গদ্যরচনায় এরা নিরন্তর আবৃত্ত ; তাঁর সমগ্র কবিতা ও গানের মধ্যে অক্লান্ত অনুলাপে যা প্রবহমান, তা বুসোর সেই বিখ্যাত 'জানি না কী' (je ne sais quoi) ;* তিনি কবি অচির মুহূর্তের, প্রত্যুষেও অবিস্মৃত স্বপ্নের, জন্মান্তরের অস্পষ্ট স্মৃতির, আর এমন সব সূক্ষ্ম ও পলাতক ইন্দ্রিয়বোধের, যার কোনো নাম আমরা দিতে পারি না। ইঙ্গিতের মহান শিল্পী তিনি। প্রজ্ঞা নয়, এক অভিনব বোধের জাগরণ—এই তাঁর অবদান আমাদের জীবনে ; এমন এক বোধ, যা, তাঁর কবিতার দ্বারা যতদিন আমরা স্পৃষ্ট হইনি, ততদিন আমাদের ধারণার মধ্যেও ছিলো না, এবং যা না-পেলে আমরা জীবনের এক গভীর অংশে রিক্ত হয়ে থাকতুম। জগৎটাকে অনুভব করাবার ঘটক তিনি, আর তাঁর কাছে উপলব্ধিরও উপায় হলো অনুভব। তাঁর কবিতার সঙ্গে তর্ক চলে না, কেননা তা নির্দ্বন্দ্ব ও সমস্যাহীন ; তাঁর বিশ্বাসের ভূমিতে নেই দান্তের মতো কোনো ধর্মতত্ত্ব বা ব্লেকের মতো নতুন এক তন্ত্ররচনার আয়োজন ; মানুষকে তিনি পরিণতি বা মুক্তির পথ দেখিয়েছেন এমন দাবি তাঁর ভক্তেরা মাঝে-মাঝে করে থাকলেও তাঁর কবিতা কখনোই করে না। উপরন্তু, কোনো 'শকুন্তলা' বা 'ফাউস্ট' বা 'ওঅর অ্যাণ্ড পীস'-এর স্রষ্টা নন তিনি ; বৃথাই আমরা সন্ধান করি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ' রচনা বা এমন কোনো প্রতিনিধি-পুস্তক, যার উপর হাত রেখে আমরা বলতে পারি—'এই হলেন রবীন্দ্রনাথ।' তিনি গীতিকবি ? নিশ্চয়ই, যে-কোনো অর্থেই তা-ই, অথচ র‍্যাঁবো ও ব্লেকের সমগ্র রচনার সঙ্গে "মাতাল তরণী" ও 'সারল্য ও অভিজ্ঞতার গান' নামক কাব্যগ্রন্থের যা সম্বন্ধ, সমগ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেইভাবে সম্পৃক্ত তাঁর কোনো-একটি কবিতা বা গ্রন্থ আমরা মনে আনতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উপচয়নির্ভর, তাঁকে 'পেতে' হলে তাঁর অনেকগুলো কবিতা ও গ্রন্থের মধ্যে ইতস্তত সঞ্চরণ প্রয়োজন। এবং এমন কেউ যদি থাকে—থাকতে পারে না তা নয়—যে তাঁর বিশেষ কাব্যগুণে তেমনভাবে সাড়া দিতে পারছে না, সেই পাঠকের হয়তো মনে হবে তাঁর কিছুই দেবার নেই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের অসুবিধে ; তাঁর সর্বজগতে প্রকাশিত হবার এও একটি অন্তরায়।

---

* 'কী', 'কোন', 'কী জানি', 'কী যেন', 'জানি না'—এ-সব বাগ্‌ধারায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের এমনভাবে অভ্যস্ত করেছেন যে তাঁকে ভাবলেই এগুলো আমাদের মনে পড়ে, এবং প্রায় মনে হয়—অন্তত বহুদিন ধরে মনে হয়েছে—যে বাংলা ভাষার কবিতায় এরা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথকে অবলোকনের অন্য এক উপায় আছে, তা হলো—'স্বজাতির উপর তাঁর অভিঘাত কী ?' এই প্রশ্ন উত্থাপন করা। আমি জানি, বাঙালির কাছে এই প্রশ্ন আজ আলোচনার অতীত, তর্কের পরপারে, এবং এদিক থেকেও তাঁর একমাত্র তুলনা—আবার সেই গ্যেটে। জর্মান জীবনে গ্যেটের যা অর্থ, বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথের তা-ই ; কিংবা এমনও হতে পারে যে তিনি আরো বিচিত্রভাবে আমাদের মর্মজীবন অধিকার করে আছেন। রবীন্দ্রনাথও, অন্যান্য মহাকবিদের মতো, এক প্রাথমিক সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলেন ; তাঁর জন্মকালে অস্থির ছিলো তাঁর দেশ—অস্থির, পরিণতিপ্রবণ, বিদেশী সংস্পর্শের ফলে পুনরুজ্জীবিত ; আশা, চেষ্টা ও সংগ্রামের সেই সময়, যখন দিকে-দিকে নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে, আর সম্ভাবনা অন্তহীন মনে হলেও অনেক কিছুই তখন পর্যন্ত অসম্পন্ন, ভাষা পর্যন্ত অস্পষ্টতায় অপ্রস্তুত। তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন সেই অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে যাকে কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বাংলার রেনেসাঁস বলে থাকেন, কিন্তু আসলে যা ভারতের নবজন্মকাল, এবং যার আদি কেন্দ্র রবীন্দ্রনাথেরই জন্মস্থান—এই কলকাতা। প্রবাহ শুরু হয়েছিলো দুই পুরুষ আগে : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম ও মধুসূদন, তাঁর ঠাকুরবংশীয় ও অন্যান্য পূর্বতনেরা—এই সব অগ্রদূতের যা-কিছু কৃতি, এই সব দেশপ্রেমিক, শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক ও ধর্মগুরুদের শতকার্ধব্যাপী যা-কিছু সাধনা, সব যেন তাঁর মধ্যে এসে সংশ্লিষ্ট ও সমন্বিত হলো : আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এইভাবে দেখতে পাই। যেন তিনি সেই স্থায়ী ও সুন্দর রূপকল্প, যার মধ্যে বাঙালির শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষাগুলি গৃহীত হলো, যেন পূর্বসূরিদের বহুমুখী প্রচেষ্টার শেষ ফল তিনি, যেন তাঁকে সম্ভব করে তোলার জন্যই সেই যুগের বহুমুখী পরিশ্রম। এমনি, আমাদের কাছে, রবীন্দ্রনাথ।

জর্মানিতে গ্যেটে, ও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যখন যুবক, এই দুই কালের মধ্যে সামান্য লক্ষণ অনেক। রাজনৈতিক হিশেবে জর্মানি তখন অসংবদ্ধ, বাংলাদেশ পরাধীন। জর্মান সাহিত্যে বিদ্রোহ জেগেছে মৃতকল্প ফরাশি আদর্শের বিরুদ্ধে, আর আমরা সচেষ্ট আছি মধ্যযুগের গ্লানিমার চিকিৎসায়। আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় ইতিহাস- ও লোকসাহিত্যচর্চা সংরক্ত হলো ; অতীতের পুনর্বোধনে মেতে উঠলেন মনীষীরা, আবার বৈদেশিক ও আধুনিকের জন্যও দ্বার খুলে দিলেন। নানা স্রোতে প্রবাহিত হলো উদ্যম, এবং যে-কোনো কর্ম অথবা চিন্তাধারাকে প্রেরণা দিলে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদ। এবং গ্যেটে যেমন জর্মানিতে, তেমনি বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বঘটে নারায়ণ ; দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটতে পারেনি, যাতে তিনি অংশ না-নিয়েছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে দুই কবিতে আর তুলনা চলে না। প্রবীণ গ্যেটে, 'ষ্টুর্ম উন্ট ড্রাং'-এর ভাবোচ্ছ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, স্থানীয় ও সাময়িকের ঊর্ধ্বে, মহান স্বার্থপরতায় অনবরত

সফল করে তুলছেন নিজেকে : আর রবীন্দ্রনাথ, জাতীয়তাবাদে ক্লান্ত, তবু তাঁর স্বদেশের ভাগ্যের সঙ্গে হৃদয়সূত্রে আবদ্ধ আছেন, নিজের একটি বিরাট অংশ বিলিয়ে দিচ্ছেন দেশবাসীর প্রতি তাৎকালিক কর্তব্যপালনে। আর-এক কথা : জর্মান কবিতায়—শুধু হ্বাইমার-বাসী দেবরাজ নন, তাঁর সমকালীন শিলারও ছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, মধ্যবয়সেই, বাংলা সাহিত্যে পরম হয়ে উঠলেন, বলতে গেলে অনন্য, প্রতিযোগিতার পরপারে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষায় এমন কোনো কবিতা লেখা হচ্ছে না, যা তাঁরই করুণ অনুকরণ নয় ; অন্য কোনো রীতির উদাহরণ নেই চোখের সামনে ; নেই এমন কোনো সাহিত্যিক সহচর, যাঁকে তিনি সমকক্ষ বলে ভাবতে পারেন ; যার দ্বারা তিনি উপকৃত হতে পারেন এমন সমালোচনাও অস্তিত্বহীন। তাঁর অগ্রজের মধ্যে তাঁর যোগ্য ছিলেন অনেকেই, কিন্তু সমকালীনের মধ্যে কেউ ছিলেন না যাঁর দিকে তাকিয়ে মনে-মনে তিনি মেপে নিতে পারেন নিজেকে, বা এমন কথা তাঁর স্বপ্নেও মনে হতে পারে যে তাঁরও আত্মশোধনের প্রয়োজন আছে। এটা তাঁর দুর্ভাগ্য বলে আমি মনে করি ; আমরা যারা কবিতা ভালোবাসি, আমাদেরও দুর্ভাগ্য এটা। প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে আনলে হৃদয়ে ঠিক পুলক জাগে না ;—দেখতে পাই নিঃসঙ্গ এক পুরুষ, বহু ক্ষুদ্র উপাসকের দ্বারা পরিবৃত, এক প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকার মধ্যে বন্দী, এক উৎপীড়িত ত্রিংশৎ কোটির মুখপাত্র। তাঁর অবস্থার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নিজের উপর বিপুল দায়িত্ব তাঁকে নিতে হলো ; লিখতে হলো এমন বহু পঙক্তি যার সত্যি কোনো প্রয়োজন ছিলো না, নিজেকে ব্যয় করতে হলো এমন বহু উদ্যোগে যা ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিদের হাতেও তুলে দেওয়া যেতো, যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে জনতার ডাকে সাড়া দিতে হলো। ভেবে দেখলে মনে হয় যে তিনি যতটা ভার বয়েছিলেন, তা তাঁর মতো মহাবলের পক্ষেও অত্যধিক।

বাহুল্য হবে, যদি নতুন করে তাঁর বহুমুখিতার বর্ণনা দিতে চেষ্টা করি। কে না আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁর ক্ষমতায়, তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যে, তাঁর অবিরাম রচনাপ্রবাহে—মর্মান্তিক বন্ধ্যতার দিনে, কাগজের উপর হতাশ আঁকিবুঁকি কাটতে-কাটতে, কে না আমরা দেবতা বলে মেনেছি তাঁকে! কিন্তু এই অবিরল নির্ঝর, এই নির্বাধ রচনাশক্তি, স্বদেশ, জগৎ, দেশবাসী ও মানবজাতি বিষয়ে তাঁর অশেষ হিতৈষণা—এর জন্য কিছু মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছিলো। 'All things can tempt me from this craft of verse'—এ-কথা রবীন্দ্রনাথও লিখতে পারতেন, অন্তত 'ক্ষণিকা' পড়ে মনে হয় যে তাঁরও এক-এক সময় কবিতা ছাড়া অন্য সব দায়িত্ব ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতা ও অন্যান্য কর্মে বিরোধ তিনি ঘটতে দেননি, সেই সব অন্য স্থলেও অনবরত কবিতার বিষয় খুঁজে পেয়েছেন ; এর ফলে তাঁর দেশবাসীর উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তাঁর কবিতা। আমি ভাবতে পারি না তাঁর

প্রাতিষ্ঠানিক বিগ্রহটিকে রবীন্দ্রনাথ কী চোখে দেখতেন, কখনো কি অসহ্য লাগতো না পূজিত হতে, না কি সেই শিখর থেকে পালাবার জন্যই বৃদ্ধ বয়সে ছবি এঁকেছিলেন ? তাঁর দিক থেকে চিন্তা করলে নানারকম অনুমান সম্ভব, তবে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে ঐ বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে আমরা আমাদের পরাধীনতাজনিত অপমানে সান্ত্বনা পেয়েছি। তিনি তা জানতেন, আর জানতেন বলেই স্বজাতির প্রতি তাঁর বাৎসল্যের সীমা ছিলো না ; এমনভাবে আমাদের সব ছোটো-ছোটো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতেন, যেন আমরা সকলেই শিশু—আর সেটাই যে ঠিক কথা নয় কে জানে। কী উদার তাঁর করুণা তা এতেই বোঝা যায় যে আমাদের মধ্যে যারা তাঁর আস্ত কোনো বই কখনো পড়িনি, বা তাঁর কাছে কিছু শেখার অভিপ্রায় থেকে যারা স্বভাবতই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, তারাও তাঁকে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করলে তিনি সহ্য করেছেন। জগতের কবিদের মধ্যে, আমি যতদূর জানি, একমাত্র তিনিই পত্রে স্বাক্ষর করেছেন 'কবি' বলে ; তার পিছনে হয়তো একটু কৌতুক আছে, কিন্তু এ-কথাও তাঁর জানা ছিলো যে ঐ একটি 'কবি' শব্দের দ্বারাই বহু বাঙালির কাছে তাঁর পরিচয়। সহাস্যে, এবং হয়তো সখেদে, মাঝে-মাঝে বলতেন যে বাঙালিরা তাঁকে নিয়ে 'পুতুল-খেলা করছে', কিন্তু ঐ সর্বাধিগম্য বিগ্রহ থেকে লোকেদের বঞ্চিত করতেও তাঁর মন সরেনি। আর তিনি যে এত বিবিধ প্রকার কর্মভার নিয়েছেন, যুক্ত হয়েছেন ক্রমাগত এত বিচিত্র ব্যাপারে, তাও তাঁর স্বজাতিরই জন্য ; হয়তো বলা যায় যে তাঁর অসুখী মাতৃভূমির দৈনন্দিন প্রয়োজনসাধনে তাঁর প্রতিভা ছিলো উৎসর্গিত। সেই সঙ্গে স্মরণে আসে কবিতায় তাঁর শিথিল মুহূর্ত, তাঁর পুনরুক্তি ও অসমতা, সেই সব রচনা যা নিতান্তই অভ্যাসের ফল ; আর তখন মনে হয় যে যথার্থভাবে কবিতার যা অঙ্গ নয় এমন বহু বিষয়ের দ্বারা 'লুব্ধ' হয়ে তিনি এমনকি তাঁর অমরতার একটি অংশ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহলে তো তাঁর কাছে আমাদের ঋণ আরো বেশি অপরিমেয়।

১৯৬২

পরিশিষ্ট

“রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী”র ভূমিকা

সম্প্রতি আমাকে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিলো। ন্যুয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, তাছাড়া জাপান, হনলুলু, আমেরিকা ও য়োরোপের কোনো-কোনো শিক্ষায়তন বা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করারও আহ্বান ছিলো। এই নিমন্ত্রণগুলো আমার কাছে এসেছিলো প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরি আহ্বানকারীদের তরফ থেকে, ভারত-সরকারের আয়োজনে বা মধ্যস্থতায় নয়। আমাদের রাষ্ট্রপতির নামাঙ্কিত একটি পাসপোর্ট ছাড়া, আমার এই বিদেশযাত্রার সঙ্গে ভারত-সরকারের আর-কোনো সম্বন্ধ ছিলো না। কথাটা উল্লেখ করতে হলো এইজন্যে যে এ-বিষয়ে কারো-কারো ভ্রান্ত ধারণা আছে বলে শুনতে পেয়েছি।

ছ-মাস পর ফিরে এসে দেখি, আমাকে নিয়ে ছাপার অক্ষরে তাণ্ডব চলছে। দেশের মধ্যে আমার অনুরাগী পাঠক যখন আছেন তখন নিন্দুকেরও অভাব হবে না, এই কথাটি আমি বহুকাল আগে বুঝে নিয়েছিলুম ; আজ পঁয়তিরিশ বছরের নিবিড় অভ্যাসের ফলে আমি নিন্দার প্রতি উদাসীনতা উপার্জন করেছি। কিন্তু এবারে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করছি এইজন্য যে এই উত্তেজনার লক্ষ্য বা উপলক্ষ আমার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, এবং সেই প্রবন্ধের সঙ্গে এই অপোচ্ছ্বাসের প্রায় কোনো সম্বন্ধ নেই।

আলোচ্য প্রবন্ধের ভাষা ইংরেজি, বিষয়—“রবীন্দ্রনাথে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব”। গত বৎসর কলকাতার অল ইন্ডিয়া রেডিও একটি ইংরেজি বক্তৃতাপর্যায়ের আয়োজন করেন, তার শিরোনামা *Western Influence on Bengali Literature*। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হয়ে, আমি নিবন্ধটি রচনা করি ; বেতারের পরিভাষায় তার শিরোনামা ছিলো—‘Western Influence on Bengali Literature : Rabindranath’। কলকাতার বেতারকেন্দ্রে এটি সম্প্রচারিত হয় ১৯৬০ সালের ৯ মার্চ তারিখে, পড়তে হয়েছিলো অবশ্য আমাকেই। একই বছরের ৩ জুলাই তারিখের ‘আকাশবাণী’তে (পূর্ব নাম, *The Indian Listener*) লেখাটি প্রথম ছাপা হয় ;

কিন্তু মূল রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ অনুচ্ছেদের অর্ধাংশ 'আকাশবাণী' বর্জন করেন—কেন, তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিছুদিন পরে পুরো লেখাটি ছাপা হলো প্যারিসের *Two Cities* নামক ইঙ্গ-ফরাশি পত্রিকার হেমন্তসংখ্যায় (১৯৬০), এবং প্রায় একই সময়ে, কিছুটা বন্ধুদের পরামর্শে এবং কিছুটা সম্পাদকের অনুরোধ এড়াতে না-পেরে, লেখাটার একটা বাংলা প্রকরণ আমি দাঁড় করালাম ; "রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী" নামে পূজাবার্ষিকী 'অভিসারে' তার স্থান হলো। বাংলা লেখাটাকে 'প্রকরণ' বলছি এইজন্য যে তা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ নয় ; ইংরেজিতে যা আছে তার সমস্তটাই ঐ প্রবন্ধে দিয়েছি, কিন্তু বাংলার সবগুলি অংশ ইংরেজিতে নেই ; অর্থাৎ বাংলায় এমন বাক্য ও মন্তব্য যোগ করেছি যা আমার ধারণায় আমার বক্তব্যকে আরো সবল করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ৭ জুন (১৯৬১) তারিখে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত ভারতীয়-সভ্যতা বিভাগে আমি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-বক্তৃতা করেছিলাম, এই প্রবন্ধ তার একেবারে অনাত্মীয়। কোনোরকম লিখিত প্রবন্ধ আমি সেখানে পড়িনি, আমার বক্তৃতা মৌখিকভাবে রচিত হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো ও কত বিচিত্র, সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে সেটুকুই উপস্থিত করার চেষ্টা করেছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ভারত-ভক্ত বা রবীন্দ্র-ভক্ত ফরাশি, রবীন্দ্র-ভক্ত বা বাংলা সাহিত্যপ্রেমিক পশ্চিম- ও পূর্ব-বাঙালি, এবং কলকাতার দু-জন বিশিষ্ট সাংবাদিক।

প্রবাসকালে আমি জানতাম না যে এর পরেও এই লেখাটার আরো দু-বার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে ; দিল্লির *Thought* পত্রিকায় ইংরেজিতে (৬ মে, ১৯৬১) আর কলকাতার 'বেতার জগতে' বাংলায় (২২ এপ্রিল, ১৯৬১)। কেউ-কেউ হয়তো ধরে নিয়েছেন যে 'বেতার জগতে'র অনুবাদটা আমারই করা, যদিও আমার রচনাদির সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই ধারণা সম্ভব বলে বোধ হয় না। 'বেতার জগতে'ও মূল প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটা ও শেষ অনুচ্ছেদের অর্ধাংশ বাদ পড়েছে ; তাঁরা 'আকাশবাণী'র হুবহু অনুসরণ করেছেন, হয়তো অল ইন্ডিয়া রেডিওর মুখপাত্র হিশেবে সেটাই তাঁদের প্রচল। এই বর্জনটুকু আমার পরামর্শমতো, বা অনুমতিক্রমে, অথবা জ্ঞাতসারে করা হয়নি ; 'বেতার জগতে'র অনুবাদ কে করেছেন তাও আমি জানি না, তবে এ-কথা আমি বলতে বাধ্য যে তিনি মোটের উপর আমার প্রতি অবিচার করেননি ; কয়েকটি বাক্য বাদ পড়ে থাকলেও তিনি আমার মূল বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন।

অধিকতর কৌতুকের বিষয় এই যে, যে-লেখাটা ষোলো মাস আগে রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়, এবং যার ভাগ্যে দশ মাসের মধ্যে ইংরেজিতে ও বাংলায়, দেশে ও বিদেশে, খণ্ডিত, পূর্ণ ও পরিবর্ধিতরূপে পাঁচ বার প্রকাশলাভ ঘটে, তাকে নিয়ে অকস্মাৎ এক উত্তেজনা পঙ্কিল হয়ে উঠলো। এমন অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে এর আগে

বহু সহস্র ব্যক্তি লেখাটি শুনেছেন বা পড়েছেন ; তাঁদের মধ্যে একজনও কোনো বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমি প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ ধরা পড়লো যে ঐ লেখাটা ধিক্কারযোগ্য।

কিন্তু কোনো-কিছুকে ধিক্কার দেবার আগে অন্ততপক্ষে জেনে নেয়া বোধহয় উচিত যে জিনিশটা কী। আমার *Two Cities*-এর প্রবন্ধের 'অনুবাদ' হিশেবে সম্প্রতি যা কোনো-এক পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে তা আমার মূল প্রবন্ধের বিকৃতি পর্যন্ত নয়, অনেকাংশে স্বাধীন রচনা। সেখানে 'হ্যাঁ'-কে 'না' এবং 'না'-কে 'হ্যাঁ' করে দেয়া হয়েছে, আমার অভিপ্রায়ের আভাসমাত্র ধরা পড়েনি—তা কি ভাষাজ্ঞানের অভাবে, না সচেতন উদ্দেশ্যবশত, তা অবশ্য আমার জানা নেই। কোনো লেখকের জীবৎকালে, তাঁকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে না-দিয়ে, তাঁরই নামাঙ্কিত করে কতকগুলো স্বকপোলকল্পিত বাক্য প্রকাশ করা যায়, এমন উক্তিসহকারে যা তাঁর পক্ষে অচিন্তনীয়, এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যা তাঁর পক্ষে সম্ভবপরতার পরপারে—আমার মাতৃভূমি বিষয়ে এই আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হলো। এটা সম্ভব হয় এইজন্যেই যে আমাদের পাঠকসাধারণের প্রতারিত হবার ক্ষমতা এখনো অপরিসীম। 'বেতার জগতে'র অনুবাদে আমার বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে ঘোষিত, অথচ অনেকেই এমনভাবে লিখেছেন যেন তার অস্তিত্বই নেই। তবু 'বেতার জগৎ' মাঝে-মাঝে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আমার 'অভিসারে'র লেখাটা যে কখনো কারো চোখ পড়েছিলো, বাদানুবাদের কলেবরবৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনো তার প্রমাণ পাইনি। সেইজন্য, 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা অনুসারে, সেটা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

Two Cities-এর সংখ্যা আমাদের দেশে হয়তো সহজলভ্য হবে না ; বা হলেও অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের পক্ষে ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক প্রবন্ধ দুর্গম হবে। "রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী" লেখাটা মূল ইংরেজির তুলনায় কিছু বিশদ ও বিস্তারিত ; এবং আমি যে-বাংলা লিখি তা অত্যন্ত বেশি সরল না-হলেও শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের বোধগম্য হবে আশা করা যায়। 'সত্য' বলে একটা বহু পুরোনো কথা আছে—সেটা দুই-যুদ্ধ-পেরোনো বিশ শতকে প্রায় অব্যবহার্য ; কিন্তু 'তথ্য' কথাটার প্রতিপত্তি এখন বিপুল ; সেই নিরঞ্জন তথ্যের তাগিদেই লেখাটা পুনশ্চ পরিবেশিত হলো।

'দেশ', ৬ শ্রাবণ ১৩৬৮ (জুলাই ১৯৬১)